ড° অতুল সুর
বাংলা
ও
বাঙালীর
বিবর্তন

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

(নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত)

লেখক পরিচিতি

ড. অতুল সুর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইতিহাসে ১০০-র মধ্যে ৯৯ নম্বর পেয়ে এক সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। Cum laude সম্মান-সহ অর্থনীতিতে ডি.এস-সি উপাধি পেয়েছেন। ক্রিটিকস্ সারকেল অভ্ ইণ্ডিয়া থেকে CCI Award পেয়েছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন থেকে 'সুশীলাদেবী বিড়লা স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন। 'মধুসূদন' ও 'রামমোহন' পুরস্কার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। বহুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র অধ্যাপনা করেছেন। ৩৪ বৎসর কলকাতা স্টক একস্‌চেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ৪১ বৎসর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থায় বিভাগীয় সম্পাদকের কাজ করেছেন।

ওঁর ইতিহাস চর্চা সম্বন্ধে ড. কালিদাস নাগ বলেছেন: 'বাঙলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তোমার পাণ্ডিত্য অনন্য-সাধারণ।' ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন: 'আমাদের সমপর্যায়ের লোক হয়েও আপনার পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই, নীরবে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আপনি উদ্‌ঘাটিত করে চলেছেন। আপনি আমার মত অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, আপনার কর্মের দ্বারা।'

লেখক ইংরেজি ও বাংলায় আজ পর্যন্ত ১৫৫ খানা বই লিখেছেন। দশ হাজারেরও ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন।

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

ডঃ অতুল সুর

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৬

Bangla O Bangalir Bibartan

(An Ethno-Cultural History of Bengal)

By Dr. Atul Sur

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

নেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক 'সাহিত্যালোক' ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬ থেকে
প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক 'বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স' ৫৭-এ কারবালা
ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬ হতে মুদ্রিত।

যে দেশের
ভূমিসন্তান হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি
সে দেশের দেশমাতৃকার চরণে
নিবেদিত হল

গৌড়চন্দ্রিকা

প্রাচীন বাঙলার অপর নাম ছিল 'গৌড়'। সেজন্য বইখানার ভূমিকার নাম দেওয়া হয়েছে 'গৌড়চন্দ্রিকা'। আর বইখানার শিরোনামে গৃহীত 'বিবর্তন' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে আভিধানিক অর্থে। 'বিবর্তন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'পরিবর্তন'। 'বিবর্তন' শব্দের সঙ্গে অবনতি বা উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই। একমাত্র সম্পর্ক হচ্ছে রূপান্তরের সম্পর্ক। সেজন্য কালের ঘূর্ণনে বিভিন্ন যুগে বাঙালী জীবনে যে রূপান্তর ঘটেছে, তারই ইতিহাস দেওয়া হয়েছে এই বই-

তবে এ ইতিহাস কোন 'পোশাকী' বা 'ফরম্যাল' ইতিহাস নয়। সম্পূর্ণ-ভাবে এটা আটপৌরে বা 'ইনফরম্যাল' ইতিহাস। এটা বিষয়-বিন্যাসের পদ্ধতি থেকেই বুঝতে পারা যাবে। এককথায় বইখানাতে পাওয়া যাবে বাঙালী জীবনের সৃজন, বিকাশ ও বিপর্যয়ের ইতিহাস।

বইখানা লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে স্মরণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলে-ছিলেন—'আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাইরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিষ, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতে পারে না।'

বাঙালীর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকে। ভূ-তাত্ত্বিক আলোড়ন ও চঞ্চলতার ফলে বাঙলা দেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে। ভূতত্ত্ববিদ্গণের হিসাব অনুযায়ী সেটা ঘটেছিল প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আরও পরে, আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে। তার আগেই ঘটেছিল জীবজগতে ক্রমবিকাশের এক কর্মকাণ্ড। বানরজাতীয় জীবগণ চেষ্টা করছিল বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত হয়ে নানা বৈশিষ্ট্যমূলক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে। এরূপ এক শাখা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল নরাকার জীবসমূহ (primates)। এরূপ নরাকার জীবসমূহের কঙ্কালাস্থি আমরা পেয়েছি ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শিবালিক শৈলমালা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। বিবর্তনের ছকে তাদের আমরা নাম দিয়েছি শিবপিথেকাস, রামপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস

ইত্যাদি। আরও উন্নত ধরনের নরাকার জীবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া গিয়েছে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে জাভা-দ্বীপে ও চীন দেশের চুংকিং-এ। এখন এই তিনটি জায়গায় তিনটি বিন্দু বসিয়ে যদি সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তা হলে যে ত্রিভুজ সৃষ্ট হবে, তারই মধ্যস্থলে পড়বে বাঙলা দেশ। সুতরাং এরূপ নরাকার জীবসমূহ যে বাঙলা দেশের ওপর দিয়ে যাতায়াত করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এসব নরাকার জীব থেকেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল।

মানুষের প্রথম সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণ। জীবন-সংগ্রামের এই সমস্যা সমাধানের জন্য, তাকে তৈরি করতে হয়েছিল আয়ুধ। আয়ুধগুলো একখণ্ড পাথর অপর একখণ্ড পাথরের সাহায্যে তার চাকলা তুলে হাতকুঠার ও অস্ত্র আকারে নির্মিত হত। এগুলোকে আমরা প্রস্তোপলীয় যুগের আয়ুধ [illegible] গঠনপ্রণালী ও চারিত্রিক বিশিষ্টতার দিক দিয়ে এগুলো[illegible] ক্রমিক সাতটা যুগে ফেলি: যথা (১) আবেভিলিয়ান, (২) অ্যাশুলিয়ান, (৩) লেভালয়-সিয়ান, (৪) মুস্টেরিয়ান, (৫) অরিগনেসিয়ান, (৬) সলুট্রিয়ান ও (৭) ম্যাগডেলে-নিয়ান। এগুলো সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অনুসন্ধান ও অনুশীলন হয়েছে পশ্চিম ইউরোপে। সেজন্যই এই সকল আয়ুধের 'টাইপ'-এর নাম পশ্চিম-ইউরোপের অঞ্চলবিশেষের নাম অনুসারে করা হয়েছে। তবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাদের কাজের সুবিধার জন্য প্রস্তোপলীয় যুগকে তিন ভাগে ভাগ করেন, যথা— আদি, মধ্য ও অন্তিম। আয়ুধ নির্মাণ ছাড়া, প্রস্তোপলীয় যুগের মানুষের আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার, পরিবার গঠন, পশু-শিকার সুগম করবার জন্য পর্বত-গুহায় বা পর্বতগাত্রে পশুর চিত্রাঙ্কন দ্বারা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ, ও আগুনের ব্যবহার।

মুস্টেরিয়ান যুগের আগেকার যুগের মানুষের কোন কঙ্কালাস্থি আমরা পাইনি। মুস্টেরিয়ান যুগে যে জাতির মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের আমরা নিয়ানডারথাল মানুষ বলি। তবে সে জাতির মানুষ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে জাতির মানুষ থেকে আধুনিক জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে, তাদের আবির্ভাব ঘটে আনুমানিক ৪০,০০০ বৎসর পূর্বে। তাদের আমরা ক্রোম্যানিয়ন (Cro-Magnon) জাতির মানুষ বলি।

খুব প্রাচীনকালের মানুষের কঙ্কালাস্থি ভারতে পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত প্রত্নাস্থিতত্ত্ববিদ স্যার আর্থার কীথ ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে যখন তাঁর 'অ্যান্টিকুইটি

অভ্ ম্যান' নামক গ্রন্থে লেখেন, যখন তিনি বলেছিলেন—'প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেন, তাঁরা ভারতের দিকেই আশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে।' অনুসন্ধানের উদ্যোগের অভাবই এর একমাত্র কারণ। সম্প্রতি (১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে) মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের অদূরে শিজুয়ায় পাওয়া গিয়েছে এক জীবাশ্মীভূত ভগ্ন মানব-চোয়াল। রেডিয়ো-কারবন—১৪ পরীক্ষায় এর বয়স নির্ণীত হয়েছে ১০,৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। তার মানে প্রত্নোপলীয় যুগের একেবারে অন্তিম পর্বে, কেননা নবোপলীয় যুগ শুরু হয়েছিল ৮,০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বা তার কিছু পূর্বে।

তবে প্রত্নোপলীয় যুগের প্রথম দিকের মানুষের কঙ্কালাদি পাওয়া না গেলেও, [illegible] সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙলা দেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আম[illegible]শর নানাস্থানে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ (tools) থেকে। (পৃষ্ঠা ৭০ দেখুন)। এগুলো সবই পশ্চিম-ইউরোপে প্রাপ্ত প্রত্নোপলীয় যুগের হাতকুঠারের অনুরূপ। প্রত্নোপলীয় (palaeolithic) যুগের পরিসমাপ্তির পরই সূচনা হয় নবোপলীয় (neolithic) যুগের। এ যুগেই কৃষি ও বয়নের উদ্ভব হয়, এবং মানুষ পশুপালন করতে শুরু করে। তবে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা নবোপলীয় যুগে ঘটেছিল, তা হচ্ছে মানুষ তার যাযাবর জীবন পরিহার করে, স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করতে শুরু করেছিল। ধর্মেরও উদ্ভব ঘটেছিল। তাদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে আমি আমার 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে আলোচনা করেছি, সেজন্য এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করছি না। নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির নিদর্শন আমরা দার্জিলিঙ থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত নানাস্থানে পেয়েছি। শুধু তাই নয়, নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধরে রেখেছি, যথা ধামা, চুবড়ি, কুলা, ঝাঁপি, বাটনা বাটবার শিল-নোড়া ও শস্য পেষাইয়ের জন্য যাঁতা ইত্যাদি। এগুলো সবই আজকের বাঙালী নবোপলীয় যুগের 'টেকনোলজি' অনুযায়ী তৈরি করে। তা ছাড়া, নবোপলীয় যুগের শস্যই, আজকের মানুষের প্রধান খাদ্য।

জীবনচর্যাকে সুখময় করবার জন্য মানুষের জয়যাত্রা নবোপলীয় যুগেই ত্বরান্বিত হয়। কেননা, মাত্র পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যেই নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতা তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতায় বিকশিত হয়। তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও সন্নিহিত অঞ্চলে। এই

বইয়ের অন্যত্র আমি বলেছি—'তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিশর বলুন, সুমের বলুন, সিন্ধু উপত্যকা বলুন, সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে সেখানে তামা অবশ্য সামান্য কিছু কিছু পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাঙলাই ছিল সে-যুগের তামার প্রধান আড়ত। তামার সবচেয়ে বৃহত্তম খনি ছিল বাঙলা দেশে। বাঙলার বণিকরাই 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে, ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এজন্যই বাঙলার বড় বন্দরের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। ওই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন ভারতের [illegible] তাম্রখনি হতে।' (পৃষ্ঠা ৭১) আমি আরও বলেছি যে এই তামার সঙ্গে বাঙালী অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিল শিব ও শক্তিপূজার বীজ, যা বাঙলার নিজস্ব ধর্ম। বস্তুত বাঙলাদেশে যত শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়, তত আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বাঙালী এখনও তার ঠাকুরঘরে ব্যবহার করে তাম্রাশ্মযুগের সম্পদ, যথা পাথর ও তামার থালাবাসন, তামার কোষাকুষি ইত্যাদি। (৩৮৪ পৃষ্ঠার 'সংযোজন' দেখুন)

তাছাড়া, নিম্নবাঙলার অনেক স্থানে যেমন মেদিনীপুর জেলার তমলুক (প্রাচীন তাম্রলিপ্তি), তিলদা (তমলুক থেকে ২৪ মাইল দূরে), পান্না (ঘাটাল থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে), বাহিরি (কাঁথি মহকুমায়) ও রঘুনাথপুর (তমলুক থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে), এবং চব্বিশ পরগনার বেড়াচাঁপা বা চন্দ্রকেতুগড় (কলকাতার ২৩ মাইল উত্তরে), আটঘরা (কলকাতার ১২ মাইল দক্ষিণে), হরিহরপুর (মল্লিকপুর রেল স্টেশনের নিকটে), হরিনারায়ণপুর (ডায়মণ্ড হারবারের ৪ মাইল দক্ষিণে) প্রভৃতি স্থানে কীলকচিহ্নাঙ্কিত প্রাচীন মুদ্রা, কুশান ও গুপ্ত যুগের মুদ্রা, পোড়ামাটির নানারকম মূর্তি, মৃত্তিকা নির্মিত সীলমোহরাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। নানারকম প্রত্নবস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে গ্রীক ও রোমান জগতের সঙ্গে এ অঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য ছিল।

*   *   *   *

বাঙালীকে মিশ্র জাতি বলা হয়। এ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে অধুনা লুপ্ত-প্রায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসিগণ ব্যতীত, জগতে এমন কোন

জাতি নাই, যারা মিশ্র জাতি নয়। অন্তত নৃতত্ত্ববিদদের কাছে এমন কোন জাতির নাম জানা নেই যারা বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে। তার মানে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা যেমন মিশ্র জাতি, বাঙালীও তাই। বাঙালীর আবয়বিক নৃতাত্ত্বিক গঠনে যেসব জাতির রক্ত মিশ্রিত হয়েছে, তারা হচ্ছে অষ্ট্রিক ভাষা-ভাষী বাঙলার আদিম অধিবাসী, ও আগন্তুক দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠী ও আর্যভাষাভাষী আলপীয় (বা দিনারিক) জাতিসমূহ। তবে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী বাঙলার আদিম অধিবাসী ও আলপীয় (বা দিনারিক) রক্তই প্রধান। এই শেষোক্ত জাতিই বাঙালীকে দিয়েছে তার প্রধান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—হ্রস্বকপাল (brachycephallic)। এখানেই উত্তর ভারতের দীর্ঘ-কপাল (dolichocephalic) জাতিসমূহ থেকে বাঙালীর পার্থক্য। (এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' অধ্যায়ে)।

বাঙালীর জীবনচর্যায় 'অষ্ট্রিক' প্রভাব খুব বেশী। বাঙালীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবন এর বহু নিদর্শন বহন করে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এ. সি. হ্যাডন তাঁর 'রেসেস্ অভ্ ম্যান্' বইয়ে বলেছেন যে 'অষ্ট্রিক' ভাষাভাষীরা এক সময় পঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূরে অবস্থিত ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙালী জীবনে 'অষ্ট্রিক' প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বাঙালীর লৌকিক জীবনে। সে জন্যই বাঙালীর লৌকিক জীবনের একটা পরিচয় আমি দিয়েছি বইখানার গোড়ার দিকে। বস্তুত 'অষ্ট্রিক' জীবনচর্যার ওপরই গঠিত হয়েছে বাঙালীর জীবন-চর্যার বনিয়াদ। সেই বনিয়াদের ওপরই স্তূপীভূত হয়েছে দ্রাবিড় ও আলপীয় উপাদান। তবে আলপীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলেই, এই তিনজাতির মহাসম্মিলনে যে জীবনচর্যা গড়ে উঠেছিল, তা আলপীয় 'অসুর'দের (পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫ ও ৮১-৮২ দেখুন) নাম অনুসারে অসুর জাতির জীবনচর্যা নামে পরিচিত হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মহাভারতের আদিপর্ব অনুযায়ী অসুর-রাজ বলির পাঁচ পুত্রের নাম থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামে এক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থেও বাঙলা দেশের ভাষাকে 'অসুর' জাতির ভাষা বলা হয়েছে। ('অসুরানাম্ ভবেৎ বাচ গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভব সদা')। মাত্র আবয়বিক গঠন ও ভাষার দিক দিয়েই নয়, অসুরজাতির সমগ্র জীবনচর্যাটাই উত্তরভারতের 'নর্ডিক' নরগোষ্ঠীভুক্ত বৈদিক আর্যগণের জীবনচর্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এই

জীবনচর্যার পার্থক্যের জন্যই বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের 'অসুর' জাতি-ভুক্ত লোকদের তির্যকদৃষ্টিতে দেখতেন। আর্যদের সঙ্গে অসুরদের বিরোধের এটাই ছিল কারণ। (লেখকের 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দ্রঃ)।

আর্যরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তখন উত্তর-ভারত এক জনহীন শূন্যদেশ ছিল না। সেখানেও লোকের বসতি ছিল। তারা কারা ? আগেই উল্লেখ করেছি যে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হাডনের উপলব্ধি অনুযায়ী 'অস্ট্রিক' ভাষাভাষী জাতিসমূহই পঞ্জাব থেকে ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বস্তুত আর্যরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকাকে পদানত করে পূর্বদিকে তাদের জয়যাত্রা শুরু করেছিল, তখন তাদের এই 'অস্ট্রিক' ভাষাভাষী গোষ্ঠিরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন 'অস্ট্রিক' গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে অসুররা ছিল না। আবয়বিক নৃতত্ত্বের পরিমাপ অনুযায়ী অসুর বা আলপীয় [illegible]। পশ্চিম সীমানা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। সে কারণেই একাকী 'অস্ট্রিক' গোষ্ঠীসমূহের পক্ষে অসম্ভব ছিল আর্যদের অশ্ববাহিত রথীরথকে প্রতিহত করা। কেননা, অশ্ব ভারতের জন্তু নয়। সিন্ধুসভ্যতার কোন কেন্দ্রেই অশ্বের কঙ্কালাস্থি পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতমহলে আজ এটা সর্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হয়েছে যে, আর্যরাই মধ্য এশিয়ায় ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল, এবং অশ্ববাহিত রথীরথে করেই তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতে পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হত বলীবর্দ। বলীবর্দকে এদেশের লোক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত, কেননা বলীবর্দ ছিল শিবের বাহন ; অপর পক্ষে আর্যরা বলীবর্দকে হত্যা করত ও তার মাংস ভক্ষণ করত। যাই হোক, অশ্ববাহিত রথীরথের সুবিধা থাকার দরুনই আর্যরা তাদের বিজয় অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছিল। এই সাফল্য মিথিলা বা বিদেহ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সেখানে এসেই আর্যদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল 'অসুর' জাতি এবং অপর এক জন্তুর নিকট। সে জন্তু হচ্ছে হস্তী। হস্তীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল প্রাচ্যদেশের এক মুনি, নাম পালকাপ্য (পৃষ্ঠা ৬৮ দেখুন)। বাঙলার রণহস্তী যে মাত্র আর্যদেরই ঠেকিয়ে রেখেছিল তা নয়। এই রণহস্তীর সমাবেশের কথা শুনেই গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রাচ্যভারতে আর্যদের বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল, আর এক কারণে। সে কারণ বিবৃত হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। সেখানে বলা হয়েছে—'অসুরগণের সঙ্গে দেবগণের (আর্যদের)

লড়াই চলছিল। প্রতিবারেই অসুরেরা আর্যদের পরাহত করছিল। প্রথম দেবগণ বলল, অসুরদের মত আমাদের রাজা নেই ('অরাজতয়া'), সেই কারণেই আমরা হেরে যাচ্ছি। অতএব আমাদের একজন রাজা নির্বাচন করা হউক। ('রাজানম্ করবমহ ইতি তথেতি')।' অথর্ববেদেও বলা হয়েছে 'একরাট' মাত্র প্রাচ্যদেশেই আছে। 'একরাট' মানে সার্বভৌম নৃপতি। ইতিহাসও তাই বলে।

* * * *

প্রাচ্যদেশেই প্রথম সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু তিনি উত্তর ভারতের 'নর্ডিক' নরগোষ্ঠিভুক্ত বৈদিক [illegible]দের কাছে নতি স্বীকার করেননি। মৌর্যরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সমকাল পর্যন্ত বাঙলায় বৌদ্ধ-ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। গুপ্তসম্রাটগণের আমলেই বাঙলায় প্রথম ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর্য-ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম নয়। যে সকল ব্রাহ্মণ দলে দলে বাঙলায় এসেছিল, তারা নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, আর্যেতর সমাজের কাহিনী-সমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরাণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্রোতে। সে ধর্ম বৈদিক ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সে ধর্মে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাসমূহের প্রাধান্য ছিল না। তারা সম্পূর্ণ পশ্চাদ্‌পটে অপসারিত হয়েছিল। তৎপরিবর্তে এক নতুন দেবতাশ্রেণী সৃষ্ট হয়েছিল, যার শীর্ষে অবস্থিত ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আবার তাঁদেরও শীর্ষে ছিলেন এক নারী দেবতা, শিবজায়া দুর্গা। শিব অনার্য দেবতা। ব্রহ্মা অবৈদিক দেবতা। আর বিষ্ণু বৈদিক দেবতা হলেও, তাঁর রূপান্তর ঘটেছিল আর্যেতর সমাজের কল্পনার দ্বারা। এটা প্রকাশ পেল যখন অবতারবাদের সৃষ্টি হল। অবতারগুলীতে বিশেষ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অস্ট্রিক সমাজের টোটেম-ভিত্তিক কল্পনা থেকেই গৃহীত। আর বুদ্ধ তো বেদবিদ্বেষের প্রবক্তা। এঁরা সকলেই কল্পিত হলেন বৈদিক বিষ্ণুর অবতাররূপে। শুধু তাই নয়। বিষ্ণুর সহধর্মিণী হলেন অনার্য দেবতা শিব-কন্যা লক্ষ্মী। পুরাণসমূহ রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। মহাভারতও তাঁর রচনা। বেদসঙ্কলনের ভারও তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বহুদিন পূর্বে আমি একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম, কিন্তু তার কোন সদুত্তর আজও পাইনি। প্রশ্নটা হচ্ছে—তথাকথিত বৈদিক আর্যগণের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত থাকা সত্বেও

বেদ-সংকলন, মহাভারত ও পুরাণসমূহ রচনার ভার, কেন একজন অনার্যরমণীর আত্মজ-সন্তানের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল ?'

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর শশাঙ্ক বাঙলার রাজা হন। তিনিই বাঙলার প্রথম স্বাধীন নৃপতি যিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কান্যকুব্জ থেকে গঞ্জাম পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তিনি শিব উপাসক ছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে প্রশ্ন উঠেছিল—'শিব বড়, না বিষ্ণু বড়?' এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই হরিহর মূর্তির কল্পনা করা হয়েছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলায় মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। দেশকে মাৎস্যন্যায় থেকে উদ্ধার করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। তিনিই প্রথম বাঙলার লোককে বৃত্তিগত জাতিতে বিভক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে পালবংশই একমাত্র রাজবংশ, যে বংশের রাজারা ৪০০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। পালবংশের রাজত্বকালই হচ্ছে বাঙলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। তাঁরা যে সাম্রাজ্যিক অভিযান চালিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা গান্ধার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড জয় করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জসমূহের সঙ্গেও তাঁরা সৌহার্দপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের আমলেই বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তাদের আমলে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে। বাঙালীর প্রতিভা বিকাশের এটাই ছিল এক বিস্ময়কর যুগ।

পালেদের (Pala dynasty) পর সেনবংশের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সেনযুগেই প্রথম দৃঢ় রূপ ধারণ করে। পালযুগের ন্যায় সেনযুগেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। এ যুগের বিষ্ণুমূর্তিসমূহ এক অপূর্ব নান্দনিক সুষমায় বিভূষিত। সেনবংশের লক্ষ্মণসেনের আমলেই বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। তারই সঙ্গে আরম্ভ হয় বাঙলায় বিপর্যয়ের যুগ। মূর্তি ও মঠ-মন্দির ভাঙা হয়। হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হয়। আর শুরু হয় ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ। এটাই ছিল ধর্মান্তরকরণের প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্ষিতা নারীকে আর হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হত না। হিন্দুসমাজ এ সময় প্রায় অবলুপ্তির পথেই চলেছিল। এই অবলুপ্তির হাত থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করেন স্মার্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্য। (পৃষ্ঠা ২৪৫)।

তবে ইতিহাসের পাতায় বাঙলার মধ্যযুগ স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের

স্বতঃস্ফূরণের জন্য। আর্যেতর সমাজের দেবতাগণের এই সময় আত্মপ্রকাশ ঘটে, এবং তাদের অবলম্বন করে এক বিরাট 'মঙ্গলসাহিত্য' সৃষ্টি হয়। এছাড়া, অনুবাদ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য ও চৈতন্য জীবনচরিতসমূহ এ যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। তবে এ যুগে নতুন করে একটা সমাজবিন্যাস ঘটে, সে সমাজে উদ্ভূত কৌলীন্যপ্রথা সমাজে এক যৌনবিশৃঙ্খলতা আনে। রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন যে কৌলীন্যপ্রথার ফলে বাঙলায় কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজে এভাবে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টার ফলেই বাঙলার কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ এই কালিমার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়।

বাঙালী সমাজকে আরও বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল যখন এদেশে বিদেশী আসতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরাই প্রথম এদেশে আসে। তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পর্যায়ে শুরু হয় নারীধর্ষণ ও অবৈধ যৌনমিলন। বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে রাখবার ফারমান (firman) পর্তুগীজরা পায় মুঘল দরবার থেকে। কিন্তু পর্তুগীজদের পরে ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন তারা বিনা ফারমানেই বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে রাখতে শুরু করে। এসব মেয়েদের তারা 'বিবিজান' বলত। পুরানো কবরখানা-সমূহের স্মৃতিফলকে এরূপ অনেক বিবিজানের উল্লেখ আছে। এক কথায় সমাজ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথেই চলেছিল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয় নবজাগৃতি (Renaissance)। নবজাগৃতির ফলে সমাজ খানিকটা সুসংহত হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সমাজে আবার প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক শৈথিল্য। বাঙালীর যে প্রতিভা একদিন মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে যে 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow', তা আজ কালান্তরের গর্ভে চলে গিয়েছে। বাঙালী আজ তার নিজ সংস্কৃতির স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। অশনে-বসনে আজ সে হয়েছে বহুরূপী। আজ সে এক বর্ণচোরা জারজ সংস্কৃতির ধারক হয়েছে। বাঙালীর বিবর্তনের এটাই শেষ কথা। আজকের প্রশ্ন—বাঙালী কোন্ পথে ? এই প্রশ্ন রেখেই এই 'গৌড়চন্দ্রিকা' শেষ করছি।

*　　*　　*　　*

বইখানির প্রথম প্রকাশের পর, বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ও নতুন ঐতিহাসিক তথ্য জানা গিয়েছে, তা মূল পাঠের মধ্যেই সংযুক্ত করা হয়েছে। আর বই ছাপা হয়ে যাবার পর যা জানা গিয়েছে সে সম্বন্ধে ৩৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'সংযোজন'-এ উল্লেখিত হয়েছে।

পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই 'সাহিত্যলোক' প্রকাশন-সংস্থার স্বত্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষকে, উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে বইখানা প্রকাশ করার জন্য। শ্রীঅশোক উপাধ্যায় প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করেছেন এবং শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত বর্তমান সংস্করণের নির্ঘণ্ট তৈরি করেছেন, সেজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অতুল সুর

অধ্যায়সূচী

প্রাক্‌ভাষণ

বাঙালী এক প্রতিভাশালী জাতি। তার প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল তার ধর্মীয় চিন্তাধারা, জাতিবিন্যাস, সমাজগঠন ও সংস্কৃতির স্বকীয়তায়। নৃতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে এই প্রতিভাবান জাতি সমগ্র উত্তরভারতের জাতিসমূহ থেকে পৃথক। উত্তরভারতের জাতিসমূহের মধ্যে আগন্তুক আর্যভাষাভাষী 'নর্ডিক' নরগোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত উপাদানেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ ও বিলীন হয়ে গিয়েছে। এর পূর্বদিকে আমরা যে [illegible] উপাদান লক্ষ্য করি তা ক্রমশ বর্ধমান হয়ে বাঙলাদেশে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে [illegible] উপাদানের আবাসস্থান হচ্ছে বাঙলাদেশ। এই নৃতাত্ত্বিক উপাদানে যাদের দেহ গঠিত, তারাই হচ্ছে বাঙালী জাতি। এরাও আর্যভাষাভাষী আর এক নরগোষ্ঠীর বংশধর। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের আল্‌পীয়, দিনারিক, আর্মেনয়েড ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এরা পঞ্চনদের উপত্যকায় আগত নর্ডিক নৃতাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত ঋগ্বেদ রচয়িতা আর্যভাষাভাষী জাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরা ঋগ্বেদ রচয়িতা আর্যগণের পঞ্চনদের উপত্যকায় আসবার অনেক পূর্বেই বাঙলাদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল। এদের ধর্ম, জাতিবিন্যাস, সমাজ ও সংস্কৃতি পঞ্চনদের উপত্যকায় বসবাসকারী আর্যগণের ধর্ম, বর্ণবিন্যাস, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি পৃথক ছিল বলেই পঞ্চনদের আর্যগণ এদের ঈর্ষা ও ঘৃণার চক্ষে দেখত। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণের অভাব নেই। অথচ এদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আর্যদের কৌতুহলও কম ছিল না। এটা আমরা বৌধায়ন ধর্মসূত্র থেকে জানতে পারি। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে বাঙলাদেশ বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র আর্যাবর্তের বাইরের দেশ। অথচ বাঙলাদেশের তীর্থস্থানগুলি এমনই মহিমান্বিত ছিল যে বৈদিক আর্যসমাজগোষ্ঠীর উদার মনোভাবাপন্ন লোকেরা সেসব তীর্থে পুণ্য অর্জন করতে আসতেন। কিন্তু এরূপ উদারমনোভাবাপন্ন লোকদের আর্য-সমাজ ভাল চোখে দেখতেন না। সেজন্যই আমরা বৌধায়ন ধর্মসূত্রে এরূপ উদারমনোভাবাপন্ন বৈদিক আর্যতীর্থযাত্রীর দল যাঁরা বাঙলাদেশে আসতেন, তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার বিধান দেখি।

বাঙলায় বসবাসকারী ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আর্যভাষাভাষীদের এক ঐতিহ্য-মণ্ডিত সংস্কৃতি ছিল। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বৈদিক আর্যসংস্কৃতি থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করত। সেজন্য বৈদিক সংস্কৃতি যখন পূর্বদিকে তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল, তখন প্রাচ্যদেশের প্রত্যন্তসীমায় এসে, তাদের প্রাচ্যদেশের আর্য-ভাষাভাষী লোকদের কাছে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতে আগমনের দেড় হাজার বৎসর পর পর্যন্ত, বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু পরে যখন প্রবেশ করেছিল, তখন বৈদিক আর্যসমাজকে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল প্রাচ্যদেশের কাছে। প্রাচ্যদেশে গুপ্তবংশীয় সম্রাট-গণের আমলেই এটা ঘটেছিল। তখন আর্যসমাজকে ভুলে যেতে হয়েছিল ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে স্তুতিগান করা। তার পরিবর্তে তারা পূজা করতে আরম্ভ করেছিল পৌরাণিক দেব[illegible] ...দের বৈদিক গরিমা ক্রমশ ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

বৈদিক আর্যভাষারও রূপান্তর ঘটেছিল। বাঙলার কবিরা সংস্কৃত ভাষায় যে-সব কাব্য রচনা করতে শুরু করেছিল, তার অভিনব উৎকর্ষের জন্য, তা 'গৌড়ীয় রীতি' নামে এক বিশিষ্ট আখ্যা অর্জন করেছিল। এই রীতিতেই রচনা করে-ছিলেন বাঙলার অমর কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' যার সমতুল কাব্য-গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।

দুই

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। সে ভুলে গিয়েছিল তার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সেজন্যই একশ বছর পূর্বে বঙ্কিম আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে বাঙালীর ইতিহাস নেই। আজ কিন্তু আর সেকথা বলা চলে না। নানা সুধীজনের প্রয়াসের ফলে আজ বাঙলার ও বাঙালীর এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় (১৯১২) ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে রমাপ্রসাদ চন্দ লেখেন 'গৌড়রাজমালা' ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রকাশ করেন 'গৌড়লেখমালা'। তারপর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন তাঁর 'বাঙলার ইতিহাস'। কিন্তু রাখালদাসের বইখানা ছিল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, বাঙালীর জীবনচর্যার ইতিহাস নয়। তিনের দশকে বাঙলার ইতিহাসের একটা কঙ্কাল ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত

করেন বর্তমান লেখক 'মহাবোধি সোসাইটি'র মুখপত্র 'মহাবোধি'তে। চল্লিশের দশকের গোড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বের করে তাদের 'হিষ্ট্রি অভ্ বেঙ্গল'। এই বইটাতেই প্রথম প্রদত্ত হয় বাঙালীর জীবনচর্যার বিভিন্ন বিভাগের ইতিহাস। এর ছ'বছর পরে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় অসামান্য গৌরব অর্জন করলেন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃজন তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব' লিখে। কিন্তু বাঙলার ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক যুগটা শূন্যই থেকে গেল। ষাটের দশকে বর্তমান লেখক তাঁর 'হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল' (১৯৬৩) ও 'প্রি-হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড বিগিনিংস অভ সিভিলিজেশন ইন বেঙ্গল' (১৯৬৫) বই দুটি লিখে বাঙলার প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, [illegible] বাঙলার ইতিহাসকে টেনে আনেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় [illegible] রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বের করেন তাঁর 'একসক্যাভেশনস্ অ্যাট পাণ্ডুরাজার ঢিবি' ও 'প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা'। এর পর (১৯৭১) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পূর্ণ করেন চার খণ্ডে তাঁর 'বাঙলার ইতিহাস'। অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ননীগোপাল মজুমদারের 'ইনস্ক্রিপশনস্ অভ্ বেঙ্গল', ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ডঃ বিনয়-চন্দ্র সেনের 'সাম হিস্টরিক্যাল অ্যাসপেকটস্ অভ্ দি ইনস্ক্রিপশনস্ অভ্ বেঙ্গল' ও ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে ডঃ রমারঞ্জন মুখার্জি ও এস. কে. মাইতির 'করপাস অভ্ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস্'। আশির দশকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বের করলেন তাঁর 'শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত', ও 'পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত'। ইদানিং ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখেরাও আলোকপাত করেছেন বাঙলার ইতিহাসের নানা বিভাগের ওপর।

এদিকে বাঙালীকে সম্যক্‌রূপে বুঝবার চেষ্টাও চলতে লাগল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর 'ইণ্ডো-আরিয়ান রেসেস্' বইয়ে বাঙালীর দৈহিক গঠনে আল্‌পীয় উপাদানের কথা বললেন। এর পনেরো বছর পরে ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বাঙালীর দৈহিক গঠনে আল্‌পীয় রক্ত ছাড়া, দিনারিক রক্তের কথাও তুললেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও এ-বিষয়ে অনুশীলন করলেন। নূতন তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালীর প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের একটা প্রয়োজন অনুভূত হল। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মহাসভার

অনুরোধে বর্তমান লেখক লিখলেন তাঁর 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' (জিজ্ঞাসা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৭, ১৯৭৯ ও ১৯৮৬)। অপরদিকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে কাজ চালালেন প্রবোধকুমার ভৌমিক প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ।

অনেক আগেই বাঙালী সংস্কৃতির সাত-পাঁচের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য পরিভ্রমণ করে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন অবহট্ট ভাষায় 'সন্ধা'-রীতিতে রচিত লুইপাদের 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়', সরোহবজ্রের 'দোহাকোষ' ও কাহ্নপাদের 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব', এই চারখানা বই আবিষ্কার করা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অনেকে অনুশীলন করলেন, যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় [illegible] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বসন্তকুমার [illegible] দাশগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, প্রবোধচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পঞ্চানন চক্রবর্তী, অজিতকুমার ঘোষ, দেবীপদ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, নীলরতন সেন, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ও আরও অনেকে। তাঁদের সকলের অনুশীলনের ফলে, আজ আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয়েছি বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ও বাংলা ছন্দের গতিপ্রকৃতি ও বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে।

তিন

বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাঙলাদেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে)। পৃথিবীতে নরাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্লাওসিন যুগে। এর পরের যুগকে বলা হয় প্লাইস্টোসিন যুগ। এই যুগেই মানুষের আবির্ভাব ঘটে।

যদিও প্লাইস্টোসিন যুগের মানুষের কোনও নরকঙ্কাল আমরা ভারতে পাইনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যে বাঙলাদেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই বাঙলাদেশে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ থেকে। এই আয়ুধসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্লাইস্টোসিন যুগের পাথরের তৈরি হাতিয়ার, যা দিয়ে সে [illegible] আত্মরক্ষা ও পশু শিকার করত, তার মাংস আহারের জন্য। [illegible] পাওয়া [illegible] গেছে বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানা

স্থান থেকে। এগুলোকে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের আয়ুধ বলা হয়। প্রত্নোপলীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে। তারপর সূচনা হয় নব-প্রস্তর বা নবোপলীয় যুগের। নবোপলীয় যুগের অবসানের পর, অভ্যুদয় হয় তাম্রাশ্ম যুগের। তাম্রাশ্ম যুগেই সভ্যতার সূচনা হয়। বাঙলায় তাম্রাশ্ম যুগের ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। এই যুগের সভ্যতার প্রতীক হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতা। বাঙলায় এই সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি।

চার

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের [illegible] এদের প্রাক্-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoids) বলা হয়। [illegible] 'নিষাদ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠীর লোক। এছাড়া, হিন্দুসমাজের তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর। বাঙলায় প্রথম অনুপ্রবেশ করে দ্রাবিড়রা। এরা দ্রাবিড় ভাষার লোক ছিল। বৈদিক সাহিত্যে এদের 'দস্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এদের অনুসরণে আসে আর্য-ভাষাভাষী আল্‌পীয়রা (Alpinoids)। মনে হয়, এদের একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিমসাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কূর্গ, কন্নাড় ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদেরই আর একদল আরও অগ্রসর হয়ে পূর্ব উপকূল হয়ে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। এরাই মনে হয়, বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে বর্ণিত 'অসুর' জাতি। আরও মনে হয়, এদের সকলেরই সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক (tribal) ছিল এবং এই সকল কৌমগোষ্ঠীর (tribes) নামেই পরে এক একটা জনপদের সৃষ্টি হয়।

বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের অন্তত দুটি কৌমগোষ্ঠীর নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল। একটি হচ্ছে 'বঙ্গ' যাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বয়াংসি' বা পক্ষীজাতীয় বলা হয়েছে। মনে হয় পক্ষীবিশেষ ("বিহঙ্গ") তাদের 'টোটেম' ছিল। বৈদিক সাহিত্যে দ্বিতীয় যে নামটি আমরা পাই, সেটি হচ্ছে 'পুণ্ড্র'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাদের 'দস্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মনে হয়, তাদের বংশধররা হচ্ছে বর্তমান 'পোদ' জাতি।

বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের লোকদের বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণার চক্ষে দেখত। এটার কারণ দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাত। বাঙলায় আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত, তাদের মনে এই বিদ্বেষ ছিল।

পাঁচ

মহাভারতীয় যুগে আমরা বঙ্গ, কর্বট, সুহ্ম, প্রভৃতি জনপদের নাম পাই। মহাভারতে বলা হয়েছে যে অসুর রাজা বলির ক্ষেত্রজ সন্তানসমূহ থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে।

বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহ থেকে আমরা বাঙলায় প্রাক্-বৌদ্ধযুগের দুটি রাষ্ট্রের নাম পাই। একটি হচ্ছে শিবি রাজ্য ও অপরটি হচ্ছে চেত রাজ্য। এ দুটি [illegible] বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। বর্ধমান জে[illegible] নিয়ে শিবি রাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগরে (বর্তমান মঙ্গলকোটের নিকটে ও টলেমি উল্লিখিত সিত্রিয়াম বা শিবপুরী)। এরই দক্ষিণে ছিল চেত রাজ্য। তার রাজধানী ছিল চেতনগরীতে (বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত চেতুয়া পরগনা)। এই উভয় রাজ্যেরই সীমান্ত কলিঙ্গ রাজ্যের সীমানার সঙ্গে এক ছিল। কলিঙ্গ রাজ্য তখন বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সিংহল দেশের 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ' নামে দুটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে বঙ্গদেশের বঙ্গ নগরে এক রাজার বিজয়সিংহ নামে এক পুত্র দুর্বিনীত আচারের জন্য সাত শত অনুচরসহ বাঙলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সিংহলে যায়, এবং সেখানে কুবেণী নাম্নী এক যক্ষিণীকে বিবাহ করে সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আলেকজাণ্ডারের (৩২৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) ভারত আক্রমণের সময় বাঙলায় 'গঙ্গারিডি' বা 'গঙ্গারাঢ়' নামে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল। গঙ্গারাঢ়ীদের শৌর্যবীর্যের কথা শুনেই আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর অনতিকাল পরেই বাঙলা তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। কেননা, মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, উত্তর বাঙলা মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কারণ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৩২২-২৯৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) পুণ্ড্রবর্ধন নগরে এক কর্মচারীকে অধিষ্ঠিত করেন। মনে হয় এই সময়

থেকেই আর্যসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বাঙলাদেশে ঘটেছিল। 'মনুসংহিতা' রচনাকালে (২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে) বাঙলাদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হত। কুষাণ সম্রাটগণের (৭৮–১০১) মুদ্রাও বাঙলার নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাঙলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলাদেশ আবার স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময় ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব নামে তিনজন স্বাধীন রাজা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। গোপচন্দ্র ওড়িশারও এক অংশ অধিকার করেন। এর অনতিকাল পরে বাঙলাদেশের রাজা শশাঙ্ক (৬০৬–৬৩৭) পশ্চিমে কান্যকুব্জ ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। এরপর বাঙলাদেশে কিছু-[illegible] অরাজকতা দেখা দেয়। সামন্তরাজগণ এখানে-সেখানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। [illegible]র হাত থেকে বাঙলাদেশকে রক্ষা করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (৭৫০–৭৭০)।

ছয়

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় (৭৫০–৭৭০) থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের সময় (১১৬১–১১৬৫) পর্যন্ত পালবংশই বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। শেষ পালরাজ পলপাল রাজত্ব করেন ১১৬৫ থেকে ১২০০ পর্যন্ত। একই রাজবংশের ক্রমাগত সাড়ে চারশো বছর (৭৫০–১২০০) রাজত্ব করা ভারতের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। গোপালের পৌত্র দেবপাল (৮১০ ৮৪৭) নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত। দেবপালের পিতা ধর্মপাল (৭৭০–৮১০) দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গান্ধার পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। বস্তুত পালরাজগণের রাজত্বকালই বাঙলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ।

পালবংশের পতনের পর বাঙলায় সেনবংশ রাজত্ব করে। এরাও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। সেনবংশের তৃতীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের আমলেই বাঙলা মুসলমানদের হাতে চলে যায়। এ ঘটনা ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর (১২০৪) শুরুতেই। তখন থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাঙলাদেশ স্বাধীন সুলতানদের শাসনাধীনে ছিল। পরের পঞ্চাশ বছর (১৫৩৯–১৫৭৬) বাঙলা পাঠানদের অধীনে চলে যায়। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট আকবরের (১৫৭৬)

আমলে বাঙলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে (১৭৫৭) বাঙলা মুঘলদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

দুই

বাঙলার ধর্মীয় সাধনায় ও লৌকিক জীবনের আচার-ব্যবহারের একটা বিশদ চিত্র পাঠক পাবেন এই বইয়ে। এখানে কেবল বাঙলার সমাজবিন্যাস ও প্রথাসমূহের একটা রূপরেখা টানবার চেষ্টা করব। আগেই বলেছি যে, বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম খুব বিলম্বে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় চাতুর্বর্ণ্য সমাজ-বিন্যাস ছিল না। প্রথমে ছিল কৌমগোষ্ঠিক সমাজ। তারপর যে সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল না, ছিল পদাধিকারঘটিত [illegible]-ভেদ। এটা আমরা জানতে পারি 'প্রথম কায়স্থ', '[illegible]', 'কুটুম্ব' প্রভৃতি নাম থেকে। এসব নাম আমরা পাই সমকালীন তাম্রপট্টলিপি থেকে। তারপর পাই বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম, যথা—'নগরশ্রেষ্ঠী', 'সার্থবাহ', 'ক্ষেত্রকার', 'ব্যাপারী' ইত্যাদি। পরে পালযুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাঙলার বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলি আর বৈবাহিক আদান-প্রদানের সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয় না। তখনই বাঙলার জাতিসমূহ সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পালরাজগণের পর সেনরাজগণের আমলে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে তখন বাঙলায় সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট। সেজন্য 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার আর সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছিল ও তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল—(১) উত্তম সঙ্কর, (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অন্ত্যজ। এরপর আর একটা শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল 'নবশাখ' বিভাগ। নবশাখ মানে যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করত। বিবাহের অন্তর্গোষ্ঠী (endogamous) হিসাবে মধ্যযুগে যে সকল জাতি বিদ্যমান ছিল, তাদের নাম আমরা মঙ্গলকাব্যসমূহে পাই। এ সকল জাতি আজও বিদ্যমান আছে। ময়ূরভট্টের 'ধর্মপুরাণ'-এ যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : "সদ্‌গোপ, কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি / উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি / যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার / নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর / হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি / মাজি বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি / স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার / সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার / ক্ষত্রিয় বারুই

বৈদ্য পোদ পাকমারা / পত্রিল তাম্বের বালা কায়স্থ কেওরা।" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ, পৃ. ৮২)

মধ্যযুগের সমাজজীবনকে কলুষিত করেছিল তিনটি অপপ্রথা (১)—কৌলিন্য (২) সহমরণ ও (৩) দাসদাসীর হাট। এসবের বিশদ বিবরণ আমি দিয়েছি এই বই এ। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ সকল প্রথা বাঙালীসমাজে প্রচলিত ছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকদের প্রচেষ্টার ফলে ইংরেজ সরকার কর্তৃক সহমরণ (১৮২৯) নিবারিত হয়। তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ (১৮৫৬) হয়। পরে অসবর্ণ বিবাহের জন্য 'বিশেষ আইন' প্রণয়ন হয় (১৮৭২)। এই আইনেই মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স করা [illegible] ১৪। আরও পরে (১৮৯২) বিবাহে সঙ্গমের ন্যূনতম বয়সও বর্ধিত করা হয়। [illegible]হের ন্যূনতম বয়সও বাড়ানো হয়। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার হিন্দু বিবাহকে সুসংহত করবার জন্য 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' (১৯৫৫) প্রণয়ন করেন। এই আইন ও পরবর্তী সংশোধিত আইন দ্বারা ন্যূনতম বিবাহের বয়স (পাত্রের ২২, পাত্রীর ১৮) বাড়ানো হয়।

বাঙলা নামের উদ্ভব ও বিবর্তন

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর আবাসভূমিকে বলা হত 'বঙ্গদেশ'। ইংরেজিতে বলা হত 'বেঙ্গল'। 'বেঙ্গল' নামটা দিয়েছিল ইংরেজরা। তারা এটা নিয়েছিল পর্তুগীজদের দেওয়া 'বেঙ্গালা' শব্দ থেকে। 'বেঙ্গালা' শব্দটি মুসলমানদের দেওয়া 'বঙ্গালহ' শব্দের রূপান্তর মাত্র। ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ পাঠান সুলতানরাই 'বঙ্গালহ' শব্দের ব্যবহার শুরু করে। তবে তার আগেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর দুজন বৈদেশিক পর্যটক মার্কো পোলো ও রশিদুদ্দিন তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে 'বঙ্গাল' নামটা ব্যবহার করেছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে [illegible] আকবর যখন বাঙলা অধিকার করেন তখন থেকে 'বঙ্গা[illegible] ভাবে গৃহীত হয়। প্রাক্-মুসলমান যুগে 'বঙ্গাল' বলতে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশের এক অঞ্চল-বিশেষকে বোঝাত মাত্র। এটা 'বঙ্গ' শব্দের ঠিক সমার্থবোধক ছিল না। কেননা, একই সময়ে আমরা 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল'—এই দুই ভিন্ন অংশের বিদ্যমানতা লক্ষ্য করি। 'বঙ্গ' শব্দ দ্বারা বাঙলার এক ব্যাপক অংশকে বোঝাত, যার অবস্থিতি ছিল ভাগীরথীর পূর্বদিকে। ভাগীরথীর পশ্চিমাংশকে বলা হত রাঢ়দেশ। রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিল অঙ্গ দেশ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ। 'বঙ্গ' কোন্ ভাষার শব্দ তা আমরা জানি না। অনেকে মনে করেন যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ প্রাগার্য তিব্বতীয় উৎস থেকে উদ্ভূত। অনেকে আবার 'বঙ্গ' শব্দটি মুণ্ডারী ভাষার শব্দ বলে মনে করেন। এখানে উল্লেখনীয় যে বঙ্গ, বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দগুলি চর্যাগীতে আছে।

প্রথমে 'বঙ্গ' শব্দটি ছিল এক কৌমগোষ্ঠীর নাম। পরে এটা ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসাবে 'বঙ্গ' নামটির সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্যরাও পরিচিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা বঙ্গের নাম প্রথম পাই। সেখানে বঙ্গবাসীদের 'বয়াংসি' বা পক্ষিজাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বোধ হয় পক্ষিবিশেষ তাদের 'টোটেম' ছিল। আরও যাদের নাম আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই তারা হচ্ছে 'পুণ্ড্র'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের 'দস্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মোট কথা, বৈদিক সাহিত্যে আমরা বাঙলাদেশের অধিবাসীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করি। এমনকি, বৌধায়ন ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত আমরা

এ বিদ্বেষ অব্যাহত দেখি। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুযায়ী পুণ্ড্রদের অবস্থিতি ছিল উত্তরবঙ্গে, আর বঙ্গদের মধ্যপূর্ববঙ্গে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে তাদের আর্যাবর্তের বাইরের লোক বলা হয়েছে। তার মানে, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি আর্যদের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে পৃথক ছিল। তবে তাদের দেবতাগণকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশে অনেক তীর্থস্থান ছিল, এবং এই সকল তীর্থস্থান আর্যরাও দর্শন করতে আসত। তার আভাস আমরা বৌধায়ন ধর্মসূত্রে পাই।

দুই

কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত রচনার যুগে আমরা বাঙলাদেশের লোকদের প্রতি [illegible] বিদ্বেষভাব আর লক্ষ্য করি না। মহাভারত রচনার যুগে আমরা বঙ্গ, কর্বট [illegible]দের নাম পাই। জৈনদের প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক আচারাঙ্গ সূত্রে আমরা 'লাঢ়' বা 'রাঢ়' দেশের নামেরও উল্লেখ পাই। সেখানে রাঢ়দেশের দুই বিভাগের কথা বলা হয়েছে—বজ্জভূমি (বজ্রভূমি) ও সুব্বভূমি (সুহ্মভূমি)। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহেও আমরা সুহ্মদের উল্লেখ পাই। তাছাড়া, প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের দুই জনপদের নাম পাই—শিবি ও চেত।

আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত 'গঙ্গারিডি' বা 'গঙ্গারাঢ়' দেশের লোকদের শৌর্যবীর্যের কথা শুনেই বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্লিনি, টলেমি ও অন্যান্য গ্রীসদেশীয় লেখকগণও গঙ্গারাঢ় দেশের উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'প্রাসাই' বা প্রাচ্যদেশের কথা শুনতে পাই। প্রাচ্যদেশের কথা পাণিনিও উল্লেখ করে গেছেন। টলেমি বাঙলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গানদীর পাঁচটি শাখার কথাও উল্লেখ করেছেন। এই গঙ্গানদীর ওপর অবস্থিত 'গঙ্গা' নামে এক বাণিজ্যকেন্দ্রেরও উল্লেখ পাই। এ নামটা 'পেরিপ্লাস অভ দি ইরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে।

তিন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরবর্তী কালে যেটা বাঙালীর আবাসভূমি 'বঙ্গদেশ' নামে অভিহিত হত, সেটা প্রাচীনকালে বহু জনগোষ্ঠীর আবাসস্থান হয়ে বহু জনপদে বিভক্ত ছিল। অন্তর্বর্তী কালে এদের অনেক নাম ছিল, যথা—গৌড়, বঙ্গ, সমতট,

চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বারক, কঙ্কগ্রাম, বর্ধমান, কজঙ্গল, দণ্ডভুক্তি, খাড়ি, নাব্য ইত্যাদি। এদের ভৌগোলিক সীমারেখা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ছিল। ভাগীরথীকে সীমারেখা ধরলে তার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল কজঙ্গল, রাঢ়, কঙ্কগ্রাম, কর্বট, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত ও দণ্ডভুক্তি। আর ওর পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত ছিল পুণ্ড্র, গৌড় ও বরেন্দ্র; মধ্যভাগে বঙ্গ, ও দক্ষিণে হরিকেল, সমতট, বঙ্গাল, খাড়ি ও নাব্য। শেষোক্ত অঞ্চলগুলি পূর্ববাঙলার দক্ষিণাংশের উপকূলবর্তী দেশ ছিল।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গ মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এর সপক্ষে যে প্রমাণ আছে তা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্য-যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত এক লিপি। তবে সমগ্র বাঙলাদেশ যে মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, তার সপক্ষে কোন সুনিশ্[illegible] নেই। (তুলনীয় নোয়াখালি জেলার শিলুয়ায় প্রাপ্ত [illegible] প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এক মূর্তিলেখ)। সম্ভবত গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েই সমগ্র বাঙলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এবং সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হয়েছিল। তবে তখনও বাঙলাদেশের অংশবিশেষ, যথা—'সমতট' যে প্রত্যন্ত রাজ্যভুক্ত ছিল তার প্রমাণ আমরা আলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে পাই। কিন্তু যদিও গুপ্তসম্রাটগণের আমলে বাঙলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই একত্রিত হয়েছিল, তথাপি গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের পর যখন গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাঙন ঘটল, তখন বাঙলা-দেশের বিভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে উঠল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাতখানা তাম্রশাসন থেকে এই রাজ্যের তিনজন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিধারী রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হচ্ছেন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব। তাঁদের এলাকাভুক্ত ছিল কর্ণ-সুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা)। এটাই তখনকার দিনের বঙ্গরাজ্য ছিল। বোধ হয়, একেই কেন্দ্র করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলাদেশে 'মাৎস্যন্যায়'-এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই অরাজকতার হাত থেকে বাঙলাদেশকে উদ্ধার করেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৭৫০) 'প্রকৃতিপুঞ্জ' কর্তৃক মনোনীত পালসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। নবম ও দশম শতাব্দীর লিপিসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পালযুগের শেষভাগে বঙ্গদেশ উত্তর ও অনুত্তর, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ বাঙলায় চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ জেলায়) নামেও এক রাজ্য

ছিল। এই রাজ্যের তাম্রশাসন থেকে আমরা লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র নামে দুই রাজার নাম পাই।

সেনরাজগণের আমলেও বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—বিক্রমপুর ভাগ ও নাব্য। একাদশ শতাব্দীর লিপিসমূহেই আমরা প্রথম 'বঙ্গাল' দেশের উল্লেখ পাই। এই 'বঙ্গাল' শব্দই মুসলমান যুগে বঙ্গদেশকে 'বঙ্গাল' নামে অভিহিত করতে সহায়তা করে। মুঘলসাম্রাজ্যের এটা ছিল পূর্বতম সুবা এবং এর বিস্তৃতি ছিল ভাগীরথীর পূর্বপ্রান্ত থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। রাজস্ব আদায়ের জন্য তোডরমল কর্তৃক ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত 'আসল-ই-জমা-তুমার' নামক তালিকা অনুযায়ী সম্রাট আকবরের সময় বাঙলাদেশ ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। তার অন্তর্ভুক্ত [illegible]২টি মহাল। বাঙলাদেশ থেকে দিল্লীর মুঘলদরবারে প্রেরিত রাজস্বের পরিম[illegible]৩,০৬৭ আকবরশাহী টাকা। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় নূতন নূতন অঞ্চল জয়ের পর ওই তালিকা সংশোধিত হয়। তখন বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হয় হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, কোচবিহারের অংশবিশেষ, পশ্চিম আসাম, ত্রিপুরা, ছোটনাগপুরের অংশবিশেষ ও সুন্দরবন। এই পরিবর্ধিত তালিকায় আমরা বাঙলাদেশকে ৩৪টি সরকারে বিভক্ত দেখতে পাই। তখন এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৩৫০টি মহাল এবং রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। পরে কি দাঁড়িয়েছিল সেটা বলবার আগে আমরা গৌড়ের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলে নিতে চাই।

চার

গৌড় নামটিও বেশ প্রাচীন। পণ্ডিতমহল মনে করেন যে এক সময় বাঙলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হত ও তা থেকে গুড় উৎপাদন হত এবং এই গুড় থেকেই 'গৌড়' নামের উৎপত্তি। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ আমরা গৌড়দেশের পণ্যের উল্লেখ পাই। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'-এও গৌড় রাজ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইতিহাসে গৌড়ের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কিছু পূর্বে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে গৌড়কে বাঙলার অংশবিশেষ বলে বর্ণনা করে গেছেন। বাঙলার অপর অংশগুলির তিনি যে নাম করে গেছেন সেগুলি হচ্ছে গৌড়ক, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তিক, বঙ্গ, সমতট ও বর্ধমান। এই ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার হরাহা শিলালেখে

সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী গৌড়গণের সঙ্গে তাঁর বিবাদের কথা আছে। ভবিষ্যপুরাণে গৌড়দেশকে বর্ধমানের উত্তরে ও পদ্মার দক্ষিণে অবস্থিত বলা হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে 'অনর্ঘ-রাঘব'-এর লেখক মুরারি মিশ্র লিখে গেছেন যে, গৌড়ের রাজধানী ছিল চম্পায়। অনেকের মতে মদারণ সরকারের অন্তর্ভুক্ত চম্পানগরী ও চম্পা অভিন্ন। এর অবস্থিতি ছিল দামোদর নদের তীরে বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমে।

ইতিহাসে যখন গৌড়ের অভ্যুত্থান হয় তখন গৌড়দেশ বলতে পশ্চিম-বাঙলার মালদহ-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলকেই বুঝাত। বস্তুত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সুযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত (বহরমপুরের নিকট ভাগীরথীতীরস্থ) প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরকে কেন্দ্র করে স্বাধীন গৌড়[illegible] উদ্ভব হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশা[illegible]সনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলা ও ওড়িশার কিছু অংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করে গৌড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি মগধও অধিকার করেছিলেন। এই সময় শশাঙ্ক মালবের উত্তরকালীন গুপ্তরাজগণের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সহায়তায় মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করে কান্যকুব্জ জয় করেন। এর আগে মালবরাজের সহায়তায় শশাঙ্ক কামরূপের সুস্থিতবর্মা ও তাঁর পুত্রদের পরাজিত করে কামরূপও অধিকার করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই গ্রহবর্মার শ্যালক থানেশ্বরাধিপতি হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে আধিপত্য স্থাপন করেন। তখন কিছুকালের জন্য গৌড়রাজ এদের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার মৃত্যুর পর গৌড়রাজ আবার নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে গৌড়-রাজ্যের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটে। বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ফলে গৌড় নূতন মর্যাদা লাভ করে। তার ফলে ওই সময় গৌড়ীয় ভাষা ও কাব্যরচনা-রীতির প্রসিদ্ধি ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত গৌড়রাজ 'মগধেশ্বর' উপাধি বহন করতেন। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মা 'মগধেশ্বর' গৌড়রাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর বাঙলায় অরাজকতা দেখা দেয় এবং পরে পালরাজগণের অভ্যুত্থান ঘটে। পালরাজগণকে গৌড়, বঙ্গ ও বঙ্গালদেশের (আবুল ফজলের মতে বঙ্গ + আল =

বঙ্গাল) অধীশ্বর বলা হত। দ্বিতীয় পালরাজ ধর্মপাল উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। লক্ষণসেনকে পরাজিত করে মুসলমানরা যখন বাঙলাদেশ অধিকার করে, তখন তারা নিজেদের 'গৌড়রাজ' বলে অভিহিত করত। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘলসম্রাট আকবর বাঙলাদেশ অধিকার করেন এবং সেই সঙ্গেই গৌড়ের রাজনৈতিক সত্তা বিলুপ্ত হয়। তখন থেকেই সমগ্র বাঙলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গাল' নাম ধারণ করে। বাঙলা তখন মুঘলসাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয়। পরবর্তী ২০০ বৎসর 'বাঙলা' মুঘল সম্রাটগণের অধীনে থাকে।

পাঁচ

[illegible]র যুদ্ধের পর বাঙলা ইংলণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশ সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীন হয়। মুঘলদের দেওয়া নামের অনুকরণে পর্তুগীজরা বাঙলাদেশকে **Bengala** নামে অভিহিত করত। ইংরেজদের হাতে যাবার পর এর নাম হয় **Bengal**। ইংরেজ শাসনাধীনে নানা সময় এর আয়তন ও সীমারেখার পরিবর্তন ঘটে।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারের ১৭৫৮ নং আদেশ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তখন ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ ভারত ১২টি বিভিন্ন শাসন-বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—(১) বেঙ্গল, (২) বোম্বে, (৩) মাদ্রাজ, (৪) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, (৫) পঞ্জাব, (৬) আসাম (ইহা ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হয়), (৭) মধ্যপ্রদেশ, (৮) ব্রিটিশ ব্রহ্ম, (৯) বেরার, (১০) মহীশূর ও কুর্গ, (১১) রাজপুতানা এবং (১২) মধ্যভারত। সুতরাং ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলার আয়তন ছিল পঞ্জাবের পূর্বসীমান্ত থেকে ব্রিটিশ-ব্রহ্মের সীমান্ত পর্যন্ত। তার মানে, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশা এবং আসাম বাঙলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু নানারকম রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার বাঙলাদেশকে খর্ব করবার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাকে ক্রমশ ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকেও পৃথক করে একজন চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ্ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন যে, বাঙলাদেশকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করা হোক। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী

প্রচণ্ড আন্দোলন চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। আসাম, ঢাকা-বিভাগ, চট্টগ্রাম-বিভাগ, পার্বত্যত্রিপুরা, দার্জিলিং ও সমগ্র রাজশাহী-বিভাগ একত্রিত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। কিন্তু দেশব্যাপী ক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে ঘোষণার দ্বারা বঙ্গভঙ্গ রহিত করেন। এর ফলে দার্জিলিং, ঢাকা-বিভাগ, চট্টগ্রাম-বিভাগ ও রাজশাহী-বিভাগসমূহকে পুনরায় বাঙলার সহিত যুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিহার ও ওড়িশা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় ও ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতালাভের শর্ত হিসাবে বাঙলাকে আবার দ্বিখণ্ডিত করা হয়—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন কর[illegible] পরিচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আছে ১৬টি জেলা, যথা—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমদিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা (মার্চ ১৯৮৬ হতে উত্তর ও দক্ষিণ), কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূম। আর বাংলাদেশে আছে ২১টি জেলা, যথা—দিনাজপুর, রঙপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, টাঙ্গাইল, মৈমনসিং, জামালপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, সীলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা ও বান্দরবন। বাংলাদেশের বর্তমান আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতালাভের পূর্বে বাঙলার মোট আয়তন ছিল ৭৭,৫২১ বর্গমাইল। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন দাঁড়ায় ৩৩,৯২৮ বর্গমাইল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বঙ্গ' নাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

বাঙলার ভূতাত্ত্বিক চঞ্চলতা ও নদনদী

প্রায় ৪৫০ কোটি বৎসর পূর্বে ভারত ছিল উত্তপ্ত মৌলিক ভূতাত্ত্বিক স্তরে আবৃত। এই স্তর ক্রমশ শীতল হয়ে যে শিলায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তাকে বলা হয় 'আর্কিয়ান' শিলাবিন্যাস। এই স্তরেরই বিবর্তনের কোনও এক যুগে ভারতের মধ্য-অঞ্চলকে আলোড়িত করে বিন্ধ্যপর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি-অঞ্চলই ভারতের প্রাচীনতম অংশ। এর পরে সৃষ্ট হয়েছিল হিমালয়ের পর্বতমালা। হিমালয় ও বিন্ধ্য—এই দুই পর্বতের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে আবির্ভূত [illegible] মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল গঙ্গানদী।

[illegible] প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা বাঙলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত রাজমহল-শৈলে প্রতিহত হয়ে দক্ষিণপথে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এসব কথা যত সহজভাবে বলা হচ্ছে, তা তত সহজে ঘটেনি। কোটি কোটি বৎসর ধরে চলেছিল ভূতাত্ত্বিক আলোড়ন ও রূপান্তর। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে বাঙলাদেশ প্লাবিত হয়েছিল সমুদ্রের জলরাশিদ্বারা। আবার জলরাশি যখন অপসৃত হয়েছিল তখন রেখে গিয়েছিল স্তরে স্তরে পলিমাটি। সমুদ্রের জলের এই বিস্তারের পরিসমাপ্তি ঘটে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যাকে বলেন প্রাওসিন যুগ (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে)। কিন্তু এই পরিসমাপ্তির পূর্বেই গঠিত হয়েছিল রাজমহল থেকে শুরু করে গারো ও নাগা-পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত শিলাস্তর-বিন্যাস। এগুলি হিমালয়েরই কতকগুলি শিলাশাখা দক্ষিণাভিমুখী হয়ে প্রসৃত হয়েছে। উত্তরে হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত দার্জিলিং-এর শৈলশৃঙ্গ ও পশ্চিমে বিন্ধ্য-পর্বতের শাখা হিসাবে সাঁওতাল পরগনার পর্বতমালা বাঙলাকে বেষ্টন করে রেখেছে। এ ছাড়া, বাঙলার অভ্যন্তরে আর বিশেষ কোন পাহাড় পর্বত নেই। যা আছে তা হচ্ছে বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া, মশক ও বিহারীনাথ এবং পুরুলিয়া জেলায় অযোধ্যা ও বাগমুণ্ডি পাহাড়।

বাঙলার এই ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে আমি আমার 'হিস্ট্রী অ্যাণ্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল' (১৯৬৩) বইয়ে কিছু বিশদ বিবরণ দিয়েছি। তা এখানে উদ্ধৃত করছি :

Bengal, as we know it today, is the product of a long process of geological formation. Widespread marine transgressions

followed by regressions with consequent uplifts featured its geologic history down to Pleistocene time It is believed that the latest of such regressions and uplifts are responsible for the development of the tertiary folded belt of Tripura, the pronounced uplift of the Shillong massif, and the less conspicuous uplift of the Garo-Rajmahal basement ridge. In spite of a long history of transgressions and uplifts, the beds constituting the western half of the Bengal delta have very low dips and the predominant structural deformation affecting the sediments are faults that were presumably developed at a number of di[illegible] stages in the geologic history of the basin. [illegible]ral basin is floored with Quaternary sediments deposited by the Ganges and Brahmaputra rivers and their numerous associated streams and distributaries. The Rajmahal Hills, which border the basin on the north-west and west are composed of traps and are considered to be lower Jurassic of the Upper Gondwana system. The hills and trap plateaus range from 500 to 800 feet above sea level, although some individual hills exceed 1500 feet in elevation. Physiographically the hill section is sharply differentiated from the lower, flat Quaternary alluvial and deltaic surfaces to the east. The Bengal basin is bounded on the north-east by the Shillong or Assam Plateau, locally known from west to east, as the Garo, Khasi, and Jaintia hills. The elevations of plateau summits range between 4500 and 6000 feet. The basement rocks are overlain by horizontal sandstone and nummulatic limestone. On the eastern side the Bengal basin is bounded by the Tipperah hills to the north and the Chittagong hills to the south. (Dr. A. K. Sur, "History & Culture of Bengal", 1963. page 17).

দুই

যুগযুগ ধরে বাঙলার চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়েছে বাঙলার নদনদীসমূহ। একদিকে যেমন নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে তীরবর্তী অংশসমূহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, অপরদিকে তেমনই নদীগর্ভে অধিক পলিমাটি অবক্ষেপণের ফলে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ নদী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। কোনও কোনও স্থলে আবার নদীর গতির পরিবর্তন ঘটার ফলে নদী ছোট-বড় নদীতে বিভক্ত হয়ে অঞ্চল-বিশেষে জটাজালের সৃষ্টি করেছে। আবার কোনও কোনও স্থলে নদীর গতির পরিবর্তনের ফলে ঐশ্বর্যশালী গ্রামসমূহ তাদের প্রাচীন সমৃদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

[illegible] এইরূপ ভূসংস্থানগত চঞ্চলতা যে এখনও শেষ হয়নি, তা বাঙলার নদী-সমূহের [illegible] থেকে বুঝতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত গঙ্গানদীর স্রোত রাজমহলের পাহাড় অতিক্রম করবার পর বর্তমান মালদহের অনতিদূরে প্রাচীনকালে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গৌড়নগরের উত্তর দিয়ে এসে পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হত। এখন গঙ্গা ২৫ মাইল দক্ষিণে সরে এসে সূতীর কাছে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে, ভাগীরথী ও পদ্মা নদীদ্বয়ে। আগে ভাগীরথীই প্রধান স্রোতোধারা ছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে পদ্মাই প্রধান স্রোতস্বতীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া গঙ্গা আগে ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা—এই ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরে প্রবেশ করত। এককালে এদের মধ্যে সরস্বতীই ছিল বড় নাব্য নদী এবং রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশাল নদীতে পরিণত হয়েছিল। এই নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলে এর তীরস্থিত প্রাচীন-কালের প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত ও পরবর্তীকালের সপ্তগ্রাম বিনষ্ট হয় এবং ভাগীরথীর কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রথমে হুগলী ও পরে কলকাতা বন্দর হিসাবে প্রাধান্যলাভ করে। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভাগীরথীরও স্রোতোপথের পরি-বর্তন ঘটেছে। পূর্বে ভাগীরথী কলকাতা অতিক্রম করবার পর পশ্চিমে শিবপুর অভিমুখে না গিয়ে সোজা দক্ষিণে কালীঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হত। বর্তমানে আদিগঙ্গার শুষ্ক খাতই ভাগীরথীর পূর্বখাতের চিহ্ন বহন করছে।

পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং লাঙ্গলবন্দের শুষ্কপ্রায় খাতে এখন তার চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানকালের মেঘনানদী অপেক্ষা-

কৃত পরবর্তীকালের সৃষ্টি। স্থলভাগে দক্ষিণবঙ্গেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার বিল-অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মানদী উচ্চতর প্রদেশ থেকে মাটি বহন করে এনে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের যে বিস্তৃতি সাধন করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোগলযুগেও সুন্দরবন সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে ও মগ দস্যুদের উৎপীড়নে সুন্দরবন তার সমৃদ্ধি হারায়।

দামোদর পালামৌ জেলার টোরির নিকট উচ্চগিরিশৃঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়ে সর্পিলগতিতে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে কলকাতার ৩০ মাইল দক্ষিণে হুগলীনদীতে গিয়ে পড়েছে।

বাঙলা নদীবহুল দেশ। অসংখ্য তাদের নাম। তাদের মধ্যে এক[illegible] সাঁওতাল-পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে উদ্ভূত হয়ে বীরভূ[illegible] বর্ধমান জেলার সীমান্ত কিছুদূর পর্যন্ত নির্দেশ করে দিয়ে অজয় কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীতে প্রবেশ করেছে। বর্ষার জলে পুষ্ট এই নদীটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও নাব্য ছিল। এর উত্তরে ছিল উত্তর-রাঢ় বা কঙ্কগ্রামভুক্তি, দক্ষিণে দক্ষিণ-রাঢ় বা বর্ধমানভুক্তি। কংসাবতী ও রূপনারায়ণ-অঞ্চলে ছিল সুহ্মদেশ ও তার দক্ষিণে ছিল দণ্ডভুক্তি। ওদিকে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার অন্তবর্তী ভূভাগে ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি। এর রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর বা বাণগড়। এর দক্ষিণে ছিল বঙ্গদেশ এবং তার দক্ষিণে ছিল হরিকেল ও বঙ্গালদেশ।

তিন

গঙ্গাই বাঙলার প্রধান নদী। হিমালয়ের গাড়বাল পার্বত্য অঞ্চলে গঙ্গোত্রী থেকে উৎপন্ন হয়ে সারা উত্তরভারতের ওপর দিয়ে এসে গঙ্গা রাজমহল পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমে তেলিয়াগড় ও সকরিগলির সংকীর্ণ খাত অতিক্রম করে গিরিয়ার নিকট বাঙলাদেশে প্রবেশ করেছে। এখান থেকে গঙ্গার একটা ধারা দক্ষিণদিকে ও অপর ধারা দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণ ধারাটি মালদহের গৌড়শহরের ধ্বংসাবশেষের ধার দিয়ে প্রবাহিত। এখানে হিমালয় থেকে আগত মহানন্দা এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একসময় গঙ্গানদী গৌড়নগরের আরও উত্তর-পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হত এবং গৌড়নগর বোধ হয় এর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল।

গঙ্গার এই ধারাটি আরও দক্ষিণে বহরমপুর, নবদ্বীপ, কালনা, চুঁচুড়া চন্দননগর, কলকাতা প্রভৃতি শহরের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই অংশ ভাগীরথী নামে পরিচিত। কেননা ভগীরথের শাপগ্রস্ত মৃত পূর্ব-পুরুষদের আত্মার উদ্ধারকল্পে গঙ্গার মর্তে আগমন-বৃত্তান্তের সঙ্গে এ অংশ জড়িত। চুঁচুড়ার অদূরে ত্রিবেণীতে ভাগীরথীর শাখানদী সরস্বতী ও যমুনার সঙ্গমস্থল। ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য প্লিনির যুগেও (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) খ্যাত ছিল। কলকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহপথ আদিগঙ্গা নামে পরিচিত। এরই তটে কালীঘাটের মন্দির। এই পথেই আসত গ্রীক ও রোমান জগতের বণিকেরা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য করতে। মধ্যযুগে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল'-এ [illegible] এই নদীপথে বাণিজ্যতরীর যাতায়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পর্তু-গীজরাও এই জলপথ ব্যবহার করত। চৈতন্যদেবও (১৪৮৫-১৫৩৩) এই নদী-পথের ওপর অবস্থিত ছত্রভোগ দর্শন করে তমলুক হয়ে, সেখান থেকে পুরী গিয়েছিলেন। এই প্রাচীন প্রবাহপথ ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লুপ্ত হয়েছিল, কেননা ওই বৎসর কর্নেল টলি খিদিরপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত এই কয়েক মাইল আংশিক পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ওলন্দাজ ফান ডেন ব্রুকের (১৬৬০) মানচিত্রে সাগরদ্বীপের উত্তর-পূর্বে বর্তমান কাকদ্বীপ পর্যন্ত চিহ্নিত দেখা যায়। কিন্তু একশত বৎসর পরে রেনেলের মানচিত্রে এই স্রোতোধারা আর অঙ্কিত দেখা যায় না। জয়নগর থানার দক্ষিণ পর্যন্ত নানা পুরানো মন্দির, ঘাট, পুকরিণী এই লুপ্ত নদী-পথের স্বাক্ষর বহন করছে।

গঙ্গার দক্ষিণ-পূর্ব ধারা পদ্মা নামে পরিচিত। গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা ব্রহ্ম-পুত্রের প্রধান শাখা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। কৃত্তিবাস ও রেনেল একেই গঙ্গা বলেছেন। অনেকে মনে করেন যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই পদ্মার সূত্র-পাত। আবুল ফজল বলে গেছেন যে, কাজিহাটার কাছে গঙ্গা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পদ্মাবতী নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ পূর্বাপেক্ষা আরও দক্ষিণ-পূর্বে সরে গিয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

গত চার শতকে পদ্মার গতির বহু পরিবর্তন ঘটেছে। বোধ হয় পদ্মা পূর্বে রামপুর-বোয়ালিয়ার গা ঘেঁষে চলনবিলের ভিতর দিয়ে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গাকে

অবলম্বন করে ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে মেঘনায় গিয়ে মোহানায় পড়ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মার নিম্নস্রোত আরও দক্ষিণে ছিল এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের ভিতর দিয়ে চাঁদপুরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে শাহ্ বাজপুরের দ্বীপের উত্তরদিকে মেঘনার মোহনায় প্রবেশ করত। কালীগঙ্গা মেঘনাকে পদ্মার সঙ্গে সংযুক্ত করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার প্রধান স্রোত কীর্তিনাশার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হত। পরে পদ্মা তার বর্তমান গতিপথ অবলম্বন করে।

গঙ্গার দক্ষিণধারার নিম্নপ্রবাহে গঙ্গাসাগর অবস্থিত। এখানে এক দ্বীপের ওপর কপিলমুনির আশ্রম। এই দ্বীপের নাম সাগরদ্বীপ। অনেকের মতে সাগরদ্বীপে প্রতাপাদিত্যের (১৫৬৭-১৬১২) রাজধানী ছিল। এককালে এই অঞ্চল যে সমৃদ্ধিশালী ছিল, তার প্রমাণ উত্তরের জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি ও মন্দিরগুলি থেকে পাওয়া যায়। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে এক ভাষণ জলপ্লাবনে এই দ্বীপ জনহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নদীসমূহ, যথা,—ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা ও কাঁসাই প্রভৃতি ছোটনাগপুরের উচ্চভূমি থেকে নির্গত হয়ে ভাগীরথীতে এসে পড়েছে। এ নদীগুলি বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল। খাঁড়ি, বাঁকা ও বেহুলা নদী দামোদরের প্রাচীন খাত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিন্তু আজ এ নদীগুলির সঙ্গে দামোদরের কোন যোগ নেই।

উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হচ্ছে তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, পুনর্ভবা আত্রেয়ী, মহানন্দা প্রভৃতি। বর্ষার জলে এসকল নদীর দু'কূল ছাপিয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। তিস্তার জল বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারকে প্লাবিত করে।

দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে মুড়িগঙ্গা, সপ্তমুখী, ঠাকুরান, মাতলা, ইছামতী, পিয়ালী, বিদ্যাধরী, গোসাবা, হাড়িগঙ্গা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। এগুলি বেশ চওড়া এবং অনেকে মনে করেন এগুলি একসময় গঙ্গার মোহানা ছিল। এগুলির জল লোনা। সেজন্য এ জল পানীয় হিসাবে বা সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

সরস্বতী পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় অবস্থিত ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী থেকে নির্গত হয়ে হুগলি ও হাওড়ার ভিতর দিয়ে পুনরায় ভাগীরথীর নিম্নস্রোতে

মিলিত হয়েছে। পূর্বে এটাই ছিল ভাগীরথীর প্রধান খাত এবং বাঙালী বণিকেরা এই পথেই বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত। প্রাচীন বন্দর ও শহর সপ্তগ্রাম এরই তীরে অবস্থিত ছিল। এই সপ্তগ্রামই ছিল পূর্বভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ও শহর। একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এর গৌরব অব্যাহত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সরস্বতী সপ্তগ্রামের পা ঘেঁষে প্রবাহিত হত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর সপ্তগ্রাম সরস্বতী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। পরে সরস্বতীর খাত শুষ্ক হবার পর সপ্তগ্রামের তথা প্রাচীন বাঙলার গৌরব-রবি অস্তমিত হয়। পরে হুগলি নদী ও কলকাতা শহরের অভ্যুত্থান ঘটে।

চার

নদীই বাঙলার ইতিহাসের স্রষ্টা। নদীই বাঙালীর চরিত্রকে গঠন করেছে ও তার সমাজ ও ইতিহাসকে বৈচিত্র্যময় করেছে। নদীই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। নদী-বহুল দেশে বাস করে বলে বাঙালী মেয়েরা হাতে শাঁখা পরে ও মাছ খায়। উত্তর-ভারতের লোক মাছ খায় না। নদীই বাঙলাকে শস্যশ্যামল করে তুলেছে। নদীই বাঙালীকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত করেছিল ও বাঙালী বণিককে 'সাতসমুদ্দুর, তের নদী' পার হয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল। আবার এই নদীই বাঙলার বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশী বণিককে, যে বণিক তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছিল। নদী যেমন একদিকে বাঙলাকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল, আবার অপরদিকে তাকে দীনহীন করেও ছেড়ে দিয়েছিল।

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালী বলতে আমরা মাত্র তাদেরই বুঝি যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা বাঙলাদেশে এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক। তার মানে, বাঙলার এক স্বকীয় ভাষা ও এক বিশেষ সংস্কৃতি আছে।

বাঙলার স্বকীয় ভাষা হচ্ছে বাংলা। অন্যান্য রাজ্যের ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এ ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল বাঙলার আদিম অধিবাসীরা। তারা যে প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত এই গোষ্ঠীর লোকদের [illegible] শব্দসমূহের প্রাচুর্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই নরগোষ্ঠী[illegible] ওপরই পরবর্তীকালে অন্যান্য নরগোষ্ঠীসমূহ স্তরীভূত হয়েছিল। এই অন্যান্য নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল দ্রাবিড়-ভাষাভাষী, আর্য-ভাষাভাষী জাতিসমূহ ইত্যাদি। এদের সকলেরই ভাষা বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।

দুই

প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকরাই বাঙলার প্রকৃত আদিবাসী। তারা যে ভাষায় কথা বলে তাকে 'অষ্ট্রিক' ভাষা বলা হয়। 'অষ্ট্রিক' বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই ভাষার বিস্তৃতি ছিল পঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। ভারতে এই ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে 'মুণ্ডারী' ভাষা—যে ভাষায় সাঁওতাল, ভীল, কুরুম, কোরওয়া, জুয়াঙ, কোরকু প্রভৃতি উপজাতিরা কথা বলে। যদিও 'অষ্ট্রিক' ভাষার শব্দ ভারতের সব ভাষার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও বাংলাভাষায় এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তবে বাংলাভাষাও এদের ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

'অষ্ট্রিক'-ভাষাভাষী লোকদের পরে এদেশে এসেছিল, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকরা। তারা ক্রমশ মিশে গিয়েছিল আদিম 'অষ্ট্রিক'-ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে। দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকদের পর এসেছিল আর্য-ভাষাভাষী এক নর-গোষ্ঠী। এরা ইউরোপের 'আলপাইন' নরগোষ্ঠীর সমতুল। ভারতের বর্তমান জনতার মধ্যে এদের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় পশ্চিমে বারাণসী থেকে পূর্বে বাঙলাদেশ

পর্যন্ত। তবে বাঙলাদেশেই এই নরগোষ্ঠীর বংশধরদের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সেজন্য মনে হয় তারা সমুদ্রপথেই বাঙলাদেশে এসেছিল এবং পরে এখানে বসতি স্থাপনের পর ক্রমশ পশ্চিমদিকে উত্তরপ্রদেশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। এরপর ভারতে এসেছিল আর্য-ভাষাভাষী আর এক নরগোষ্ঠী। তারা উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের উপত্যকায় বসবাস শুরু করেছিল। এরাই রচনা করেছিল ঋগ্বেদ। এরা ক্রমশ পূর্বদিকে নিজেদের বিস্তৃত করেছিল বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত। এখানে এসেই তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের লোকদের কাছে। প্রাচ্যদেশের লোকরা ছিল এক পৃথক সংস্কৃতির বাহক এবং শৌর্যবীর্যে তারা ছিল বৈদিক আর্যদের চেয়ে অনেক

তিন

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচ্যদেশের আদিম অধিবাসীরা ছিল 'অস্ট্রিক'-ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক্-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ত্রাল বলা হয়। এদের আদি-অস্ত্রাল বলবার কারণ হচ্ছে এই যে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিল আছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের রক্তের মিলও আছে। মানুষের রক্ত সাধারণত চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—'ও', 'এ', 'বি' এবং 'এ-বি'। ভারতের প্রাক্-দ্রাবিড় ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এই উভয়ের রক্তেই 'এ' এগ্লুটিনোজেনের ('A' Agglutinogen) শতকরা হার খুব বেশী। তা থেকেই উভয়ের রক্তের সাদৃশ্য বোঝা যায়। এদের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খর্বাকার ও এদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি। নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল ঢেউ-খেলানো। তিন্নেভেলী জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এই শ্রেণীর খুলিও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা 'নিষাদ' জাতির উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে এরা অনাস, এদের গায়ের রঙ কালো ও এদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা অদ্ভুত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের 'নিষাদ'রাই যে আদি-অস্ত্রালগোষ্ঠীর কোনও উপজাতি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মনে হয় এই মূলজাতির এক শাখা দক্ষিণভারত ত্যাগ

করে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও মেলেনেশিয়ায় যায় এবং সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়। যাহোক, বর্তমানে দক্ষিণ ও মধ্যভারতের উপজাতিদের অধিকাংশই আদি-অস্ত্রালগোষ্ঠীর লোক। বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা, ভূমিজ, মহালি, মুণ্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিসমূহও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া হিন্দুসমাজের তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীর লোক।

চার

দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে বলে তাদের 'ভূমধ্যীয়' বা 'মেডিটেরেনিয়ান' নরগোষ্ঠীর লোক বলা হয়। আকৃতি মধ্যমাকার এবং এদের মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও রঙ ময়লা। আদি-মিশরীয়দের সঙ্গে এ জাতির বেশী মিল আছে। আদিত্যনল্লুর অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিপাত্রে ও দক্ষিণভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তাদের অধিকাংশই 'ভূমধ্যীয়' নরগোষ্ঠীর লোক। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর লোকদের দক্ষিণভারতেই প্রাধান্য দেখা যায়, যদিও এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যে, একসময় এদের বিস্তৃতি উত্তরভারত পর্যন্তও ব্যাপ্ত ছিল। বলা বাহুল্য, এরা ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল-অঞ্চলসমূহ থেকেই এদেশে এসেছিল। খুব সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যে উক্ত 'পণি'রা এই গোষ্ঠীরই লোক ছিল।

পাঁচ

ভারতের আর্য-ভাষাভাষী লোকেরা দুই বিভিন্ন নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত—(১) আলপীয় (Alpine) ও (২) নর্ডিক (Nordic)। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ হচ্ছে মাথার আকার। আল্পীয়রা হ্রস্ব-কপাল জাতি, আর-নর্ডিকরা দীর্ঘ-কপাল জাতি। মালভূমিতে বাস করলে যে সকল দৈহিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর লোকরা সেইসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। অনুমান করা হয়েছে যে, মধ্য-এশিয়ায় যে পর্বতমালা আছে তারই নিকটবর্তী কোন স্থানে হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর প্রথম জন্ম হয়েছিল। হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর লোকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মধ্যমাকার, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত

ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল ও গায়ের রঙ ফরসা। মনে হয় এদের একদল এশিয়া-মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিমসাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কর্নাট ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদের আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয় তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে এসেছিল।

আর্য-ভাষাভাষী নর্ডিকরা ছিল উত্তর এশিয়ার তৃণভূমির অধিবাসী। খ্রীস্ট-পূর্ব দু'হাজার থেকে এক হাজার বছরের অন্তবর্তী কোনও এক সময় এদের এক বড় ধারা স্থলপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তখন এদের সঙ্গে [illegible] (Kassites) ছিল। এদেরই অন্য এক শাখা ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতের দিকে এগিয়ে আসে ও পঞ্চনদের উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে বসতি স্থাপন করে। পঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের উচ্চতর জাতিসমূহের মধ্যে এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে উত্তরভারতে ভূমধ্যীয় জাতির সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ সর্বত্রই স্পষ্ট। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকার, মাথা বেশী লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। ভারতের জনসমাজের মধ্যে নর্ডিক উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার পূর্বদিকে আল্পীয় উপাদানই বেশী।

ছয়

যদিও বাঙালী মিশ্র জাতি, তা হলেও উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা হচ্ছে আর্য-ভাষাভাষী আল্পীয় নরগোষ্ঠীর লোক ও তারা উত্তরপ্রদেশের আর্য-ভাষাভাষী নর্ডিক নরগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (অষ্টম শতাব্দীতে রচিত) বলা হয়েছে যে বাঙলাদেশের আর্য-ভাষাভাষী লোকরা অসুরজাতিভুক্ত। এখন কথা হচ্ছে, এই অসুরজাতির লোকরা কারা এবং তারা কোথা থেকেই বা বাঙলাদেশে এসেছিল? বৈদিক ও বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দটির খুব ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় দেবগণের বিরোধী হিসাবে। অনেকে মনে করেন যে 'অসুর' বলতে আর্যপূর্ব যুগের দেশজ অধিবাসীদের বোঝায়। যদি অসুররা বৈদিক আর্যগণের আগমনের পূর্বে ভারতে এসে থাকে, তাহলে তারা যে দেশজ, এই মতবাদ গ্রহণে কোনও

আপত্তি নেই। বৈদিক সাহিত্যে আমরা 'দাস', 'দস্যু', 'নিষাদ' ইত্যাদি আরও অনেক দেশজ জাতির নাম পাই। সুতরাং বৈদিক আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে এদেশে যে একাধিক জাতি বাস করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের অনেককেই অনার্য ভাষাভাষী বলা হয়েছে। কিন্তু সকলেই যে অনার্য ভাষাভাষী ছিল তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। বরং বৈদিক আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বে আগত আল্পীয় নরগোষ্ঠীর লোকরা যে আর্য-ভাষাভাষী ছিল তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যদি বৈদিক আর্য ও অসুররা উভয়েই আর্য-ভাষাভাষী হয় তাহলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতে আগমনের পূর্বে উভয়ে একই সাধারণ বাসস্থানে বাস করত। এইস্থানে বাসকালে অসুরদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট জীবনচর্যা ও ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এই জীবনচর্যা ও ধর্ম বৈদিক আর্যগণের জীবনচর্যা ও ধর্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল। বৈদিক আর্যগণ ভারতে আগমনের পূর্বে অনেকগুলি নূতন দেবতার আরাধনার পত্তন করেছিল। এই নূতন দেবতাগণকে তারা 'দেইবো' (প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়) বা 'দইব' (ইন্দো-ইরানীয়) বা 'দেব' (সংস্কৃত) নামে অভিহিত করত। আর আর্য-ভাষাভাষী অপর গোষ্ঠী তাদের আরাধ্যমণ্ডলীকে 'অসুর' নামে অভিহিত করত। এই পরম্পরা থাকার দরুন প্রাচীন পারসিকরা ও বৈদিক আর্যগণও তাদের অনেক দেবতাকে কখনও কখনও 'অসুর' নামে অভিহিত করত। বস্তুত প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে অসুরগণের যেমন নিন্দাবাদ ও কটাক্ষ প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনই আবার দেব উপাসকগণের প্রধান আরাধ্য দেবতা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণকে 'অসুর' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে দেব-উপাসকগণ ও অসুর-উপাসকগণ উভয়েই কোনও সময় একই সাধারণ অঞ্চলে বাস করত।

প্রাচীন অসুর বা আসিরীয় রাষ্ট্রের প্রধান উপাস্য দেবতার নামও অসুর ছিল। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, আসিরীয়রাও আর্য-ভাষাভাষী লোক ছিল। এদের একাধিক রাজার নাম, যথা—অসুর-বানিপাল, অসুর-নসিরপাল, শলমেনেশ্বর, ত্তামত্তাম-উকিন, অসুর-উবলিত, তাদের আর্যত্ব সূচিত করে।

আর্যরা যখন দেব-উপাসক ও অসুর-উপাসক এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন অসুর উপাসকমণ্ডলীর প্রধান আরাধ্য হল বরুণ ও দেব-উপাসক-

গণের আরাধ্য হল ইন্দ্র। ক্রিস্টেনসেনের মতে যারা অপেক্ষাকৃত মার্জিত-রুচি-সম্পন্ন ও চিন্তাশীল ছিল এবং যাদের জীবিকা ছিল মুখ্যত কৃষি ও গোপালন তারাই হয়েছিল অসুরপন্থী। আর যারা সভ্যতার মানদণ্ডে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধার দল ছিল তারা হয়েছিল দেবপন্থী। উত্তরকালে এই অসুরপন্থীরা এশিয়া মাইনর, ইরান ও ভারতে বসতি স্থাপন করে। আর দেবপন্থীরা উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের উপত্যকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। দিলীপকুমার বিশ্বাস বলেছেন—বস্তুত বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশে 'অসুর' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অসুরপন্থীগণ যে উন্নত সভ্যতার অধিকারী, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। মায়া বা ইন্দ্রজাল শক্তি বিশেষভাবে অসুরপন্থীগণের আয়ত্ত, এই ধারণা বৈদিক যুগেও ছিল। পরবর্তী মহাকাব্য-পুরাণাদিতে এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে। স্থাপত্যবিদ্যাতে এদের অসাধারণ পারদর্শিতার কাহিনী সুবিদিত ও এই প্রসঙ্গে ময়াসুর বা ময়দানবের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাত

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিরূপণ করতে গিয়ে স্যার হারবার্ট রিজলী বাঙলার অধিবাসিবৃন্দকে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল এবং জলপাইগুড়ি ও রংপুরের কোচ জাতিগণকে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং যেহেতু বিস্তৃত-শিরস্কতা ও বিস্তৃতনাসিকা যথাক্রমে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য এবং এই দুই লক্ষণ উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ব্যতীত উপরি-উক্ত অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেই হেতু তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাদের এই দুই নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত। কিন্তু রিজলী বাঙলার যে-সকল জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফলের ওপর ভিত্তি করে উপরি-উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সকল জাতি যদিও বাঙলার রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে বাস করত, তথাপি তারা সকলে বাঙালী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাঙলার উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিসমূহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের

পার্বত্য উপজাতিগণের সঙ্গে এক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের রাজবংশী মগগণ (যাদের পরিমাপ রিজলী নিজের মত পোষণের জন্য বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি জাতিগণের পরিমাপের সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছিলেন), মোটেই বাঙলাদেশের মৌলিক অধিবাসী নয়। তারা ইন্দোচীন নামক মঙ্গোলীয় পর্যায়ের অন্তর্গত এবং মাত্র কয়েক শত বর্ষ পূর্বে আরাকান দেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে। তাদের বিচিত্র সামাজিক সংগঠন, ও আহং, সেপোটাং, পাংডুং, থাকাস্থ, থিয়াংগা, প্রভৃতি অবাঙালী নাম থেকে সেটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ঠিক এইভাবে, রংপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোচগণ ঐতিহাসিককালে উত্তরবঙ্গবিজেতা মঙ্গোলীয় পর্যায়ভুক্ত কোচজাতির বংশধর মাত্র। পাইমা, লেথর, সনু, অলিজ, এরা, ডানড়ু, লোবাই প্রভৃতি এদের নামগুলিও সম্পূর্ণ অবাঙালীর নাম। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মালজাতিগণ রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল হতে বাঙলা-দেশে এসে বসবাস করেছে এবং তারা সাঁওতালপরগনার মালপাহাড়িয়া, মাল প্রভৃতি জাতি থেকে অভিন্ন। বাঙলার সীমান্তাংশবাসী এই সমস্ত অবাঙালী উপজাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বাঙলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নিরূপণ করা যে সম্পূর্ণ অসমীচীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আট

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রথম প্রমাণ করতে প্রয়াস পান যে বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে রিজলীর মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পরে ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ চন্দের মতবাদকে যে সমর্থন করে মাত্র তা নয়, বাঙলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির ওপর নূতন আলোকপাত করে।

গুহ মহাশয় বাঙলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং চব্বিশপরগনার পোদজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নিয়েছিলেন, তা থেকে প্রকাশ পায় যে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মাথা গোলাকার (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৮.৯৩), নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত এবং দেহ-দৈর্ঘ্যের গড় ১৬৮০ মিলিমিটার। কায়স্থদের মাথা ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছু বেশী গোল (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৮০.৮৪), নাসিকা প্রায় সমানভাবেই উন্নত ও দীর্ঘ এবং দেহ-দৈর্ঘ্য সামান্ত পরিমাণে

কম (১৬৭০ মিঃ মিঃ)। পোদদের দেহ-দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা কম (১৬২৮ মিঃ মিঃ), মাথা কম গোল (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৭.১৬), মুখ ছোট ও কম উন্নত। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ বাদামী, কিন্তু পোদদের গায়ের রঙ গভীর বাদামী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যকের চোখ ঘোর বাদামী, কিন্তু পোদদের চোখ অধিক পরিমাণে কালো। চুলের রঙ সকলেরই কালো।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙালী জাতির বিস্তৃত কপাল ও প্রসারিত-নাসিকা দেখেই তারা দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত বলে রিজলী সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু রিজলীর এই মতবাদের সপক্ষে কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। মঙ্গোলীয় জাতির আদিম অধিবাস ভারতবর্ষ নয়—ভারতবর্ষে তারা আগন্তুক মাত্র। সুতরাং পূর্বভারতের জাতিসমূহের বিস্তৃত-শিরস্কতা যদি মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হয়, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, মঙ্গোলীয় জাতি কর্তৃক বাঙলাদেশে কোন বৃহৎ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এরূপ কোন আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাস কোন সাক্ষ্য দেয় না। অধিকন্তু বাঙালী জাতির আকৃতির মধ্যে এমন কোন নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ বা তাদের মধ্যে প্রচলিত এমন কোন জনশ্রুতি বা কাহিনী নেই, যা দ্বারা তাদের মঙ্গোলীয় উৎপত্তি সমর্থিত হয়। পরন্তু, নেপাল ও আসামে এরূপ অনেক জনশ্রুতি আছে, এবং এটাও আমরা জানি যে, এসকল দেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে (১১ অধ্যায়) যে কাহিনী আছে, সেই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে পুরু (যযাতিপুত্র)-বংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজার পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, ও পুণ্ড্র। মহাভারতের আদিপর্বেও অসুর-রাজ বলির এই পাঁচ পুত্রের উল্লেখ আছে। বলিরাজের এই পাঁচ সন্তান যে পাঁচটি রাজ্য শাসন করতেন, তাঁদের নাম থেকেই সেই পাঁচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। বলিরাজার এই পাঁচটি পুত্র 'বালের ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হয়েছেন, ও তাঁরাই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। মৎস্য (৪৮।২৫।২৮) ও বায়ু পুরাণেও (৯৯।২৭) বলিরাজের এই পঞ্চপুত্রের উল্লেখ আছে।

নয়

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এইসকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও রিজলী কেন বাঙালী জাতিকে মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন ? আগেই বলা হয়েছে—তার প্রধান কারণ বাঙালী জাতির বিস্তৃত-শিরস্কতা। কিন্তু এটা একমাত্র মঙ্গোলীয় জাতির বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তুত বিস্তৃত-শিরস্কতা ব্যতীত মঙ্গোলীয় জাতির নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা মঙ্গোলীয় জাতি ছাড়া অন্য জাতিসমূহের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। যেমন, তাদের ঋজু সরল চুল, চোখের খাজ (epicanthic fold), গণ্ডাস্থির প্রাধান্য, পীতাভ গায়ের রং ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সমস্ত মঙ্গোলীয় লক্ষণ বাঙালী-দের মধ্যে নেই। উপরন্তু, দীর্ঘশিরস্ক মঙ্গোলীয় জাতিও যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের পূর্ব সীমান্তপ্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

এটা সত্য যে বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত। কিন্তু এ সম্পর্কে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদিও বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের ভুটিয়া, ল্যাপচা প্রভৃতি জাতিসমূহ বিস্তৃত-শিরস্ক, তথাপি উত্তরবঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতারই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক তদ্রূপ, যদিও পূর্ব সীমান্তের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ক, কিন্তু পূর্ব-বাঙলার বাঙালীরা বিস্তৃত-শিরস্ক। রুগিন ব্রাউন ও এস. ডব্লিউ. কেম্প পূর্ব সীমান্তের আবরজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে শতকরা গড়ে ৩২ জন দীর্ঘশিরস্ক ও মাত্র ৬ জন বিস্তৃত-শিরস্ক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পরস্পর সান্নিধ্য হেতু বাঙলার অধিবাসিবৃন্দের সঙ্গে যদি সীমান্ত প্রদেশস্থ মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণ ঘটে থাকত, তা হলে উত্তরবিভাগে এটা বাঙালীর বিস্তৃত-শিরস্কতায় ও পূর্ববিভাগে দীর্ঘ-শিরস্কতায় প্রতিফলিত হত। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি এর বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে।

দশ

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের বিস্তৃত শিরস্ক জাতি-সমূহ একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত এবং তারা উত্তরভারতের দীর্ঘশিরস্ক নৃতাত্ত্বিক পর্যায় থেকে পৃথক। পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের এবং উত্তরপ্রদেশের

জাতসমূহের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নীচে দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে এটা প্রকাশ পায়—

জাতি	শির-সূচক সংখ্যা	নাসিকা-সূচক সংখ্যা	দেহদৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
নগর ব্রাহ্মণ	৭৯'৭	৭৬'১	১৬৪৩
গুজরাটী বেনিয়া	৭৯'৩	৭৫'৭	১৬১২
প্রভুকায়স্থ	৭৯'৯	৭৫'৮	১৬২৭
*বাঙালী ব্রাহ্মণ	৭৮'৮	৭০'৮	১৬৭৬
*বাঙালী কায়স্থ	৭৮'৪	৭০'৭	১৬৬৬
উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ	৭৩'১	৭৪'৬	১৬৫৯
উত্তরপ্রদেশের কায়স্থ	৭২'৬	৭৪'৮	১৬৪৮
বিহারী ব্রাহ্মণ	৭৪'৯	৭৩'২	১৬৬১

পশ্চিম ও প্রাচ্য-ভারতের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত সাদৃশ্য থাকা হেতু এরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত উপায় নেই যে, অতি প্রাচীনকালে কোন বিস্তৃত-শিরস্ক জাতির লোকেরা বহু সংখ্যায় গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় বাঙলাদেশেও এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এরা কারা? এর জবাব দেওয়া খুবই সহজ।

এগার

এই বিস্তৃত-শিরস্ক জাতির আদিম অধিবাস সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চনদের পশ্চিমে বালুচিস্তান ও আফগানিস্তানের বালুচ ও পাঠান জাতীয় লোকগণ আর্যভাষাভাষী এবং নাতিদীর্ঘশিরস্ক (mesaticephalic); এদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতা যথাক্রমে ইরানীয় ও তুরানীয় জাতিসমূহ হতে প্রাপ্ত, এই সিদ্ধান্ত করে স্যার হারবার্ট রিজলী এদের 'তুর্ক-ইরানী' পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের জাতিসমূহের সম্পর্কে উজফালভী (Ujfalvy) ও স্যার অরেল স্টাইন (Sir

* ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে—

বাঙালী ব্রাহ্মণ	৭৮'৯	৬৭'৯	১৬৮০
বাঙালী কায়স্থ	৮০'৮	৬৬'৯	১৬৭০

Aurel Stein) যে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেছিলেন তার ফলে আমরা জানতে পারি যে, বালুচ ও পাঠান, গুজরাটী, মারাঠী, কুর্গ এবং বাঙালী ও ওড়িশার জাতিসমূহের বিস্তৃত-শিরস্কতার জন্ত আমাদের তুর্ক, শক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিসমূহকে টেনে আনবার কোন প্রয়োজন নেই। আগেই বলা হয়েছে যে তুর্ক, শক ও মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের নিজেদের যেসকল নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, তা এসকল জাতিগণের মধ্যে মোটেই নেই। পরন্তু, পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের জাতিসমূহের সঙ্গে এদের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে টি. এ. জয়েস (T. A. Joyce) যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাকলামাকান মরুদেশের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসমূহের জাতিগণের মধ্যে একটা মোটামুটি নৃতাত্ত্বিক ঐক্য আছে। এই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়টি আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় লক্ষ্য করি ওয়াখিগণের (Wakhis) মধ্যে। এই অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে তার জটিলতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করবার মত বস্তু এই যে পামির ও তাকলামাকান মরুদেশের আদিম অধিবাসীরা আলপাইন (Alpine) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কেবলমাত্র পশ্চিমে ইন্দো-আফগান পর্যায়ের সঙ্গে এদের কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে এই সকল অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসিবৃন্দের ওপর মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব নেই বললেই হয়। এই অঞ্চলের পর্যায়গুলির নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি এরূপ—

প্রথম পর্যায় : বিস্তৃত-শিরস্ক, গোলাপী আভাবিশিষ্ট গৌরবর্ণ ত্বক্, দেহ-দৈর্ঘ্য গড়ের ওপর, পাতলা উন্নত দীর্ঘনাসিকা—তা সরল থেকে কুব্জ, লম্বা ডিম্বাকৃতি মুখ, বাদামী রঙের চুল—সাধারণত খুব ঘোর এবং তা প্রচুর ও ঢেউখেলানো ; চোখ প্রধানত মধ্যম শ্রেণীর। এরা লা পুজের (La Pouge) 'আলপাইন' পর্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয় পর্যায় : বিস্তৃত-শিরস্ক, গায়ের রঙ ফর্সা, কিন্তু সামান্য বাদামী আভাবিশিষ্ট ; দেহ-দৈর্ঘ্য গড়ের ঊর্ধ্বে ; নাক সরল, কিন্তু প্রথম পর্যায় অপেক্ষা বিস্তৃত ; গণ্ডাস্থি চওড়া ; চুল প্রথম পর্যায় অপেক্ষা সরল—তা ঘোর বর্ণ ও অপ্রচুর, চোখ কাল। এরা 'তুর্কী' পর্যায়ভুক্ত।

তৃতীয় পর্যায় : নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক, দীর্ঘ দেহ, পাতলা উন্নত কুব্জ নাসিকা,

লম্বা ডিম্বাকৃতি মুখ, কাল ঢেউখেলানো চুল এবং কালো চোখ। এরা 'ইন্দো-আফগান' পর্যায়ভুক্ত।

॥৩॥

পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পামির ও তাকলামাকান মরু অঞ্চলে বিস্তৃত-শিরস্ক এক জাতি বাস করত। এরা পাশ্চাত্ত্য ইউরোপে প্রচলিত ইটালো-কেলটিক ভাষার অনুরূপ এক আর্যভাষাভাষী ছিল এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দ ওই একই বিস্তৃত-শিরস্ক পর্যায়-সম্ভূত বলে এদের নামকরণ করা হয়েছে 'আলপ ইন' পর্যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে এবং বালুচিস্তানে এই পর্যায় বৈদিক আর্য ও দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে, তথায় নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক 'ইন্দো-আফগান' পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই একই পর্যায় ভারতের অন্যত্রও আদিম অধিবাসিগণ (**Proto-Australoid**), বৈদিক আর্য এবং দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে নাতিদীর্ঘ পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। অনেকে মনে করেন যে 'আলপাইন' পর্যায়ভুক্ত বিস্তৃত-শিরস্ক জাতিসমূহ বৈদিক আর্যদের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে এসে আর্যাবর্তের দেশসমূহ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক অধিকৃত দেখে পশ্চিম উপকূল ধরে নেমে এসে মধ্যভারতের মালভূমির ভিতর দিয়ে গঙ্গানদীর নিম্ন উপত্যকায় গিয়ে বসবাস করে। তাদেরই অপর এক শাখা কাথিয়াবাড়, গুজরাট ও পশ্চিম ভারতে বসবাস শুরু করে। কিন্তু অপর পক্ষে, এরূপ সিদ্ধান্ত করবার সপক্ষেও যথেষ্ট কারণ আছে যে আলপাইন পর্যায়-ভুক্ত একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদের আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয়, তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে সমুদ্র-পথে আর্যদের পূর্বে ভারতে এসে পৌঁছেছিল।

॥৪॥

বাঙালী যে মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দিয়েছি। দ্রাবিড় জাতির সঙ্গেও তাদের খুব বেশী রক্ত-সম্বন্ধ নেই। সিন্ধুসভ্যতার সময়ে দ্রাবিড়

জাতিগণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলে মনে করা হত। এবং সেজন্যই তিনি বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক গঠনে দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ আছে, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে যে আর্যভাষীগণের ন্যায় দ্রাবিড় জাতিগণও ভারতে আগন্তুক মাত্র। তাদের পূর্বে ভারতে প্রাক্-দ্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা আদি-অস্ত্রাল (Profo-Australoid) জাতিসমূহ বাস করত এবং তারাই ভারতের আদিম অধিবাসী। এদেরই আমি এই বইয়ে 'অষ্ট্রিক' ভাষাভাষী জাতি বলে অভিহিত করেছি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এদের 'কোল' জাতি বলে অভিহিত করেছেন। তাদের বংশধর-গণকেই আজ আমরা ভারতের বনে, জঙ্গলে ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহে দেখতে পাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নিম্ন সম্প্রদায়ের বাঙালীর মধ্যে বেশকিছু পরিমাণ প্রাক্-দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তবে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী যে আলপাইন পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জগতের সমস্ত নৃতত্ত্ববিদ্ এটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। একথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আজ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে যেসকল পদবী প্রচলিত আছে (যেমন ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, দেব, কর, গুপ্ত, নাগ, পাল, সেন, চন্দ্র, প্রভৃতি) এক সময় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ড° দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম-ভারতে ওই একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত নগর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ পদবীর প্রচলন আছে। বোধ হয় এক সময়ে এগুলি আলপাইন পর্যায়ের উপশ্রেণীর (tribes) নামবিশেষ ছিল, এবং পরে বর্ণসৃষ্টির সময়ে সেগুলি জাতিবাচক পদবী হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সে যাই হোক, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কিত এই আলোচনার ফলে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঙালী রিজলীর তথা-কথিত মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়-গোষ্ঠী-সম্ভূত নয়।

চৌদ্দ

এযাবৎ আমরা 'নৃতাত্ত্বিক পর্যায়'-এর কথা বলছিলাম। কিন্তু 'নৃতাত্ত্বিক পর্যায়' বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি, তার একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'নৃতাত্ত্বিক পর্যায়' বলতে আমরা এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝি যাদের সকলের মধ্যেই জীনকণা (genes) ও 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ভিত্তিক কতকগুলি বিশিষ্ট অবয়বগত

সাদৃশ্য আছে। অবয়বগত কোন্ কোন্ সাদৃশ্য থাকলে, আমরা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করব, সে সম্বন্ধে সুধীজনের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ সুধীজন একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেগুলি হচ্ছে—

১. মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ।
২. গায়ের রঙ।
৩. চোখের রঙ ও বৈশিষ্ট্য।
৪. দেহের দীর্ঘতা।
৫. মাথার আকার।
৬. মুখের গঠন।
৭. নাকের আকার।
৮. শোণিত বর্গ বা blood groups.

এই লক্ষণগুলির মধ্যে মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য প্রধানতম। চুলের বিশিষ্টতার দিক দিয়ে মানুষের চুলগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম, ঋজু বা সোজা চুল (straight hair)। এটা মঙ্গোলিয়ান জাতিসমূহের লক্ষণ। দ্বিতীয়, কুঞ্চিত বা কোঁকড়া চুল (woolly hair)। এটা নিগ্রোজাতির লক্ষণ। তৃতীয়, তরঙ্গায়িত বা ঢেউখেলানো চুল (smooth, wavy or curly hair)। এটা জগতের অবশিষ্ট জাতিসমূহের লক্ষণ। অনেকসময় অনেক পুরুষের (generations) রক্তের সংমিশ্রণে চুলের এই বাহ্যবৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু খণ্ডিত চুলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে, তার মৌলিক নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। খণ্ডিত চুলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে পরীক্ষা করা হয়, এবং তার কি কি লক্ষণ পেলে তাকে কোন বিশেষ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করা হয়, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা এ স্থলে সম্ভবপর নয়। তবে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা এ সম্বন্ধে সাঁ-মার্ত্যাঁর (St. Martin) বই পড়ে নিতে পারেন।

চুলের এবং চোখের রঙ অপেক্ষা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ গায়ের রঙের উপর বেশী জোর দিয়ে থাকেন। যদিও এটা দেখা গিয়েছে যে কালো রঙের সঙ্গে কালো চুলের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু কালো চুলের সঙ্গে কালো চোখের এরূপ কোন পারস্পরিক সাহচর্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণত গায়ের রঙ অনুযায়ী

মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : ফর্সা সাদা রঙ, ময়লা বা কালো রঙ ও পীত রঙ। অবশ্য এই তিন শ্রেণীর আবার বহু উপবিভাগ আছে।

দেহের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী মানুষকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা—

১. বামন (pygmy)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটারের কম।

২. খর্বাকৃতি বা বেঁটে (short)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটার থেকে ১৫৮১ মিলিমিটার।

৩. মধ্যমাকৃতি বা মাঝারি (medium)—উচ্চতা ১৫০২ মিলিমিটার থেকে ১৬৭৬ মিলিমিটার।

৪. দীর্ঘ (tall)—১৬৭৭ মিলিমিটার হতে ১৭২০ মিলিমিটার।

৫. অতিদীর্ঘ (very tall)—১৭২১ মিলিমিটারের উপর।

নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় অন্য মানুষের মাথার আকার এক সূচক-সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই সূচক-সংখ্যাকে cephalic index বা শির-সূচকসংখ্যা বলা হয়। মাথার দৈর্ঘ্যের (সম্মুখভাগ nasion হতে পশ্চাদ্ভাগ occiput পর্যন্ত) তুলনায় মাথার চওড়ার দিকের মাপের শতকরাংশিক অনুপাতকেই cephalic index বলা হয়। এই অনুপাত অনুযায়ী মানুষের মাথাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—

১. লম্বা মাথা বা দীর্ঘশিরস্ক (dolicho-cephalic)—অনুপাত ৭৫ শতাংশের কম।

২. মাঝারি মাথা বা নাতিদীর্ঘশিরস্ক (mesaticephalic)—অনুপাত ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের কম।

৩. গোল মাথা বা বিস্তৃতশিরস্ক (brachy-cephalic) অনুপাত ৮০ শতাংশ বা ততোধিক।

নাকের আকারের পরিমাপও ঠিক মাথার আকারের পরিমাপ-প্রথার অনুরূপ। নাকের দৈর্ঘ্যের (নাকের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত) তুলনায় নাকের চওড়ার (তলদেশ) দিকের মাপের শতকরাংশিক অনুপাতকে nasal index বা নাসিকা-সূচক সংখ্যা বলা হয়। এই অনুপাত অনুযায়ী মানুষের নাককে তিন শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যথা—

১. লম্বা সরু নাক (leptorrhine)—অনুপাত ৫৫ শতাংশ হতে ৭৭ শতাংশ।

২. মাঝারি নাক (mesorrhine)—অনুপাত ৭৮ শতাংশ হতে ৮৫ শতাংশ।

৩. চওড়া নাক (platyrrhine)—অনুপাত ৮৬ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ।

নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নির্ণয়ের জন্য রক্তের চারিত্রিক গুণও পরীক্ষা করা হয়। দানা বাঁধা (agglutination) গুণের দিক থেকে রক্তকে 'O', 'A', 'B', 'A-B', 'M', 'N', Rh positive ও negative, ও জীবাণু-প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদনের দিক থেকে 'A'-বর্গের রক্তকে A_1 ও A_2 শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যখন দুই নরগোষ্ঠির মধ্যে রক্তের চারিত্রিক মিল থাকে, তখন তাদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব আছে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ডি. এন. মজুমদার যে সমীক্ষা করেছিলেন, তা থেকে জানা গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও নমশূদ্রদের মধ্যে 'O'-বর্গের রক্তই প্রধান। কায়স্থদের মধ্যে 'B'-বর্গের রক্ত প্রধান। বণিকদের মধ্যে 'O' ও 'B' এই উভয়বর্গের রক্ত সমানভাবে ব্যাপ্ত। শঙ্খবণিক ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'A'-বর্গের রক্ত প্রধান। এবং মুসলমানদের মধ্যে O', 'A', ও 'B' এই তিন বর্গের রক্তই সমানভাবে বিদ্যমান। পরে ডি. কে সেন এ সম্বন্ধে যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তা থেকেও জানা গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'O'-বর্গের রক্তই প্রধান। কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যেও তাই। কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে 'B'-বর্গের রক্তই প্রধান।

বর্তমানে, আঙুলের রেখাবিন্যাসের মিল দ্বারাও নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের নৈকট্য নির্দেশ করা হচ্ছে।

তবে, একথা এখানে বলা আবশ্যক যে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করবার জন্য অবয়বের কোন এক বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। উপরি-উক্ত সমস্ত অবয়ব-লক্ষণের সমষ্টিগত ফলের উপর নির্ভর করেই তাঁরা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করবার জন্য কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তাঁরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক লোকের পরিমাপ গ্রহণ করেন।

বাঙালীর প্রাগৈতিহাসিক পটভূমিকা

জাতি হিসাবে বাঙালী কত প্রাচীন? এর উত্তর দিতে হলে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেতে হবে। পৃথিবীতে নরাকার জীবের বিবর্তন ঘটে প্লাওসীন যুগে। এর পরের যুগকে প্লাইস্টোসীন যুগ বলা হয়। মানুষের আবির্ভাব ঘটে এই যুগে।

যদিও প্লাইস্টোসীন যুগের মানুষের কোনও নরকঙ্কাল আমরা ভারতে পাইনি, তবুও তার আগের যুগের অস্ত্র-নর জীবের কঙ্কাল আমরা এশিয়ার তিন জায়গা থেকে পেয়েছি। জায়গাগুলি হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রস্থ শিবালিক গিরিমালা, জাভা ও চীনদেশের চুংকিঙ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখা দ্বারা সংবদ্ধ করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়, বাঙলাদেশ তার কেন্দ্রস্থলে পড়ে। সুতরাং এরূপ জীবসমূহ যে সেযুগে বাঙলাদেশের ওপর দিয়েই যাতায়াত করত সেরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

যদিও সঠিকভাবে নির্ণীত প্লাইস্টোসীন যুগের মানুষের কোনও নরকঙ্কাল আমরা এদেশে পাইনি, তবুও মানুষ যে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙলাদেশে বাস করে এসেছে তার প্রমাণ আমরা পাই বাঙলাদেশে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধ-সমূহ থেকে। এই আয়ুধসমূহের অন্যতম হচ্ছে পাথরের তৈরী হাতিয়ার, যার সাহায্যে সেযুগের মানুষ পশু শিকার করত তার মাংস আহারের জন্য। এটা খুব বিচিত্র ব্যাপার যে, এই হাতিয়ারগুলির আকার ও নির্মাণরীতি পশ্চিম ইউরোপে যেরূপ ছিল ভারতেও সেরূপ ছিল। এরূপ হাতিয়ার বাঙলাদেশের বহুস্থানে পাওয়া গিয়েছে, যথা—বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানাস্থান থেকে। (পরে দেখুন)। এই সকল আয়ুধকে প্রত্নপ্রস্তর-যুগের আয়ুধ বলা হয়। প্রত্নপ্রস্তর-যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে আনুমানিক দশ হাজার বৎসর পূর্বে। তখন নবপ্রস্তর বা নবোপলীয় যুগের সূচনা হয়। নবপ্রস্তর-যুগে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। ভ্রাম্যমাণ জীবনের পরিবর্তে মানুষ স্থায়িভাবে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসবাস করতে শুরু করে। এই যুগেই কৃষি ও বয়নের উদ্ভব হয় এবং মানুষ পশুপালন করতে শুরু করে। এ যুগের ধর্মীয় আচার সম্বন্ধে আমাদের খুব বেশী কিছু জানা নেই। তবে প্রত্নপ্রস্তর-যুগের

মানুষের মতো তারা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিত ও মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর একখানা লম্বা পাথর খাড়াভাবে পুঁতে দিত। এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত পাথর আমরা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় লক্ষ্য করি। সেগুলিকে 'বীরকাঁড়' বলা হয়।

এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক আমরা পশ্চিম বাঙলায় যেসব জায়গায় পেয়েছি, তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। বাঁকুড়া শহর থেকে দশ মাইল পশ্চিমে ছাতনায় এক পুকুরের নিকট আমরা এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত স্মৃতিফলক দেখতে পাই। এগুলি চার-পাঁচ ফুট উঁচু এবং এগুলির গায়ে অপরিণত শৈলীর খোদিত মূর্তি আছে। এগুলি সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যে সকল সাহসী বীর সৈনিক যুদ্ধে নিহত হয়েছে এগুলি তাদেরই সমাধির ওপর প্রোথিত। মেদিনীপুরের কিয়ারচাঁদ গ্রামেও এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত বহু প্রস্তর-ফলক দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির বর্ণনায় বলা হয়েছে—'Rounded at the top, they seemed to have been deliberately chiselled and stand on the open field as rigid and uncommunicative sentinels which they certainly are, continuing to baffle historians as to how they originated'. এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক বাঁকুড়া জেলার ছাতনার দু-মাইল দূরে মোলবনায় ও হুগলি জেলাতেও পাওয়া গিয়েছে। হুগলি জেলাতে এগুলিকে 'বীরকাঁড়' বলা হয়। মনে হয় এগুলি অস্ট্র-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতির অবদান। কেননা, দক্ষিণভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও আমরা এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক দেখি। নীলগিরি পাহাড়ের অধিবাসী কুড়ুম্বা উপজাতির লোকরা এরূপ প্রস্তর-ফলককে 'বীরকল্লু' নামে অভিহিত করে ও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কুড়ুম্বা এবং ইরুলা উপজাতিদের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'বীরপুরুষদের স্মৃতিফলক'। এক কথায় এগুলি হচ্ছে সমাধির ওপর স্মারক-ফলক। সমাধির ওপর এরূপ স্মারক-ফলক ডালটন ছোটনাগপুরের হো ও মুণ্ডা উপজাতিদের গ্রামেও দেখেছিলেন। নীলগিরি পাহাড়ের কুড়ুম্বাদের মত ছোটনাগপুরের হো ও মুণ্ডা জাতিরাও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। ছোটনাগপুরের খেরিয়া উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত এরূপ স্মৃতিফলক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'Beside the grave-stones monumental stones are set up outside

the village to the memory of men of note. The Kherias have collections of these monuments in the little enclosure round their houses and libations are constantly made to them.' মনে হয়, বাঙলাদেশে মানুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর গ্রামের বাইরে যে 'বৃষকাষ্ঠ' স্থাপন করা হয়, সেগুলি এরূপ প্রস্তর-ফলকেরই কাষ্ঠ-নির্মিত উত্তর সংস্করণ। (A. K. Sur's "History & Culture of Bengal" (1963), pages 20-21 দ্রষ্টব্য)

বস্তুত নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধরে রেখেছি। যথা ধামা, চুবড়ি, কুলো, ঝাঁপি, বাটনা বাটবার জন্য শিল-নোড়া ও শস্য পেষাইয়ের জন্য জাঁতা ইত্যাদি। এগুলি সবই আজকের বাঙালী নবোপলীয় যুগের 'টেকনোলজি' অনুযায়ী তৈরী করে।

দুই

নবপ্রস্তর-যুগ পর্যন্ত মানুষ আয়ুধ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রস্তর দ্বারাই নির্মাণ করত। এর পরে মানুষ তামার ব্যবহার করতে শুরু করে। এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে যে সভ্যতার উদ্ভব হয় তাকে তাম্রাশ্ম-যুগের সভ্যতা বলা হয়। এ যুগের মানুষ নগর নির্মাণ করতে শুরু করে। তার মানে এ যুগেই প্রথম নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব হয়। সিন্ধু-উপত্যকার মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি সে যুগেরই নগরের প্রতীক। বাংলাদেশে এরূপ সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি। পাণ্ডুরাজার ঢিবি বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার (বোলপুর শান্তি-নিকেতনের নিকটে) অবস্থিত। এখানে উৎখনন কার্য চলে ১৯৬২-৬৫ সময়-কালে। অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর উপত্যকার অন্যত্রও আমরা এই সভ্যতার পরিচয় পাই। সম্প্রতি (১৯৯০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে মঙ্গলকোটে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটানা উন্নত সভ্যতার নানাবিধ প্রত্নসম্ভার আবিষ্কার করেছে)। ড° রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই সভ্যতা যে 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র' রচনার বহু পূর্ববর্তী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে'র নাম এজন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে'ই (২।২।৩০) আমরা সর্বপ্রথম 'আর্যাবর্ত' নামের উল্লেখ পাই।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আমরা চারটি বিভিন্ন যুগের সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। এখানে মানুষ বাস করতে শুরু করেছিল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিসহস্রক থেকে। এ যুগের লোকরা কাঁকরপেটা ('মুরাম') গৃহতল নির্মাণ করত, চক্রে লাল-কালো ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র তৈরী করত ও ধান্যের চাষ করত। প্রথম যুগের পর পাণ্ডু-রাজার ঢিবিতে এক প্লাবন ঘটেছিল এবং স্থানটি সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় যুগের লোকরাই তাম্রাশ্ম-যুগের সভ্যতার বাহক ছিল। তারা সুপরি-কল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরী করত। তারা গৃহ ও দুর্গ—এই উভয়ই নির্মাণ করতে জানত। তারা তামার ব্যবহার জানত। কৃষি ও বাণিজ্য তাদের অর্থ নীতির প্রধান সহায়ক ছিল। তারা ধান্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করত এবং পশুপালন ও কুম্ভকারের কাজও জানত। পুব-পশ্চিম দিকে শয়ন করিয়ে তারা মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগের মানুষেরা ব্যবহার করত লাল-কালো রঙের কোশীপাত্র এবং অপরাপর সুদৃশ্য কলস, ভাণ্ড ও তৈজসপত্রাদি। এ যুগের মৃৎপাত্রসমূহের ওপর অঙ্কিত চিত্রাদি তাদের নান্দনিক মানসের সাক্ষ্য দেয় এবং প্রতিফলিত করে নগরভিত্তিক এক অনুপম সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক রুচি। লাল-কালো মৃৎপাত্রগুলির গঠন ও চিত্রিত নিদর্শনগুলি নর্মদা উপত্যকা (নাভদা টৌলি), রাজস্থান (আহাড়), মধ্যপ্রদেশ (এরণ) ও মহারাষ্ট্রের (বাহাল) অনুরূপ বিভিন্ন মৃৎপাত্রের সঙ্গে তুলনীয়। আরও যেসব জিনিস দ্বিতীয় যুগে পাওয়া গিয়েছে সেগুলি হচ্ছে ক্ষুদ্রাশ্মর ছুরিকা, হাড়ের আয়ুধ, তামার অলংকার, পোড়ামাটির তকলি ও শিমুল তুলা হতে বোনা চিকন ও শুভ্র বস্ত্র। কার্বন ১৪ পরীক্ষায় দ্বিতীয় যুগের বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব ১০১২+১২০ বৎসর।

তৃতীয় যুগে পাওয়া গিয়েছে নবাশ্মর কুঠার, অঙ্গারমিশ্রিত লোহার অস্ত্র এবং কালো রঙের মসৃণ মৃৎপাত্র। তবে লাল-কালো রঙের মৃৎপাত্রের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। এছাড়া পাওয়া গিয়েছে লৌহ ঢালাইকরণের জন্য ব্যবহৃত চুল্লিসমূহ। ধারাবাহিক খননকার্যের ফলে জানা গিয়েছে যে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে তৃতীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে ও এই বসবাস পরিত্যক্ত হয়। একাধিক অগ্নিকাণ্ড অবশ্য দ্বিতীয় যুগেও ঘটেছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আবার বসবাস শুরু হয় বহু পরে চতুর্থ বা ঐতিহাসিক যুগে মৌর্যদের সময় থেকে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগটাই ছিল গৌরবময় ও সমৃদ্ধিশালী যুগ। এটাই ছিল তাম্রাশ্ম যুগ এবং বাণিজ্যই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তারা অভ্যন্তরস্থ দেশসমূহ ব্যতীত 'সাত সমুদ্দুর, তের নদী' অতিক্রম করে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত। ক্রীটদ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাদের সবচেয়ে বেশী বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ক্রীটদেশের প্রচলিত লিপি-পদ্ধতিতে লিখিত একটি চক্রাকার সীলমোহর পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পাওয়া গিয়েছে। তাদের বাণিজ্যের পণ্যসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত ছিল মসলা, তুলা, বস্ত্র, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং বোধ হয় হীরক। মনে হয়, গুড় বা শর্করাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, পরবর্তীকালে বাঙলার গুড় ও শর্করা রোমসাম্রাজ্যে বিশেষভাবে আদৃত হত।

সীলমোহর ছাড়া পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আরও পাওয়া গিয়েছে একটি মাটির 'লেবেল'। এরূপ মাটির 'লেবেল' সেই-ধরনের ঝুড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকত যার মধ্যে থাকত মৃৎফলকের ওপর লিখিত পণ্য ও বাণিজ্যিক লেনদেন-সম্পর্কিত হিসাবপত্র।

চার

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙালীরা ক্রীটদেশে গিয়ে ও ক্রীটদেশের লোকরা বাঙলাদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ওই অঞ্চলে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশের কথা আমরা পরবর্তীকালে ইজিপ্টবাসী এক নাবিক প্রণীত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও উল্লেখ পাই। ভেলেরিয়াস ফ্লাকাস-ও তাঁর 'আরগনটিকা' পুস্তকে লিখে গিয়েছেন যে, গঙ্গা-রিডিদেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ১৫০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে (ঋগ্বেদ রচয়িতা বৈদিক আর্যদের পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হবার সমসাময়িককালে) কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি করে ভার্জিলও তাঁর 'জর্জিকাস' নামক কাব্যে লিখে গিয়েছেন যে, গঙ্গারিডির বাঙালী বীরদের শৌর্যবীর্যের কথা "আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব।" বলা বাহুল্য বিদেহ বা মিথিলার পূর্বে অবস্থিত বাঙালী বীরদের এই শৌর্যবীর্যই প্রতিহত করেছিল

অগ্রগামী বৈদিক আর্যদের।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বাঙালীরা ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে আমরা একথাও ভেবে নিতে পারি যে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বণিকদের বাঙলাদেশেও উপনিবেশ ছিল। দুই দেশের বণিকদের মধ্যে যে বিবাহঘটিত সম্পর্ক স্থাপিত হত তাও আমরা অনুমান করতে পারি। চেহারা দেখে মনে হয় যে বাঙলার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় তাদেরই বংশধর। পরবর্তীকালে সুবর্ণবণিকদের সপ্তগ্রামী সমাজের অবস্থানও এরূপ নির্দেশ করে। এই বণিকদেরই আমরা ঋগ্বেদে 'পণি, নামে অভিহিত হতে দেখি। বস্তুত 'বণিক', 'পণ্য' প্রভৃতি শব্দ 'পণি' শব্দ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আর সমবাচক 'শ্রেষ্ঠি' শব্দ উদ্ভূত হয়েছে আল্পীয় অসুরদের 'হট্টি' বা 'হিট্টি' শব্দ থেকে।

পরস্পর এই মেলামেশার ফলে রাঢ়দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রীটদেশের সংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছিল। তার অন্যতম হচ্ছে উভয়দেশেই মাতৃদেবীর সঙ্গে সিংহের সম্পর্ক। এ ছাড়া আমরা উভয় দেশের রূপকথার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। ১৯৬৮ সালের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় বর্তমান লেখক এক প্রবন্ধে ক্রীটদেশে প্রচলিত লিপি ও প্রাচীন বাঙলার পাঞ্চ-মার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন। তা ছাড়া ক্রীটদ্বীপের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত। বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্র' গ্রন্থে লিখেছেন যে, পূর্ব-ভারতের রাণীরা তাদের দেহের উপরাংশ অনাবৃত রাখে।

পাঁচ

মনে হয়, 'ভূমধ্যসাগরীয়' গোষ্ঠীর জাতিরা তাম্র আহরণের জন্যই বাঙলাদেশে এসে হাজির হয়েছিল। আরও মনে হয় যে, এদেরই অনুসরণ করে এসেছিল আর্যভাষা-ভাষী 'অসুর' জাতীয় আল্পীয় গোষ্ঠীর বণিকরা। তারাও এদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। বোধ হয় 'ভূমধ্যীয়' গোষ্ঠীর তুলনায় তারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিল। বর্তমান বাঙলায় আল্পীয় নরগোষ্ঠীর গরিষ্ঠতা তাই প্রমাণ করে। তা ছাড়া পরবর্তীকালের সাহিত্যে আমরা বাঙলাদেশকে অসুরদের দেশ হিসাবেই বর্ণিত হতে দেখি। এরা পশ্চিমদিকে অন্তত অঙ্গদেশ পর্যন্ত নিজেদের

বিস্তৃত করেছিল। মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম অসুররাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তান। তার মানে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম অসুরজাতি-সম্ভূত। আমরা আগেই বলেছি যে অসুররা ছিল বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি। এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম বিস্তৃত-শিরস্ক জাতিরই বাসভূমি।

মোট কথা, দ্রাবিড়ই বলুন আর আর্যভাষা-ভাষী অসুরজাতিই বলুন, এরা ভারতের আদিবাসী প্রাক্-দ্রাবিড়দের সঙ্গে কিভাবে মিশে গিয়েছিল তা আমরা জানি না। সম্ভবত এই মিশ্রণ হয়েছিল বাণিজ্য-সম্পর্কিত বন্ধুত্বের সুযোগে ও বিবাহের মাধ্যমে। অসুররা বৈদিক আর্যদের মত দুর্ধর্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে এদেশের আদিবাসীদের বিজিত করেনি বলেই মনে হয়। কেননা, আগন্তুক 'নর্ডিক' বা বৈদিক আর্যরা এদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে আসেনি। তারা এসেছিল ধর্মধ্বজী যোদ্ধা হিসাবে। আর্যসংস্কৃতির ধ্বজা সামনে রেখে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম করতে করতেই তারা এগিয়ে এসেছিল উত্তরভারতের পূর্বদিকে। তাদের মনের মধ্যে ছিল আর্যসংস্কৃতির গরিমা ও এদেশের লোকদের ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি ঘোরতর ঘৃণা ও বিদ্বেষ। এজন্য তারা নিজেদের অধীনস্থ এলাকাকে স্বতন্ত্র করে তার নাম দিয়েছিল ব্রহ্মর্ষিদেশ, আর্যাবর্ত ইত্যাদি। আর্যসংস্কৃতির সীমানার বাইরের অংশকে তারা 'দস্যু'দের দেশ বলে অভিহিত করত। বিদেহ পর্যন্ত এসে তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের অসুরগণ দ্বারা। অসুরগণের দেশকে তারা 'ব্রাত্য'দেশ বা বেদ-বহির্ভূত দেশ বলে অভিহিত করত।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহাভারতের কথা। পঞ্চপাণ্ডব বহুদিন ধরে বাঙলার বীরভূম জেলার একচক্রানগরে বাস করেছিল। অজয়-নদের তীরে যেখানে পাণ্ডুরাজার ঢিবি অবস্থিত, তার নিকটে ও অদূরে পাণ্ডবদের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত একাধিক স্থান আছে। ভীমেশ্বরে আছে মধ্যমপাণ্ডব ভীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। পাণ্ডবেশ্বরেও অনুরূপ লিঙ্গ আছে।

মনে হয় ভরতবংশীয় রাজাদের অভ্যুত্থান পূর্বভারতে হয়েছিল। ভরতবংশীয় রাজারা ঋগ্বেদে বর্ণিত সম্মিলিত দশ রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পাণিনি

ও পতঞ্জলি ভরতদের প্রাচ্যদেশীয় বলে অভিহিত করেছেন। মহাভারতের আদি-পর্বে উল্লিখিত এক কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভরতবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের এক পূর্বপুরুষ অরিহ অঙ্গদেশের এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। 'কাশিকা' টীকা অনুযায়ী পাণিনি-উল্লিখিত প্রাচ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল পঞ্চাল, বিদেহ, অঙ্গ ও বঙ্গ। 'কাশিকা'র এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, মহাভারতের কাহিনী থেকে আমরা অবগত হই যে, পঞ্চপাণ্ডব একচক্রানগরে অবস্থানকালে পঞ্চাল রাজার কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং পঞ্চালদেশ বীরভূমের একচক্রানগরেরই নিকটবর্তী কোন রাষ্ট্র ছিল বলে মনে হয়।

মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবদের পলায়নের কাহিনী উপরি-উক্ত তথ্যসমূহকে সমর্থন করে। জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে বারণাবত নগরে। মনে হয় মহাভারতের বারণাবত ও বর্তমান বরৌনী অভিন্ন। বিদুর কর্তৃক প্রেরিত 'বাষ্পীয়' জলযানে আরোহণ করে পাণ্ডবরা পূর্বদিকে রওনা হয়ে প্রভাতকালে গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরে অবতরণ করেছিলেন। মনে হয় সে জায়গাটা রাজমহলের নিকটবর্তী কোনও স্থান। তারপর তাঁরা ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করে অবশেষে একচক্রা-নগরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ঘোর জঙ্গল সাঁওতাল পরগনার জঙ্গলই হবে এবং তা অতিক্রম করেই তাঁরা বীরভূম প্রদেশে প্রবেশ করে একচক্রানগরে এসে বাস-করতে শুরু করেছিলেন। এখান থেকেই তাঁরা একদিন পঞ্চালরাজ্যে গিয়ে স্বয়ংবর সভা থেকে দ্রৌপদীকে জয় করেছিলেন। সুতরাং পঞ্চালরাজ্য যে একচক্রানগরের নিকটবর্তী কোন দেশ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। পণ্ডিতগণ যে মনে করেন পঞ্চালরাজ্য উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত ছিল, তা ভুল বলেই মনে হয়। এরূপ মতবাদ পাণিনির 'কাশিকা' টীকার বিরোধী। 'কাশিকা' টীকায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, পঞ্চালরাজ্য বিদেহ, অঙ্গ ও বঙ্গের সঙ্গে প্রাচ্যদেশে অবস্থিত। (এ সম্বন্ধে লেখকের 'মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা' দ্রষ্টব্য)।

এ সকল ঘটনা বৈদিক যুগের পূর্বেই ঘটেছিল। তার সাক্ষ্য বহন করে মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী। প্রথমত, বহুপতিগ্রহণ বৈদিক ও বেদোত্তর যুগে প্রচলিত ছিল না। দ্রৌপদীর বহুপতিগ্রহণ আর্যদের পঞ্চনদে আসবার অপেক্ষার

ইতিহাসের ঘটনার প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, মহাভারত অনুযায়ী পাণ্ডবেরা প্রথমে দ্রৌপদীকে স্বয়ংবরসভা থেকে জয় করে এনে বহুদিন স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেছিলেন। তারপর তাঁরা দ্রুপদরাজার গৃহে আবার গিয়েছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে দ্রৌপদীকে বিবাহ করবার জন্য। এটা সকলেরই জানা আছে যে, মহাভারতের মধ্যে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। পরে দ্রুপদরাজার গৃহে গিয়ে দ্রৌপদীকে পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করার কাহিনীটি এরূপ প্রক্ষিপ্ত অংশ বলেই মনে হয়। আমি আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' (১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৮৭) গ্রন্থে দেখিয়েছি যে, বেদোত্তর যুগে যখন সপ্তপদীগমন ও বিবাহের অন্যান্য অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হয়েছিল তখনই কালোপযোগী করবার জন্য এই অংশ মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছিল। এই সকল ঘটনা থেকে মনে হয় যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবির সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবদের সম্বন্ধ অলীক নয়, এবং মহাভারতের মূলকাহিনী তাম্রাশ্ম-যুগের সমকালীন ও প্রাক্-আর্য যুগের।

মহাভারতীয় যুগের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে নানা মত প্রচলিত আছে। কিন্তু বাদবিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা এক সহজ উপায়ে মহাভারতের কাল নিরূপণ করতে পারি। 'বৃহৎসংহিতা'র গণনানুসারে ৬৫৩ কল্যব্দে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে (১৩৯২ বঙ্গাব্দ) ৫০৮৬ কল্যব্দ চলছে। সুতরাং সেই হিসাব অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেকের সময় ছিল ৪৪৩৩ বৎসর পূর্বে বা খ্রীস্টপূর্ব ২৪৪৮ অব্দে। এটা তাম্রাশ্ম-যুগের সমকালীন।

এ সম্বন্ধে একটা বক্তব্য আছে। C-14 পরীক্ষায় পাণ্ডুরাজার ঢিবির বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব ১০১২ ± ১২০। এটা যে অভ্রান্ত নয়, তা Carlton S. Coon-রচিত 'The History of Man' পুস্তকের ১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারা যায়। তিনি বলেছেন, C-14 পরীক্ষার জন্য আহৃত দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে polythylene tube-এর মধ্যে সীল করে না রাখলে পরীক্ষার ফল ভুল হবে। যেহেতু পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে আহৃত যে বস্তুর C-14 পরীক্ষা হয়েছে তা এরূপভাবে সংরক্ষিত হয়নি, সেই কারণে এর নির্ণীত বয়সও অভ্রান্ত নয়।

সাত

পণ্ডিতমহল ধরে নিয়েছেন যে, সিন্ধুসভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেছিল। এর জন্য তাঁরা নানারকম কারণও দর্শান। যথা বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প, বহিরাক্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বময়কর্তা স্যার জন মারশালের নির্দেশে ১৯২৮-৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন এ-সম্বন্ধে অনুশীলন করেছিলাম, তখনই প্রমাণ করেছিলাম যে সিন্ধুসভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি। বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ও বৈদিক বিরোধিতা সত্ত্বেও সিন্ধুসভ্যতা পরবর্তীকালে জীবিত ছিল হিন্দুসভ্যতার মধ্যে। ('ক্যালকাটা রিভিউ,' এপ্রিল-মে ১৯৩১ দ্রষ্টব্য)। তখনই আমি বলেছিলাম যে, রীতিমত খনন-কার্য চালালে দেখা যাবে যে সিন্ধুসভ্যতা গঙ্গা-উপত্যকার সুদূর প্রত্যন্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও আবিষ্কার আমার সে-উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

বাঙালীরা আজও সিন্ধুসভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। চলুন না একবার ঠাকুরঘরের দিকে যাই। ঠাকুরঘরে ব্যবহৃত বাসন-কোশনগুলি সবই তাম্রাশ্ম-যুগের। পাথরের থালা, তামার কোশাকুশি প্রভৃতি তার নিদর্শন। তাম্রাশ্ম-যুগের কোশাকুশি সম্প্রতি মহিষদলে পাওয়া গিয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙালী এগুলো তাম্রাশ্মযুগ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিশর বলুন, সুমের বলুন, সিন্ধু উপত্যকা বলুন সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে সেখানে অবশ্য তামা সামান্য কিছু কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাঙলাই ছিল সে-যুগের তামার প্রধান আড়ত। তামার সবচেয়ে বৃহত্তর খনি ছিল বাঙলাদেশে। বাঙলার বণিকরাই 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে, ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এজন্যই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দর-নগরের নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। এই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম তাম্রখনি হতে।

আট

সিন্ধুসভ্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতৃদেবীর ও আদি-শিবের পূজা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মাতৃদেবীর পূজার প্রাবল্য বাঙলাদেশেই সব-চেয়ে বেশী। এটা মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার যুগ থেকে চলে এসেছে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে আমরা মাতৃদেবীর পূজার নিদর্শনরূপে পেয়েছি মাতৃকাদেবীর বহু মৃন্ময়ী ক্ষুদ্রকায়া মূর্তি। অনুরূপ মূর্তি বাঙলাদেশেও বর্তমান কাল পর্যন্ত তৈরি হয়ে আসছে। তবে এগুলি সাধারণত বাচ্চাদের খেলার পুতুল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরূপ পুতুলগুলিকে 'কুমারী পুতুল' বলা হয়। এ নামটা খুব অর্থপূর্ণ। কেমনা মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও সমসাময়িক সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে মাতৃদেবী 'কুমারী' (virgin goddess) হিসাবে পূজিতা হতেন। মহাষ্টমীর দিন বাঙালী সধবা মেয়েদের 'কুমারী পূজা' তার স্মৃতি-নিদর্শন। যদিও তাম্রাশ্মযুগে মাতৃদেবী কুমারী হিসাবে পরিকল্পিত হতেন, তথাপি তাঁর ভর্তা ছিল। এই ভর্তার প্রতি-কৃতি আমরা মহেঞ্জোদারোতে পেয়েছি। তাঁকে পশুপতি শিবের আদিরূপ বলা হয়েছে। শিব যে প্রাগার্য দেবতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-সম্পর্কে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, বাঙলায় শৈবধর্মের প্রাধান্য। বস্তুত বাঙলায় যত শিব-মন্দির দেখতে পাওয়া যায়, তত আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং শিব ও শক্তিপূজা যে মহেঞ্জোদারো হরপ্পার কাল থেকেই চলে এসেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

[illegible]

সিন্ধুসভ্যতার অনুরূপ সভ্যতা সুমেরেও পাওয়া গিয়েছে। সুমেরের কিংবদন্তী অনুযায়ী সুমেরের লোকরা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছিল। সে জায়গাটা কোথায়? নিকট-প্রাচীর বিখ্যাত ইতিহাসকার হল (Hall) সাহেব বলেছিলেন যে সুমেরের লোকরা ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে 'যোগিনীতন্ত্রে' উল্লিখিত 'সৌমার' দেশের সঙ্গে 'সুমের'-এর বেশ শব্দগত সাদৃশ্য ও সঙ্গতি আছে। 'সৌমার' দেশ সম্বন্ধে 'যোগিনীতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে—'পূর্বে স্বর্ণনদী যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমেদক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচল/অষ্টকোণম্ চ সৌমারম্ যত্র দিক্করবাসিনী।' 'দিক্করবাসিনীর আবাসস্থল 'সৌমার' অষ্ট-কোণাকৃতি দেশ, যার সীমারেখা হচ্ছে পূর্বে স্বর্ণ নদী (সুবর্ণসিরি), পশ্চিমে

করতোয়া নদী, দক্ষিণে মন্দ-পর্বতসমূহ (মুণ্ডাজাতি অধ্যুষিত পর্বতমালা) ও উত্তরে বিহগাচল (হিমালয়)।' সুমেরের লোকরা যে প্রাচ্যভারত থেকে গিয়েছিল এবং তাদের নূতন উপনিবেশের নাম আগত দেশের নাম অনুযায়ী করেছিল (এরূপ নামকরণ-পদ্ধতি অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে), মাতৃ-পূজাই তার প্রমাণ।

বাঙলায় ও সুমেরের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—(১) উভয় দেশেই মাতৃদেবী 'কুমারী' হিসাবে কল্পিত হতেন, অথচ তাঁর ভর্তা ছিল, (২) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ এ তাঁর ভর্তার বাহন বৃষ, (৩) উভয় দেশেই মাতৃদেবী তাঁর নারীসুলভ কার্যাদি ছাড়া, পুরুষোচিত কর্ম (যেমন যুদ্ধাদি) করতে সক্ষম হতেন। সুমেরের লিপি-সমূহে পুনঃপুনঃ তাঁকে 'যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভারতেও "মার্কণ্ডেয়পুরাণ"-এর 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতারা অসুরগণ-কর্তৃক পরাহত হয়ে মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হন, এবং তাঁর সাহায্যেই অসুরাধিপতি মহিষাসুরকে নিহত করেন। (৪) সুমেরে মাতৃদেবীর সহিত পর্বতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তাঁকে পুনঃপুনঃ 'পর্বতের দেবী' বলা হয়েছে। ভারতেও মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি নাম সে-কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। (৫) উভয় দেশেই ধর্মীয় আচরণ হিসাবে মেয়েরা সাময়িকভাবে তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিত। এ সম্পর্কে ভারতে কুলপূজায় অনুরূপ আচরণ লক্ষণীয়। 'গুপ্তসংহিতা'য় স্পষ্টই বলা হয়েছে—'কুলশক্তিম বিনা দেবী যো জপেৎ স তু পামর।' আবার 'নিরুত্তরতন্ত্রে' বলা হয়েছে—'বিবাহিতা পতিত্যাগে দূষণম ন কুলার্চনে।' এসব ছাড়া, আরও সাদৃশ্যের কথা ১৯২৮-৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি আমার অনুশীলনের প্রতিবেদনে বলেছিলাম। ('ক্যালকাটা রিভিউ', এপ্রিল-মে ১৯৩১ দ্রষ্টব্য)।

১৩

বাঙালীরা যে মাত্র মধ্য-প্রাচীতেই শক্তিপূজার বীজবপন করেছিল, তা নয়। তারা শক্তিপূজা ভূমধ্যসাগরের সুদূর ক্রীটদ্বীপ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, ক্রীটদেশেও মাতৃদেবীর বাহন ছিল সিংহ। আগেই বলেছি, ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় আমি ক্রীটদেশে প্রচলিত লিপি

ও বাঙলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলাম। তা ছাড়া, ক্রীটদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত। বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্র' গ্রন্থে বলেছেন যে, পূর্ব-ভারতের রাজমহিষীরা তাঁদের দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখেন। ক্রীট দেশের সঙ্গে বাঙলাদেশের যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তা পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত ক্রীটদেশীয় লিপি-পদ্ধতিতে লিখিত এক চক্রাকার সীলমোহর থেকে জানতে পারা যায়।

অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরে যে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশ ছিল, তা আমরা অন্য সূত্র থেকেও জানতে পারি। ভেলেরিয়াস ফ্লাকাস তাঁর 'আরগনটিকা' পুস্তকে লিখে গেছেন যে গঙ্গারিডি দেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ১৫৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে (ঋগ্বেদ রচয়িতা নর্ডিক আর্যদের পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হবার সমসাময়িককালে) কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি করে ভার্জিল তাঁর 'জর্জিকাস' নামক কাব্যে লিখে গেছেন যে গঙ্গাবিডির বাঙালী বীরদের শৌর্য-বীর্যের কথা 'আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব।' এ সকল বাঙালীদের সেখানে উপনিবেশ ছিল, এবং সেখানে তারা শিবের আরাধনা ও কালীর পূজা করতেন।

এগারো

মহেঞ্জোদারোয় আমরা হস্তীর প্রতিকৃতি পেয়েছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নিবদ্ধ কিংবদন্তী অনুযায়ী হস্তী প্রাচ্যভারতের পালকাপ্য মুনি কর্তৃক বশীভূত জন্তু। তিনিই হস্তীকে প্রথম বশ করেন ও হস্তিবিদ্যা সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। পালকাপ্য মুনি নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা হচ্ছে—'হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন; তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিত বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য।' সুতরাং পালিত পশু হিসাবে হাতীর আদিম নিবাস বাঙলাদেশ। মহেঞ্জোদারোয় হাতীর উপস্থিতি বাঙলাদেশের সঙ্গে ওই সভ্যতার সম্পর্ক সূচিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহেঞ্জোদারোর ওই হাতীর প্রতি-

কৃত্তির সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার পাঞ্চ-মার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ হাতীর বিশেষ মিল আছে।

আরও অনেক জিনিস সিন্ধুউপত্যকায় বাঙালীরা নিয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। তার মধ্যে ছিল চাউল ও মৎস্য ধরবার বঁড়শি। চাউল ও মৎস্য—এ দুই-ই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ধান্যের চাষ যে বঙ্গোপসাগরের আশপাশের কোন জায়গায় শুরু হয়েছিল এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কারলো চিপোলো তাঁর 'দি ইকনমিক হিষ্ট্রি অফ ওয়ার্লড পপুলেশন' পুস্তকে এই মত প্রকাশ করেছেন। পরেশ দাশগুপ্ত 'এক্সক্যাভেশনস অ্যাট পাণ্ডুরাজার ঢিবি' বইয়েও বলেছেন যে ধান্যের চাষ বাঙলাতেই শুরু হয়েছিল, এবং বাঙলা থেকে তা চীন দেশে গিয়েছিল।

পশুপালন ও চাষবাস মানুষকে বাধ্য করেছিল স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে। এর ফলেই গ্রাম্য-সভ্যতার পত্তন ঘটে। এটা নবোপলীয় যুগেই প্রথম আরম্ভ হয়। কেননা, প্রত্নোপলীয় যুগের লোকেরা যাযাবরের জীবন যাপন করত। সুতরাং সভ্যতার সূচনা কোথায় হয়েছিল, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে, আমাদের প্রথমে নির্ণয় করতে হবে, নবোপলীয় সভ্যতার উৎপত্তিকেন্দ্র কোথায় ছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহলে (অবশ্য এখনও অনেক পণ্ডিত এই ভ্রান্ত মত পোষণ করেন) যে মত প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় আট-নয় হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচীর জারমো, জেরিকো ও কাটাল হয়ুক নামক স্থানসমূহেই নবোপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশ ইরানীয় অধিত্যকা ও মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আরও পরেকার আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে, তার চেয়ে আরও আগে নবোপলীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল থাইল্যাণ্ডে। এ সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বোনাগড্ শিলার। সি. ও. সয়ার তাঁর 'এগ্রিকালচারাল অরিজিনস্ অ্যাণ্ড ডিসপারসাল' নামক গ্রন্থেও বলেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাচীন লীলাভূমি ছিল বলে মনে হয়।

বারো

নবোপলীয় সভ্যতার পরের যুগেই তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। হরপ্পা নগরীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে, আমরা নবোপলীয় যুগ থেকে শুরু করে পরিণত

তাম্রাশ্ম সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি। মধ্যপ্রাচীতে এবং থাইল্যাণ্ডে যেমন স্বতন্ত্রভাবে নবোপলীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেরূপ ভারতেও নবোপলীয় সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা আমরা ভারতেও লক্ষ্য করি। এ ধারাবাহিকতা আমরা বাঙলাদেশেও লক্ষ্য করি। প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ আমরা বাঙলার নানাস্থান থেকে পেয়েছি। সেই সকল স্থানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—মেদিনীপুর জেলায় অযগড়া, শিলদা, আইজুড়ি, শহারি, ভগবন্ত, কুকড়াখুপি, গিডনি ও চিলকিগড়; বাঁকুড়া জেলায় কান্না লালবাজার, মনোহর, বন আহুরিয়া, শহরজোড়া, কাঁকড়াদাড়া, বাউড়িডাঙা, ঝাড়গ্রাম, শুশুনিয়া ও শিলাবতী নদীর প্রশাখা জয়পাণ্ডা নদীর অববাহিকা; বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতখনিয়া, বিলগড়া, সাগরভাঙা, আড়া ও খুকপির জঙ্গল। পুরুলিয়ার ঝালদা অঞ্চলে হেলায় গুহার আশপাশ থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষের আয়ুধ। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় ময়নামতী থেকে নয় কিলোমিটার দক্ষিণে লালমাই পাহাড়ের মধ্যে প্রস্তরযুগের মানুষের ব্যবহার করা ৫০টির ওপর প্রস্তরবস্তু পাওয়া গিয়েছে। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া থেকে আমরা যে সকল জীবের অশ্মীভূত কঙ্কালাস্থি পেয়েছি তার গুরুত্ব এ-সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি। এগুলি প্লাইস্টোসীন যুগের, তার মানে যে-যুগে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। আগের অধ্যায়েই বলেছি যে মানুষের বিবর্তন ঘটেছিল পূর্বগামী নরাকার জীব থেকে। এরূপ নরাকার জীবের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন আমরা পেয়েছি এশিয়ার তিন জায়গা থেকে। এই জায়গাগুলি হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিবালিক গিরিমালা, ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও চীনদেশের চুংকিঙ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখার দ্বারা সংবদ্ধ করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়, বাঙলাদেশ তার কেন্দ্রস্থলে পড়ে। সুতরাং এরূপ জীবসমূহ যে বাঙলাদেশেও ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এই সকল জীব থেকেই প্রকৃত মানবের (homo sapiens) বিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বাঙলাদেশেও প্রকৃত মানবের যে বিবর্তন ঘটেছিল, সে অনুমান আমি অনেক আগেই করেছিলাম। সম্প্রতি আমার এই অনুমান সমর্থিত হয়েছে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারা। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের অদূরে কংসাবতী নদীর বামতটে অবস্থিত শিজুয়া নামক স্থান

থেকে এক মানব চোয়ালের অশ্মীভূত ভগ্নাংশ পায় (নির্ণীত বয়স ১০,০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। আজ পর্যন্ত প্রাচীন প্রকৃত মানবের অশ্মীভূত যত নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন। সুতরাং হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর অনেক পূর্ব থেকে বাঙলাদেশে যে প্রকৃত মানব বাস করত এবং তারা প্রত্নোপলীয় যুগের কৃষ্টির ধারক ছিল, তা প্রমাণিত হচ্ছে।

আগেই বলেছি যে প্রত্নোপলীয় যুগ ও নবোপলীয় যুগের মধ্যকালীন যুগের কৃষ্টিকে মেসোলিথিক (mesolithic) কালচার বলা হয়। মেসোলিথিক কৃষ্টির প্রচুর নিদর্শন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৫৪-৫৭ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার বীরভানপুর থেকে আবিষ্কার করেছিল।

মেসোলিথিক যুগের পরেই নবোপলীয় যুগের উদ্ভব হয়েছিল। এই যুগেই মানুষ প্রথম কৃষি, পশুপালন, বয়ন, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল। নবোপলীয় যুগের বৈশিষ্ট্যমূলক আয়ুধ ছিল মসৃণ পরশু। এরূপ পরশু আমরা পেয়েছি বাঁকুড়া জেলার বন অসুরিয়া, কাচিণ্ডা ও জয়পাণ্ডায় ; মেদিনীপুর জেলার অরগণ্ডা, কুকড়াধুপি, তামাজেনি ও ডুলুঙ নদীর মোহনায় ও কংসাবতী নদীর অববাহিকায় কাঁকড়াদাড়া থেকে। নবোপলীয় যুগের পরশু আমরা উত্তরে দার্জিলিঙ জেলার কালিম্পঙ থেকেও প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। সুতরাং প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগের বিবর্তন যে বাঙলাদেশে স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতাই পরবর্তীকালে তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। যেহেতু তামার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার বাঙলাদেশেই ছিল, তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই বিবর্তন বাঙলাদেশেই ঘটেছিল, এবং বাঙলার বণিকরাই অন্যত্র তামা সরবরাহ করে সেসব জায়গায় তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতা গঠনে সাহায্য করেছিল। এটা মেদিনীপুরের লোকদের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। মেদিনীপুরের লোকেরা যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ওই জেলার পান্না গ্রাম থেকে। ওই গ্রামে (ঘাটালের ছয় মাইল দক্ষিণে) এক পুষ্করিণী খননকালে, ৪৫ ফুট গভীর তল থেকে পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালাবশেষ।

তেরো

বাঙলায় যে এক বিশাল তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার আগাইবনিতে ৪০ ফুট গভীর মাটির তলা থেকে আমরা পেয়েছিলাম তামার একখানা সম্পূর্ণ পরশু ও অপর একখানা প্রমাণ সাইজের পরশুর ভাঙা মাথা, ছোট সাইজের আধভাঙা আর একখানা পরশু, এগারোখানা তামার বালা এবং খানকতক ক্ষুদ্রকায় তামার চাঙারী। পুরাতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে এগুলি হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন মানব-গোষ্ঠীর। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুড়ি গ্রামেও তাম্র-প্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে ওই জেলারই এগরা থানার চাতলা গ্রামে আরও ওই ধরনের কিছু নিদর্শন মেলে। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার কুলগড়া থানার হাড়া গ্রামেও কিছু কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে মধ্যপ্রদেশের বেওয়া জেলার পাণ্ডিগাঁয়ে পাওয়া গিয়েছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঠিক আগাইবনির ধরনের ৪৭টি তামার বালা ও পাঁচটি পরশু। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরিযান (migration) পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘটেছিল।

আগেই বলেছি যে বাঙলার তাম্রাশ্ম সভ্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয়নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে। অজয়, কুনুর ও কোপাইনদীর উপত্যকার অন্যত্রও আমরা এই সভ্যতার পরিচয় পাই। পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগের লোকেরাই তাম্রাশ্ম সভ্যতার বাহক ছিল। তারা সুপরিকল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও দুর্গ—এই উভয়ই নির্মাণ করতে জানত। তারা তামার ব্যবহার জানত। কৃষি ও বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক ছিল। তারা ধান্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করত এবং পশুপালন ও কুম্ভকারের কাজও জানত। পূর্ব-পশ্চিম দিকে শয়ন করিয়ে তারা মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত।

এসব নিদর্শন থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সুদূর অতীতে পুরুলিয়া-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান অঞ্চল জুড়ে এক সমৃদ্ধিশালী তাম্রাশ্ম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল

খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে আমরা সেই লুপ্ত সভ্যতার মাত্র সামান্ত কিছু আভাস পাই। তাম্রাশ্মযুগ থেকেই বাঙালী ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এ বাণিজ্য খ্রীস্টজন্মের পর পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং আমরা তার এরূপ প্রমাণ পূর্ব মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনায় পেয়েছি। আজ যদি আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের ন্তায় প্রণালীবদ্ধভাবে রীতিমতো খননকার্য চালাই, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ বাঙলাদেশেই ঘটেছিল ও বাঙলাই এ সভ্যতার জন্মভূমি ছিল।

গঙ্গারিডি রাষ্ট্র ও তার ঐতিহ্য

৩২৬ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাবে এসে উপনীত হন, তখন পঞ্জাব বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তিনি পঞ্জাবের রাষ্ট্রগুলিকে পরাহত করে যখন ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা করছিলেন তখন তিনি সংবাদ পান যে ভারতের অভ্যন্তরস্থ দুই পরাক্রমশালী রাষ্ট্র যথা প্রাসিওই (প্রাচ্য) ও গঙ্গারিডি (গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাষ্ট্র) যৌথভাবে তাদের বিপুল সৈন্য-বাহিনী ও বিশাল রণহস্তীর নিয়ে তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অপেক্ষা করছে। পঞ্জাব পর্যন্ত এসেই আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা প্রাসিওই ও গঙ্গারিডি রাষ্ট্রদ্বয়ের অধিবাসীদের শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমের কথা শুনে, ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। অগত্যা আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর পশ্চিম তীর হতেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালের গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় লেখকগণ গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের লোকদের শৌর্যবীর্য ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। কিন্তু গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের সঠিক অবস্থান ও তার সীমানা আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় সূত্র থেকে আমরা মাত্র এইটুকু জানতে পারি যে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র গঙ্গানদীর মোহানা দেশে অবস্থিত ছিল এবং ওই রাষ্ট্রের প্রধান বন্দরের নাম ছিল 'গাঙ্গে'। তার মানে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র যে নিম্ন-বাঙলায় ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যদিও ভারতীয় সাহিত্যে গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের কোন উল্লেখ নেই, তবু যারা বাঙলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত তারা যখন গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের উল্লেখ করে গেছে, তখন গঙ্গারিডির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কোন কারণ নেই। এখানে উল্লেখনীয় যে অতি প্রাচীন কাল থেকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের সহিত বাঙলাদেশের যে সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল, তা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। খ্রীস্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় বণিকরা যে বাঙলার অভ্যন্তরস্থ বন্দরসমূহে বাণিজ্য উপলক্ষে উপস্থিত হতেন, তা পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে (বোলপুরের নিকট অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে) প্রাপ্ত ক্রীটদেশীয় প্রত্নদ্রব্যসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি। কালানু-ক্রমিকভাবে এ বাণিজ্য অনেককাল আগে থেকেই চলে এসেছিল।

এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার 'পূজা সংখ্যা'য় আমি ক্রীটদেশীয় বর্ণমালার সহিত বাঙলার লাঞ্ছনযুক্ত মুদ্রার (punch-marked coins) চিহ্নসমূহের হুবহু সাদৃশ্য দেখিয়েছিলাম। সম্প্রতি ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলান পিটফিল্ড ক্রীট দ্বীপের এক পর্বতের উপর থেকে ৫০টি মৃত্তিকা নির্মিত শিবলিঙ্গ পেয়েছেন, যার সঙ্গে আমাদের দেশের মেয়েরা বৈশাখ মাসে শিবপূজার জন্য যে মাটির লিঙ্গমূর্তি তৈরি করে তার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

দুই

এ বাণিজ্য যে পরেও চলেছিল তা আমরা জানতে পারি গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চব্বিশ পরগনায় চন্দ্রকেতুগড়, আটঘরা, হরিহরপুর, মল্লিকপুর, হরিনারায়ণপুর, বোড়াল, দেগঙ্গা, দেউলপোতা, পাকুড়তলা, মন্দিরতলা, পুকুরবেড়িয়া ও মেদিনীপুর জেলার তিলডা, পান্না, কাঁথি ও তমলুকে উৎখননের ফলে যেসব প্রত্নদ্রব্যসমূহ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে। এসব প্রত্নদ্রব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীস্টজন্মের এদিক-ওদিক শতাব্দীতে নিম্নবাঙলার সঙ্গে গ্রীক ও রোমান জগতের বেশ সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য চলত। এসব অঞ্চল থেকে আমরা যে সব প্রত্নদ্রব্য ও পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলকসমূহ পেয়েছি তাতে চিত্রিত মানুষের বেশভূষা, পাদুকা, কেশবিন্যাস প্রভৃতির রীতি ও বিদেশিনীর মূর্তি যে অভ্রান্তরূপে গ্রীক ও রোমান শিল্পশৈলীর প্রভাব বহন করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (এসব প্রত্নদ্রব্য সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আমার 'হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮ দ্রষ্টব্য)।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আসবার পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতিরা তাম্র আহরণের জন্য বাঙলাদেশে এসে হাজির হয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে যখন দুই সুদূর দেশের মধ্যে বাণিজ্যের লেনদেন চলে, তখন তারা পরস্পর উভয় দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে যে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশ ছিল, তা আমরা ভেলেরিয়াস ফ্লাক্কাস ও ভার্জিলের লেখা থেকে জানতে পারি। এসব তথ্য থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সাহিত্যে অনুল্লেখ থাকলেও, গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অমূলক নয়।

তিন

কাকদ্বীপে শ্রীনরোত্তম হালদার পরিচালিত গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রের সংগ্রহ-শালায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, পাকুড়তলা, মন্দিরতলা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার বালণ্ডা, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত যে সকল প্রত্নদ্রব্য সংরক্ষিত হয়েছে, তা থেকে স্বতই বোঝা যায় যে প্রাচীন গঙ্গারিডি রাষ্ট্র এক স্বকীয় সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল। এই সকল স্থান থেকে যেসব মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার এক পিঠে হস্তী, বৃষ, বৃষমুণ্ড, স্বস্তিকা ও ইন্দ্রযষ্টি ও অপর পিঠে চৈত্য, 'ক্রশ' ও বেরার মধ্যে গাছ প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত মুদ্রাগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। 'পাকুড়তলায় প্রাপ্ত উক্ত প্রকার মুদ্রার 'ছাঁচ' থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধযুগে এ অঞ্চল থেকে একদা এ ধরণের মুদ্রা প্রস্তুত হত। হস্তী ছিল বৃহত্তর গঙ্গাভূমি বা গঙ্গারিডির জাতীয় চিহ্ন। আর ধর্মীয় স্বস্তিকা চিহ্ন যে কত প্রাচীন তা ধারণাতীত এবং ধর্মীয় যুক্ত চিহ্নটি (+) সম্ভবত মৈত্রী বা সমন্বয়ের চিহ্ন হিসাবে যীশুক্রীস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই এ-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ; আর চৈত্য-চিহ্নে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব অনস্বীকার্য। ঘেরার মধ্যে গাছটি বোধিবৃক্ষের প্রতীক হতে পারে।'

এছাড়া মৌর্যযুগীয় তাম্রমুদ্রা, সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রস্তরমূর্তি, বাস্কেট চিহ্ন-যুক্ত পাত্র, পশুকঙ্কালের ফসিল, প্রস্তরীভূত দন্ত, পোড়ামাটি-নির্মিত কুবের মূর্তির পদযুগল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৌর্য-উত্তর যুগের হস্তীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে চন্দ্রকেতুগড় ও মুণ্ডহীন নারী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে হরিনারায়ণপুর থেকে। (যথাক্রমে শুঙ্গ যুগ ও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর)। পাকুড়তলা গ্রামে একটি দেবালয়ে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হয়, যার দুটি হাতের কনুই থেকে আর দুটি হাত বাহির হয়েছে। এ ধরণের মূর্তি এ পর্যন্ত কেবলমাত্র সরস্বতী নদী থেকে আদিগঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যেই পাওয়া গেছে ; এই মূর্তির শিরস্ত্রাণে দক্ষিণ ভারতীয় শৈলী পরিলক্ষিত হয়। কাকদ্বীপের সন্নিকটে পুকুরবেড়িয়া গ্রাম থেকে এ ধরনের একটি ছোট্ট প্রস্তরমূর্তি এবং সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকে সংগৃহীত এ ধরনের একটি পোড়া মাটির বিষ্ণুমূর্তি গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত হয়েছে। 'ছনধর লাট 'ধানি' থেকে প্রাপ্ত একটি বিদেশিনী মূর্তিতে গ্রীকো-রোমান শৈলী সুস্পষ্ট। (এরূপ মূর্তি পাকুড়তলা ও পুকুরবেড়িয়া থেকেও সংগৃহীত হয়েছে)। মাটির তলা থেকে ফাঁপা ও ভরাট উভয় প্রকার কয়েকটি

মুণ্ডমূর্তি গঙ্গারিডি সংগ্রহশালায় আছে। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের সুস্পষ্ট প্রমাণ এই মূর্তিগুলি। (নরোত্তম হালদার, 'গঙ্গারিডি : আলোচনা ও পর্যালোচনা'।

আটঘরা ও পাকুড়তলায় প্রাপ্ত মেষ-যুক্ত অগ্নিমূর্তি অগ্নি-উপাসকগণের উপস্থিতি সূচিত করে। চন্দ্রকেতুগড়ের সীলমোহরে সমুদ্রগামী জলযানের প্রতিকৃতি গঙ্গারিডিদের রণপোত ও নৌবাণিজ্যের পরিচয় দেয়। এছাড়া, বৃষ, অশ্ব, হস্তী, সর্প, পক্ষী প্রভৃতির মূর্তিগুলি 'টোটেম' পূজার নিদর্শন হতে পারে। এ ছাড়া, গঙ্গারিডির গবেষণা কেন্দ্রে আছে পোড়ামাটির শিশুকোলে মাতৃমূর্তি, পাথরের শিল্পাকৃতি শিবলিঙ্গ ও বিভিন্ন কালের পাত্র ও পোড়ামাটির বাটখারা। পাথরের বিষ্ণু পাদপীঠ, সরস্বতী মূর্তি, পোড়ামাটির মন্দিরফলক, প্রাচীন ইট, ঘর-ছাওয়া টালি, পাতকুয়ার অংশ, পাখী-বাঁশী, মুণ্ডমূর্তির চূড়া, নর্তকীমূর্তি, মাটির প্লেট, প্রদীপ, ধুনাচী, ধূপদানি, খেলনাগাড়ির চাকা, পোড়ামাটির ঢাকনা ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা পাওয়া গিয়েছে তা প্রস্তোপলীয় যুগের পাথরের হাতিয়ার, যা থেকে আমরা এ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে পারি। হাতিয়ারের ছিদ্রমধ্যে একখণ্ড প্রবাল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কালীঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত স্থানকে প্রবালদ্বীপের অন্তর্গত বলা হত।

চার

এই গঙ্গারিডি রাজ্যের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত ছিল আদিগঙ্গার প্রাচীন ধারা। অতীতে নাব্য অবস্থায় এই স্রোতস্বিনী ছিল বহির্জগতের সঙ্গে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবেশপথ। খ্রীস্টজন্মের এদিক-ওদিক দু চার শতাব্দীতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাই ছিল বহির্জগতের সঙ্গে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে আদিগঙ্গা যখন নাব্য অবস্থায় ছিল তখন এর উভয় তীরে অবস্থিত গঞ্জগ্রামসমূহ বিদেশীয়দের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সমৃদ্ধিশালীন হয়েছিল। আবার বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে আদিগঙ্গার বুকের ওপর দিয়েই বাঙালী বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত সাত-সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে দূর-দূরান্তরের দেশসমূহের সঙ্গে।

সেজন্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যেখানেই ঢিবি আছে, সেখানেই উৎখনন করার ফলে পাওয়া গিয়েছে বাণিজ্যপুষ্ট প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট হয়েছেন এই সকল ঢিবি উৎখনন করতে। শেষ খবরে জানা গিয়েছে বর্তমানে তাঁরা জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের বাইশহাটা অঞ্চলের ঘোষের চক মৌজায় খননকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে মণি নদীর (পূর্বনাম নালুয়া পাগু) উত্তরে দু'টি মাটির ঢিবিতে এই খননকার্য চলছে। এই দু'টি ঢিবি বর্তমানে মঠবাড়ি নামে পরিচিত। ১৭৭৮–৭৯ খ্রীস্টাব্দে মেজর রেনেল যখন এ অঞ্চলের জরীপ করেছিলেন তখন এখানে তিনি দু'টি মন্দির বা 'প্যাগোডা'র ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। পরে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে জায়গাটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। ১৮৩৭ সাল নাগাদ জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী রামধন ঘোষ এই জায়গা-টার ইজারা নেন। তিনিই জঙ্গল কেটে জায়গাটাকে চাষবাসের উপযোগী করেন। তখনই মঠবাড়ির ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে পড়ে। ওই সময়ে খননের ফলে দু'তিনটি পাথরের মূর্তি ও পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতার একটি স্তম্ভ পাওয়া যায়। স্তম্ভটির গায়ে খোদিত অভিলেখটি গুপ্তযুগের ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত। পরবর্তীকালের লোকেরা এখানে মাটি কাটতে গিয়ে পেয়েছে বেলেপাথরের মূর্তি, শিলালিপি, ঢাকনা-সমেত হাঁড়ি, লালপাথরের তৈরি বুদ্ধের চতুর্ভুজ মূর্তি, মৌর্যযুগের ও গুপ্তযুগের কাঁচা মাটির কালো পালিশযুক্ত পাত্র, কুমার-গুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা, শিব-দুর্গার চিত্রাঙ্কিত স্লেটপাথরের তৈরি প্লেটের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি।

এখন খননকার্যের ফলে বেরিয়ে পড়েছে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ বরা-বর দুটি পাঁচিল। আরও প্রকাশ পেয়েছে ধানক্ষেত থেকে বেশ কিছুটা নিচে মাটি খুঁড়ে ইটের বাঁধানো রাস্তার হদিশ, যা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে ওখানে অবস্থিত এক ছোট ও এক বড় মঠের মধ্যে ওই রাস্তাটি ছিল যোগ-সূত্র। এ-রকম খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে বাঙলার লুপ্ত সভ্যতার মাত্র সামান্য কিছু আভাস পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুসমূহ পাওয়া গিয়েছে কলকাতা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড়ে (বেড়াচাঁপায়)। এখানে যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে আছে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ এবং গুপ্তযুগের মূল্যবান নিদর্শনসমূহ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত নানা আকারের ও নানাবর্ণের মৃৎপাত্রসমূহ। এগুলি অধিকাংশই কুশানযুগের (খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের)। এগুলি প্রমাণ করে যে কুশানযুগে (তার মানে গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের সময়কালে) চন্দ্রকেতুগড় এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী ছিল। বোধ হয় এটাই গাঙ্গে নগর।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আর্য বলতে এক বিশেষ ভাষাভাষী গোষ্ঠীসমূহকে বোঝায়। এটা কোনও জাতিবাচক (racial) শব্দ নয়। কেননা, আর্যভাষাভাষী-দের মধ্যে আমরা যেমন 'নর্ডিক' নরগোষ্ঠীর লোক পাই, তেমনই আবার 'আল-পীয়', 'দিনারিক' প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকও পাই।

ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রুশদেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডই আর্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখানে 'নর্ডিক' ও 'আলপীয়' এই উভয় গোষ্ঠীর আর্যরাই বাস করত। 'নবোপলীয়' যুগের বিকাশকালে আল্‌পীয়রা কৃষি পরায়ণ হয়, আর নর্ডিকরা পশুপালনে রত থাকে। এর ফলে উপাস্য-দেবতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। নর্ডিকরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের উপাসক ছিল এবং উপাস্যদের 'দেব' বলে অভিহিত করত। আর 'আলপীয়রা' কৃষির সাফল্যের জন্য সৃজনশক্তি-রূপ দেবতাসমূহের পূজা করত। তাদের তারা 'অসুর' নামে অভিহিত করত। মনে হয় আলপীয়রাই প্রথম নিজে-দের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয়-বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। অপরপক্ষে তার কিছুকাল পরে নর্ডিকরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল পশ্চিমে ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় ও অপরদল ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রবেশদ্বার দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করে।

কিন্তু বৈদিক আর্যগণ পঞ্চনদের উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হল না। অনার্যগণের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে তারা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগল। যেমন যেমন অগ্রসর হল তেমন তেমন তারা উত্তর-ভারতের আর্য-প্রভাবান্বিত অঞ্চলসমূহের নামকরণ করল। যেমন, ব্রহ্মর্ষিদেশ, ব্রহ্মাবর্ত, আর্যা-বর্ত ইত্যাদি। কিন্তু মাত্র সংগ্রাম করেই তারা আর্য-ঐতিহ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আর্যেতর অধিবাসিগণের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই তাদের আপস করতে হয়েছিল। বস্তুত উত্তরভারতের আর্য সভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটা

সংমিশ্রণ প্রক্রিয়াও সমানভাবে চলেছিল। তার ফলে সৃষ্ট হল হিন্দুসভ্যতা—যেটা আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণের ফসল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাদের মগধ ও প্রাচ্যের দেশসমূহকে, যেমন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পশ্চিমের প্রত্যন্ত-দেশ সিন্ধু-সৌবীর, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য-পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে দেখি। কেন? তার উত্তর আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেব।

দুই

মনে হয়, বৈদিক আর্যগণ পঞ্চনদে এসে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বেই আর্যভাষা-ভাষী অসুররা ভারতে এসেছিল। আরও মনে হয়, তাদের মধ্যে যারা বণিক শ্রেণী ও শ্রেষ্ঠী শ্রেণী ছিল তারাই সর্বপ্রথম এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারা জলপথেই এসে ছিল বলে মনে হয়।

আলপীয় গোষ্ঠিভুক্ত অসুরদের বর্তমান ভারতে অবস্থান লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে, তারা সমুদ্রপথে রীতিমত বাণিজ্য করত এবং এই বাণিজ্য উপলক্ষেই তারা বাঙলাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল। প্রাচীন বাঙলার বণিকরা 'হট্ট' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এদের 'হাটী' বলা হয়। বর্ধমান জেলায় 'হাটী' পদবিবিশিষ্ট জাতি এখনও বর্তমান আছে। এই শব্দগুলি যে অসুর-বণিকদের 'হাট্টুস' বা 'হিট্টী' শব্দেরই রূপান্তর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অসুররাই বাঙলাদেশ থেকে তাম্র আহরণ করে জগতের সর্বত্র সভ্যতার সূচনায় সহায়ক হয়েছিল। তাম্রাশ্মযুগের সিন্ধু সভ্যতা যে অসুর সভ্যতার এক প্রতীক সেরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। আগেই বলা হয়েছে যে খুব সম্ভবত অসুররা দ্রাবিড়দের অনুসরণেই ভারতে এসেছিল। সুতরাং ওই সভ্যতার সঙ্গে যে দ্রাবিড় সভ্যতাও খানিকটা মিশে গিয়েছিল এমনও অনুমান করা যেতে পারে।

তিন

যদিও অসুররা আর্যভাষাতেই কথা বলত, তবুও তাদের ভাষার সঙ্গে বৈদিক আর্যভাষার কিছু পার্থক্য ছিল। গ্রিয়ারসন এটা লক্ষ্য করেছিলেন। সেজন্য তিনি ভারতের আর্যভাষাগুলিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন: (১) বহির্বর্তী

আর্যভাষা ও (২) অন্তর্বর্তী আর্যভাষা। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে গুজরাটী, মারাঠী, ওড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া ভাষাসমূহ। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে হিন্দী, রাজস্থানী ইত্যাদি। (লেখকের 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দ্রঃ)।

'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক গ্রন্থে বাঙলাভাষাকে 'অসুর জাতির ভাষা' বলা হয়েছে। ('অসুরনাম্ ভবেৎ বাচ গৌড়-পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা')। অথর্ববেদে প্রাচ্য-দেশের লোকদের 'ব্রাত্য' বলা হয়েছে এবং 'পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ' অনুযায়ী ব্রাত্যরা 'প্রাকৃত'-উদ্ভূত ভাষায় কথা বলত।

আগেই বলা হয়েছে যে, বৈদিক সংস্কৃতির ধারক নর্ডিক আর্যরা নিজেদের পূর্বদিকে বিস্তৃত করেছিল বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত। এই পর্যন্তই ছিল আর্যাবর্ত বা বৈদিক সংস্কৃতির লীলাভূমি। এর বাইরের লোকদের তারা হীন বা হেয় মনে করত। সেজন্য আর্যাবর্তের কোন লোক যদি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বাঙলাদেশে আসত, তা হলে তাকে পুনোষ্টম নামে এক যজ্ঞ সম্পাদন করে শুদ্ধ হতে হত। এই বিধান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, বাঙলাদেশের লোকরা তখন সংস্কৃতিবিহীন জাতি ছিল না। তাদেরও স্বকীয় সংস্কৃতি ছিল, স্বকীয় ধর্ম ছিল এবং তাদের দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তীর্থস্থানও ছিল। আর্যদের মধ্যে উদারপন্থী কেউ কেউ সে সকল তীর্থ দর্শন করতে আসত।

বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তরভারতের সংস্কৃতির পার্থক্য আজও লক্ষিত হয়। এটা বিশেষ করে প্রকাশ পায় তাদের আহার-বিহারের পদ্ধতিতে।

বাঙালীর আহারের একটা বিশেষ উপাদান হচ্ছে মাছ। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকরা মাছ খেত। কিন্তু বৈদিক আর্যরা মাছ খেত না। তারা খেত মাংস। এমনকি আর্যরা গোমাংসও আহার করত। কিন্তু অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকরা গরুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও বাঙালীর সঙ্গে উত্তরভারতের লোকদের পার্থক্য দেখা যায়। আসাম, বাঙলা, ওড়িশা, গুজরাট ও দক্ষিণভারতের লোকরা উপর-গায়ের জন্য চাদর ও পায়ে গোড়ালির দিকে খোলা জুতা পরে। তা ছাড়া, তারা রাঁধবার জন্য তেল ব্যবহার করে। কিন্তু উত্তরভারতের লোকরা উপর-গায়ের জন্য সেলাই-করা জামা ও পায়ে গোড়ালি-ঢাকা জুতা ব্যবহার করে এবং রাঁধবার জন্য তেলের পরিবর্তে ঘি ব্যবহার করে। রন্ধন-ক্রিয়ার বৈচিত্র্যেও বাঙালীর দক্ষতা সুবিদিত। বাঙালীর আহারে ৬৪ রকমের ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হত। কিন্তু উত্তরভারতের লোকরা

এত বেশী ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে জানত না।

আহার-বিহার ও বস্ত্রের বিভেদ ছাড়া অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে আর্যাবর্তের লোকদের ধর্মীয় সংস্কারেরও অনেক পার্থক্য ছিল। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল মৃত্যু-উত্তর জীবনে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষগণের পূজা, কৃষি-সম্পর্কিত অনেক উৎসব, যেমন—পৌষপার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি; মেয়েদের দ্বারা পালিত অনেক ব্রত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে চাউল, দূর্বা, কলা, হরিদ্রা, সুপারি ও পান, নারিকেল, সিঁদুর ও কলাগাছ প্রভৃতির ব্যবহার; শিলা, বৃক্ষ ও লিঙ্গপূজা, পূজায় ঘটের ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলি আর্য-অস্থৃষ্ট জাতিসমূহের ধর্মীয় আচারের অন্তর্গত। চড়ক, গাজন প্রভৃতি উৎসবও বাঙলাদেশের বৈশিষ্ট্য। এরূপ অনুমান করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বাঙালীর এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রাক্ আর্য যুগ থেকে প্রচলিত আছে। যোগ-অভ্যাস এর অন্যতম। লিঙ্গরূপী শিবপূজা, মাতৃদেবীর পূজা প্রভৃতি বাঙলা-দেশে প্রাক্-আর্য কাল থেকেই চলে এসেছে। তন্ত্রধর্মের উদ্ভবও বাংলাদেশেই হয়েছিল। বাঙালী সংস্কৃতির আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, যেমন—হস্তিবিদ্যা, রেশমবয়ন, সাংখ্যদর্শন, প্রেক্ষাগৃহ (বা রঙ্গালয়), নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি। এসব বাঙালী সংস্কৃতির অবদান। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি দেওয়া, আলপনা অঙ্কন প্রভৃতিও বাঙালী সংস্কৃতির নিজস্ব অবদান।

বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক রূপ

বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, আর্যরা প্রথমে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। তারপর তারা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু তাদের এই অগ্রগতি বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত এসে থেমে যায়। সেখানে তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের লোকদের কাছে। প্রাচ্য-দেশের লোকদের তারা ঘৃণার চোখে দেখত ও তাঁদের 'ব্রাত্য' বলে অভিহিত করত। ব্রাত্যদের আচার-ব্যবহার ও পূজা-পদ্ধতি আর্যদের আচার-ব্যবহার ও পূজা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তার কারণ, ব্রাত্যরা, তথা বাঙলা-দেশের আদিম অধিবাসিগণ, বৈদিক আর্যগণ থেকে ভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক ছিল। বৈদিক আর্যরা ছিল নর্ডিক নরগোষ্ঠির লোক। আর বাঙলায় আদিম অধিবাসীরা ছিল অষ্ট্রিকভাষাভাষী প্রাক্-দ্রাবিড়, দ্রাবিড়ভাষাভাষী দ্রাবিড়, ও আর্যভাষা-ভাষী আলপীয়-দিনারিক নরগোষ্ঠীর লোক। বাংলা ভাষায় বহু শব্দই এই সকল নরগোষ্ঠীর শব্দ। (লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ১৯৪২; জিজ্ঞাসা ১৯৭৫, ১৯৭৭ ও ১৯৮৬ ও এই বইয়ের 'বাংলা ভাষা ও লিপির উৎপত্তি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

যদিও মৌর্যযুগ থেকেই বাঙলায় ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তা হলেও ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণরা বাঙলায় আসতে শুরু করে গুপ্তযুগে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলাদেশে বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্র-জালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, লিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, 'টটেম'-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভূত-প্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম গঠিত ছিল। কালের বিবর্তনে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজা-

পার্বণের অনুষ্ঠান, যেমন দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটুপূজা, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় এবং পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও নেওয়া হয়েছিল আটকৌড়ে, শুভচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন, অলক্ষ্মীর পূজা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির অবদান। এ ছাড়া, নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজা পূজা, বৃক্ষের পূজা, বৃষকাষ্ঠ, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা ও অম্বুবাচী, অরন্ধন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক্-আর্য জাতিসমূহের কাছ থেকে নেওয়া। (লেখকের "হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল", ১৯৬৩ ও "বাঙলার সামাজিক ইতিহাস", জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬ ও ১৯৮২ দ্রষ্টব্য)।

দুই

এই সকল উপাদানের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন মায়া জাতির ন্যায় বাঙলার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল লৌকিক জীবনচর্যার ওপর জ্যোতিষের প্রভাব। সে প্রভাব বাঙালী আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সামাজিক জীবনে বিবাহই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিক সংস্কার। বাঙালী পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় কোষ্ঠী-ঠিকুজিতে সপ্তম ঘরে মঙ্গল বা কোন পাপগ্রহ বা সপ্তমাধিপতি কোন্ ঘরে আছে, তার বিচার করে। যদি সপ্তম ঘরে কোন পাপগ্রহ থাকে, তবে সে বিবাহ বর্জন করে। তারপর গণের মিল ও অমিলও দেখে। আবার সব মাসেও বাঙালীর বিবাহ হয় না। বারো মাসের মধ্যে মাত্র সাত মাসে বিবাহ হয়। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঙালী জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় না। বিবাহের পর আসে দ্বিরাগমনের ব্যাপার। বাঙালী পঞ্জিকা দেখে দ্বিরাগমনের দিন স্থির করে। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে কালবেলা, বারবেলা, কালরাত্রি ইত্যাদি পরিহার করে। বাঙালী বিবাহিতা

মেয়েদের জীবনে আরও অনেক অনুষ্ঠান ছিল, যথা গর্ভাধান বা প্রথম রজোদর্শন, পুংসবন, পঞ্চামৃত, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি। এইসব অনুষ্ঠানের জন্যও পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির করা হয়।

উপনয়নের ক্ষেত্রেও, বিবাহের মতো পঞ্জিকার নির্দেশ অনুসৃত হয়। এ-ছাড়া আছে নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা ইত্যাদি অনুষ্ঠান। এসবও পঞ্জিকা অনুমোদিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালীর বৈষয়িক ও ধর্মীয় জীবনেও জ্যোতিষের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্র পরিধান, রত্নধারণ, দেবগৃহারম্ভ, জলাশয়ারম্ভ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবতা গঠন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, শিব প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা, নৌকাগঠন, নৌকাচালন, নৌকাযাত্রা, ক্রয়বাণিজ্য, বিক্রয়বাণিজ্য, বিপণ্যারম্ভ, রজোদর্শন, ঔষধকরণ, ঔষধসেবন, গ্রহপূজা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, আরোগ্য স্নান, হলপ্রবাহ, বীজবপন, বৃক্ষাদিরোপণ, ধান্যরোপণ, ধান্যচ্ছেদন, ধান্যস্থাপন, ধান্য-নিষ্ক্রমণ, নাট্যারম্ভ, নবান্ন, ঋণদান, ঋণগ্রহণ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও আজকাল এ-সকল ব্যাপারে বাঙালী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর দিন-ক্ষণ দেখে না, তথাপি যারা মানে তাদের হিতার্থে পঞ্জিকায় এ-সকল ব্যাপারের প্রশস্ত দিন দেখানো থাকে। এ-সকল দিন যে পঞ্জিকায় দেখানো থাকে, তা থেকে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, একসময় বাঙালীর লৌকিক জীবনে দিন-ক্ষণ দেখেই এ-সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হত।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে জ্যোতিষিক প্রভাবের শেষ এখানেই নয়। খাদ্যা-খাদ্য ও উপবাস সম্বন্ধেও বাঙালীকে অনেক জ্যোতিষিক অনুশাসন মানতে হত, এবং এখনও হয়। উপবাস সম্বন্ধে যে বচন অনুসরণ করা হত, তা হচ্ছে—"শোয়া ওঠা পাশ মোড়া। তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া॥ ক্ষ্যাপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট। এ নিয়েই কাল কাট॥" তার মানে শয়ন একাদশী (আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী), পার্শ্বপরিবর্তন (ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), ভীম একাদশী (মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), উত্থান একাদশী (কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী), শিবরাত্রি (ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী) ও দুর্গাষ্টমী (আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী)—এইগুলিই হচ্ছে উপবাসের বিশিষ্ট দিন। প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে এইসব জ্যোতিষিক অনুশাসন বা তথ্যসমূহ, এরূপ ছড়ার আকারেই বাঙালীর লৌকিক সমাজে প্রচলিত ছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ খনা ও ডাকের বচনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুগে যুগে এগুলোর ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এসেছে অতি প্রাচীনকাল থেকে।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আরও বিধিনিষেধ আছে। অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীর দিন সন্তানবতী মেয়েরা মাছ খায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার হিসাবে গণ্য হয়। ওদিনও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুপূজার দিন। ওই সকল দিনেও মেয়েরা মাছ খায় না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিনও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুরা মাছ খায় না। দশহরার দিন ফলার আহার করবার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া, কোন কোন দিনে ঠাণ্ডা খাদ্য খাবার নিয়ম আছে। তার মধ্যে পড়ে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন। ওই দিন তপ্ত খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। মাত্র পূর্বদিনের রান্না করা জিনিসই খাওয়া চলে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী 'শীতল ষষ্ঠী' নামে আখ্যাত। ওই দিনও ঠাণ্ডা খাওয়া হয়। এ ছাড়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খাওয়া নিষিদ্ধ। মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ পর্যন্ত পালন করে আসছে। তবে পঞ্জিকায় যে-সকল খাদ্য বা কর্ম বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করা আছে, তার সবগুলি বাঙালী হিন্দু আর মানে না। সে-সকল নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমি শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁই শাক, ত্রয়োদশীতে মাষকলাই। এগুলি থেকে বাঙালীর খাদ্যে তরিতরকারির একটা হদিশ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় এর মধ্যে আলু বা কপি নেই। তার কারণ, এগুলো বিদেশী তরিতরকারি, মাত্র দু-তিন শো বছর আগে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে। এ ছাড়া, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য-মাংসাদি সম্ভোগও নিষিদ্ধ।

তিন

আদিম সমাজসমূহের সংস্কৃতির গঠনে মেয়েদের প্রভাব বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতিতেও আমরা সেই প্রভাবই লক্ষ্য করি। বাঙালী মেয়েদের জীবন শুরু হত কতকগুলি ব্রতপালন নিয়ে। যেমন,

আট বছর বয়স পর্যন্ত কুমারী মেয়েরা বৈশাখ মাসে শিবপুজা ও পুণ্যিপুকুর, কার্তিক মাসে ফুলকুলতি, পৌষ মাসে সোদর, মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি ব্রত করত। আর সধবা মেয়েদের তো সারা বছর ধরেই কোন-না-কোন ব্রত লেগে থাকত। এ ছাড়া, বৈশাখ মাসে বিধবাদের ছিল কলসী উৎসর্গ ও আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী। সীমান্ত অঞ্চলের (বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া) মেয়েরা পৌষমাসে টুসু ও ভাদ্রমাসে ভাদু ব্রত উৎসব করে। এই ব্রতগুলিই ছিল বাঙলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের স্তম্ভস্বরূপ।

সামাজিক জীবনেও, মেয়েদের শাস্ত্রবহির্ভূত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে। এ বিষয়ে বাঙালী মেয়েরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বিবাহ সম্পর্কিত স্ত্রী-আচার সমূহের ওপর। (বাঙলা দেশের বিভিন্ন অংশে বিবাহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি এক হলেও, স্ত্রী-আচার সমূহের আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়।) এই সকল লৌকিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আইবুড়োভাত, দধি-মঙ্গল, গায়েহলুদ, কলাতলায় স্নান করানো ও বরণ করা, হাই-আমলা, ছাদনাতলার অনুষ্ঠান-সমূহ, গাঁটছড়া বাঁধা, দুধ-আলতা অনুষ্ঠান, কড়ি বা গুটিখেলা, কালরাত্রি পালন করা, ফুলশয্যা ইত্যাদি। এ ছাড়া, বিয়ের কয়েকদিন বরের পক্ষে জাঁতি ও মেয়ের পক্ষে কাজললতা বহন করার বিধি আছে। এগুলো সবই প্রাক্-আর্য কালের মেয়েলি লৌকিক সংস্কৃতি। (বাঙালী বিবাহে স্ত্রী-আচার সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'স্ত্রী-আচার', বিশ্বভারতী, বই দুটি দ্রষ্টব্য।)

আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়। সেজন্য প্রথম রজোদর্শনের উৎসব আর হয় না। কিন্তু আগেকার দিনে যখন মেয়েদের আট-দশ বছর বয়সে বিয়ে হত, তখন মেয়েরা খুব ধুমধাম করে প্রথম রজোদর্শনের উৎসব পালন করত। শুধু তাই নয়, মেয়েটিকে কয়েকদিন ধরে ঘরের নিভৃত কোণে লুকিয়ে থেকে নিয়মনিষ্ঠ আহারাদি ও একটি পোটলার মধ্যে নানারকম ফল ও একটি প্রস্তরখণ্ডকে সন্তান কল্পনা করে প্রসবের অভিনয় করতে হত।

আগেকার দিনে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হত বলে, মেয়েরা কিছুকাল বাপের বাড়িতেই থাকত। তারপর যখন দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে ফিরে আসত, তাকে 'দ্বিরাগমন' বলা হত। এটা বিহারের 'গৌনা' অনুষ্ঠানের সামিল। এখনও ধুমধাম করে বিহারে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। যদিও শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুযায়ী

বারো বছরের পর মেয়ের বিয়ে হলে, দ্বিরাগমনের আর কোন প্রয়োজন নে তাহলেও লৌকিক আচার অনুযায়ী এখনও বিয়ের অব্যবহিত পরেই দ্বিরাগম পালিত হয়। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অভাব সত্ত্বেও দ্বিরাগমন পালন, লৌকি সংস্কৃতির ওপর 'ট্র্যাডিশন' বা পরম্পরার প্রভাব জ্ঞাপন করে। তেমনই যদি আগেকার দিনে সধবা স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক পালিত শাস্ত্রীয় অনেক আচার-অনুষ্ঠা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তা হলেও লৌকিক অনুষ্ঠানসমূহ এখনও প্রচলিত আছে প্রচলিত লৌকিক ব্রতগুলি মেয়েরাই পালন করে, পুরুষরা নয়। এ সমস্ত ব্র পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি বাঙল ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্ব হতেই পালিত হয়ে আসছে। পৌষ, চৈত্র ও ভ মাসে যে লক্ষ্মীপূজা পুরোহিতের সাহায্যে করা হয়, তাকে আগেকার দি (বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত) 'খন্দ' পূজা বলা হত। বোধ হয় গ্রামাঞ্চ এখনও বলা হয়। 'খন্দ' শব্দটা খুবই অর্থবাচক শব্দ এবং আদিম 'খন্দ' জাতি সঙ্গে এর সম্পর্কের ইঙ্গিত করে কিনা তা বিচার্য ; যদিও অভিধানে 'খন্দ' শব্দে অর্থ দেওয়া আছে 'ফসলাদি'। তবে লক্ষ্মীপূজা যে আদিম সমাজ থেকে গৃহী তা লক্ষ্মীর বাহন ও ঝাঁপির উপকরণসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। এ সম্পর্ আরও লক্ষণীয় যে, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, দেওয়ালী দিনের লক্ষ্মীপূজা, পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজা পুরোহিতের সাহায্যে করা সত্ত্বেও, মেয়েরা নিজে নিজে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করে ও লক্ষ্মী পাঁচালী পাঠ করে। নানা অঞ্চলে নানা নামে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়, যথা হরি মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, ভাওতা মঙ্গলচণ্ডী, ভাদাই মঙ্গলচণ্ ইত্যাদি। দেবীভাগবতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মঙ্গলচণ্ডী নারীগণ কর্তৃ পূজিতা দেবতা—'যোষিতানাম্ ইষ্টদেবতাম্', এবং চণ্ডী সম্বন্ধে মূর্তিনির্ম সম্পর্কিত কতকগুলি গ্রন্থে বলা হয়েছে—'গোধাসনে ভবেদ্ গৌরী লীলয়া হংস বদনা/ অক্ষসূত্রম্ তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা। গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ স্ত্রীয় সদা'। (আমার 'বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস', জিজ্ঞাসা, দ্রষ্টব্য।)

ষষ্ঠীর পূজার সঙ্গেও মেয়েদের সম্পর্ক দেখা যায়। সন্তানের মঙ্গল কামনা ষষ্ঠীদেবী মাতৃজাতির একান্ত আরাধ্যা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানা সময়ে এ পূজা করা হয়। সন্তান জন্মের ছয়দিনে সন্ধ্যায় ষেঠেরা পূজা করা হয়। একু বা ত্রিশ দিনে ষষ্ঠীপূজা করার প্রথা প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। অন্নপ্রাশ

প্রভৃতি শুভকাজে, সকল কাজের আগে ষষ্ঠীর পূজা করা হয়। তাছাড়া, বছরের বিভিন্ন মাসে নানা নামে ষষ্ঠী ঠাকরুনের পূজা করা হয়। যেমন, বৈশাখ মাসে চন্দনী ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে কার্দমী ষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্র মাসে চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিক মাসে নাড়ি ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসে মূলা ষষ্ঠী, পৌষ মাসে গুহ ষষ্ঠী, মাঘ মাসে শীতলা ষষ্ঠী, ফাল্গুন মাসে গো ষষ্ঠী ও চৈত্র মাসে অশোক ষষ্ঠী। ষষ্ঠী তিথি ছাড়া অন্য কোন দিনেও ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে। যেমন অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল প্রতিপদে হরি ষষ্ঠী, চৈত্র মাসে সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীল ষষ্ঠী। নদীয়া জেলায় হরি ষষ্ঠীতে কাঁচাঘট পুজা করা হয়। নীল ষষ্ঠীতে মেয়েরা উপবাস করে ও সন্ধ্যায় শিবের পূজা দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। মেয়েরা মনে করে যে নীলের দিনেই শিবের বিবাহ হয়েছিল। অনুরূপভাবে তারা শ্রাবণ মাসের যে-কোন সোমবারে শিবের উপবাস করে, কেননা শ্রাবণ মাস হচ্ছে শিবের জন্মমাস। অরণ্য ষষ্ঠী যে এক সময় অরণ্যেই পূজিত হতেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তা থেকেও তাই প্রমাণ হয়। বাঙলার দুটি জনপ্রিয় লৌকিক উৎসব হচ্ছে জামাই ষষ্ঠী ও ভাইফোঁটা। অরণ্য ষষ্ঠীর দিনই জামাই ষষ্ঠী। ওই দিন জামাইকে নিমন্ত্রণ করে শ্বশুরবাড়ি আনা হয় ও শাশুড়ি ঠাকরুন জামাইকে 'বাটা' প্রদান করেন। এ ছাড়া জামাইকে বিশেষ যত্ন করে আপ্যায়ন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই যেমন নিমন্ত্রিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেন, কার্তিক মাসে তেমনই জামাই নিমন্ত্রিত করে শ্যালক-সম্বন্ধীদের তাঁর বাড়ি নিয়ে যান, ও তাদের আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়ান। বোন ওই দিন ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে বলে—'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে যেন পড়ে কাঁটা।' জামাই ষষ্ঠীতে জামাইকে 'বাটা' দান ও ভাইফোঁটার দিন কপালে ফোঁটা দেওয়া সব বারে হয় না। কতকগুলো বার (যেমন সোম, শুক্র, শনি ও মঙ্গলবার) বর্জন করা হয়। বলা বাহুল্য, এই দুই অনুষ্ঠানেই পুরোহিতের কোন ভূমিকা নেই। মেয়েরাই এতে অংশ গ্রহণ করে।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে মেয়েরা যে ইতুপূজা করে, তাও পুরোহিত ব্যতিরেকে মেয়েরাই করে থাকে। এটাও যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে তা ইতুপূজা সম্পর্কে যে উপাখ্যান আছে, তাতে উমনো-ঝুমনো, এই নাম দুটি থেকেই প্রকাশ পায়।

বাঙালী হিন্দু বিধবার পক্ষে অবশ্য-পালনীয় একটা ব্রত হচ্ছে অম্বুবাচী। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিন দিন অম্বুবাচীর কাল ধরা হয়। ওই তিন দিন কোন বিধবা রন্ধন করেন না ও সদ্য অগ্নিপক্ব কোন খাদ্য গ্রহণ করেন না। অম্বুবাচী মানে বর্ষার সূচনা। নববর্ষাকে অভিনন্দিত করবার জন্য ওই তিন দিন চাষবাসও বন্ধ রাখা হয়। ওই তিনদিন পৃথিবী রজস্বলা হন। এ ছাড়া, ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে নষ্টচন্দ্রের দিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ। কার্তিক মাসে 'আকাশ প্রদীপ' দেওয়া হয়। সমস্ত পালপার্বণের দিন গঙ্গাস্নান করা হয়। চৈত্রমাসে গাজন উৎসব পালন করা হয়।

চার

অরন্ধন ও পৌষপার্বণ এ দুটো ছিল গ্রামবাঙলার আনন্দময় উৎসব। অরন্ধনের দিন মেয়েরা প্রকাশ করত তাদের রন্ধনক্রিয়ার দক্ষতা। এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হত। নানা পদের খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করে তাদের রসনার তৃপ্তি সাধন করা হত। আর পিঠে ছিল বাঙলাদেশের এক গৌরবময় ঐতিহ্যের নিদর্শন। পৌষপার্বণে মেয়েরা প্রদর্শন করত তাদের পিঠে তৈরির শিল্পচাতুর্য। সাধারণত সুগন্ধি আতপ চাউলের গুঁড়া, দুধ, ক্ষীর, নারিকেল, তাল খেজুরের গুড় প্রভৃতি দিয়ে পিঠে তৈরি করা হত। নানা প্রক্রিয়ায় ও বিচিত্র ছাঁদে পিঠে প্রস্তুত করা হত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে বিয়ের পর নতুন জামাই যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসত, তাকে আপ্যায়িত করা হত নানা রকমের পিঠে দিয়ে। অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পিঠে তৈরি করা হত। ধনী-গরীব সকল ঘরেই এটা প্রচলিত ছিল। রন্ধনক্রিয়া ও পিঠে তৈরির এ নৈপুণ্য মেয়েরা ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে। অথচ বাঙলার এটাই ছিল এক বিশিষ্ট ঐতিহ্য।

পাঁচ

যখন আমরা চিন্তা করি, যে, বাঙলা নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ, তখন বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এজন্য বাঙলা দেশের সকল জাতির (ব্রাহ্মণ পর্যন্ত) লোকই কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত। বাঙলার কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করত। বস্তুত ধানের চাষ

অষ্ট্রিক গোষ্ঠিভুক্ত জাতিসমূহের দান। চাউল যে বাঙালী নিজেই খায় (ভাত, মুড়ি, খই, চিড়ে ইত্যাদি রূপে) তা নয়, তার দেবতাকে সে নিবেদন করে। চাল-কলা না হলে ঠাকুরের নৈবেদ্যই হয় না। বিহার ও উত্তরভারতে যবচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নবান্ন, পৌষপার্বণ ইত্যাদি বাঙালীর পাল-পার্বণও চালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবার এই চালের পিটুলি তৈরি করে, তা দিয়ে বাঙালী প্রকাশ করে আলপনা রেখাচিত্রে তার নান্দনিক মননশীলতা।

কদলী বা কলাও অষ্ট্রিক যুগ থেকে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। সেজন্য বাঙালী কলা নিবেদন করে তার দেবতাকে। আখের চাষ ও গুড়ের উদ্ভবও বাঙলা দেশেই হয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মাত, যার নাম ছিল 'পৌণ্ড্রক'। এই জাতের আখ এখন ভারতের অন্যত্রও উৎপন্ন হয়, এবং তার মৌলিক নাম অনুযায়ী তাকে 'পৌড়িয়া', 'পুড়ি' ও 'পৌড়া' নামে অভিহিত করা হয়। 'গৌড়' শব্দটাও 'গুড়' শব্দ থেকে উদ্ভূত। পাণিনি বলেছেন : "গুড়স্য অয়ং দেশ গৌড়।"

এটা সহজেই অনুমেয় যে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানারূপ যন্ত্রাদি তৈরি করা হত। তাম্রাশ্মযুগে এসব যন্ত্রপাতি তামা বা পাথর দিয়ে তৈরি করা হত। পরে এগুলি লৌহনির্মিত হতে থাকে। রাঢ়দেশের অরণ্য অঞ্চলে লৌহ উৎপাদন হত। এ সকল অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল এবং এই সকল অঞ্চলের লোকরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিল। লৌহনির্মিত অস্ত্র ও লৌহ ঢালাইয়ের জন্য চুল্লি পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে পাওয়া গিয়েছে। বস্তুত বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত দেশজ প্রণালীতে লৌহ উৎপাদন হত ও তা দিয়ে মুঘল ও ইংরেজ আমলে কামান তৈরি করা হত। বিষ্ণুপুরের 'দলমাদল' কামান তার নিদর্শন। বস্তুত ধাতুশিল্পে বাঙালীর দক্ষতা ছিল অসামান্য। তার প্রমাণ আমরা পাই ঢোকরাদের ধাতু-শিল্পের নিখুঁত নৈপুণ্যে, ও স্বর্ণকারদের সোনা ও রূপার অলঙ্কার নির্মাণে। এ ছাড়া, ধাতুশিল্পীরা তৈরি করত বাসন-কোসন ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জিনিস।

বাঙালীর আরও অনেক লৌকিক শিল্প ছিল। তার মধ্যে হচ্ছে কার্পাস ও রেশম জাতীয় বস্ত্রাদি, যা বহন করত বাঙালী মনীষার গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। প্রতি ঘরে ঘরে সুতা কাটা হত। মাটির দেশ বাঙলায় মাটি দিয়ে তৈরি করা হত

পুতুল, যার মধ্যে প্রকাশ পেত অসামান্য সজীবতা। এই শিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বাঙালীর প্রাণের দেবতাগণের প্রতিমা গঠন ও পোড়ামাটির মন্দিরসজ্জা, যাতে রূপায়িত হয়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক দৃশ্য। পটচিত্রও বাঙলার লৌকিক শিল্পের আর এক অবদান। পটে চিত্রিত করা হত নানারূপ পৌরাণিক কাহিনী, দেবদেবীর মূর্তি, পাপ-পুণ্যের পরিণাম ও নানারূপ বিষয়-বস্তু। এর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল লক্ষ্মী সরা তৈরি, যা দিয়ে বাঙালী তার শ্রী-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে পূজা করত। ছউ নাচের মুখোশ ও দশাবতার তাস-ও বাঙালীর লোকসংস্কৃতির আর এক নিদর্শন। বাঙালীর নান্দনিক মননশীলতা আরও প্রকাশ পেত শাঁখের ও হাতির দাঁতের অলঙ্কারে, সোনার কাজে, কাঠখোদাইয়ের কাজে, গালার কাজে, ও আরও কত কি শিল্পে যা তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সার্থক করে তুলত। মেয়েদের অনুশীলিত আলপনা, কেশবিন্যাস ও নক্সী কাঁথা ইত্যাদি বহন করত তাদের সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর। বস্তুত বাঙালীর লৌকিক শিল্পসমূহে অনুরণিত হত তাদের প্রাণের স্পন্দন ও আনন্দময় জীবনচর্চা। (লেখকের 'ফোক এলিমেন্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ', ১৯৭৭, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস দ্রষ্টব্য)।

ছয়

অষ্ট্রিক যুগ থেকেই বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেয়েছিল নানারূপ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া। এখনও বাঙালী যদি দেখে রাস্তার তেমাথায় কেউ রেখে গিয়েছে সরায় করে জবা ফুল ইত্যাদি, তা হলে সে তা অতিক্রম করে না বা তার ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। শনি-মঙ্গলবারে রাত্রিকালে বাঙালী মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা ছেলে কোলে করে কখনও নিমগাছ বা বেলগাছের তলা দিয়ে যায় না। তাদের বিশ্বাস অপদেবতার দৃষ্টি লাগবে। গ্রামের লোক এখনও বিশ্বাস করে 'নিশিডাক'-এ। সেজন্য রাত্রিকালে কেউ কারও নাম ধরে তিনবারের বেশি না ডাকলে কখনও উত্তর দেয় না। বাঙালী বিশ্বাস করে যে 'বাদুলে' (বৃষ্টির দিনে যার জন্ম) ছেলে-মেয়ের বিয়ের দিনে নিশ্চয় বৃষ্টি হবে। তাই পাছে বিয়ের আনন্দ নষ্ট হয়, সেজন্য বৃষ্টি এড়াবার জন্য মেয়েরা হয় বাটনাবাটার শিল উলটে উঠানে স্থাপন করে, আর তা নয় তো কারুর বাড়ি থেকে একটা তৈজসপত্র না বলে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস এরূপ করলে আর

বৃষ্টি হবে না। বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুধ তুললে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা বিশ্বাস করে নজর লেগেছে এবং তার জন্য জলপড়া খাওয়ায়। এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের লোকের মনে ভূতপ্রেতের ভয়ও বিলক্ষণ। রাত্রিকালে আলগা জায়গায় কখনও ছেলেদের জামা-কাঁথা ইত্যাদি টাঙিয়ে রাখে না, পাছে অপদেবতার নজর লাগে। তা ছাড়া 'ভূতে পাওয়া' ব্যাপারও আছে। ভূতে পেলে 'রোজা' ডাকা হয়। 'রোজা' ভূত ছাড়িয়ে দেয়। বাঙালার লৌকিক জীবনে 'রোজা', 'গুণিন' ইত্যাদির ভূমিকা একসময় খুব বেশি ছিল। যাঁরা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়েছেন, তাঁরা জানেন ঠক-চাচা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সাপে কামড়ালেও 'রোজা' ডাকা হয়। 'রোজা'র ক্ষমতা আছে সাপের বিষ ঝাড়বার। শুনেছি, যে সাপ লোকটাকে কামড়েছে, সেই সাপটা নাকি রোজার সামনে এসে হাজির হয়। এ ছাড়া, কিছু চুরি গেলে বাঙালী বাটি-চালা, চালপড়া, নখদর্পণ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। বাটিচালার বাটি নাকি অপরাধীর কাছে গিয়ে হাজির হয়। চালপড়াতে যে চুরি করেছে তার থুতুর সঙ্গে রক্ত দেখা দেয়। নখদর্পণে কালি লাগানো বুড়া আঙুলের নখের মধ্যে অপরাধীকে দেখা যায়।

এ ছাড়া বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেত, বা এখনও গ্রামাঞ্চলে পায়, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস। এসবের প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি বিশদরূপে বর্ণনা করা আছে আমার 'ফোক এলিমেন্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ' বইয়ে (ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ১৯৭৫)। এসব মন্ত্রাদি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে এগুলো সবই প্রাক্-আর্য কালের।

আর্যপুরোহিতরাও কোন কোন ক্ষেত্রে, আদিম যুগের এসব প্রক্রিয়াকে যে অনুসরণ করেছিল সেটা 'অথর্ববেদ' পড়লে বুঝতে পারা যায়। তা ছাড়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি সেই আদিম যুগের পদ্ধতিরই ফলশ্রুতি। এ ছাড়া, বিরুদ্ধ গ্রহের প্রশমনের জন্য কয়েকটি গাছের মূল, ধাতু ও রত্নও ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি বীজমন্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক বার প্রতিদিন জপ করার ব্যবস্থাও আছে। এগুলির কোনটাই মৌলিক আর্যসংস্কৃতির অবদান নয়।

বলা বাহুল্য, বাঙালীর লৌকিক জীবনে এই সকল ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, আদিম সমাজ কর্তৃক অনুসৃত 'সদৃশ-বিধানী' (mimetic) ও 'সংস্পর্শ-বিধানী' (contagious) ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আদিম সমাজে

'সদৃশ-বিধানী' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় সদৃশ প্রক্রিয়ার দ্বারা সদৃশ উদ্দেশ্য সাধন করা। যেমন কাউকে মারতে হলে, তার একটা মৃন্ময় পুত্তলিকা তৈরি করে তার বুকে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এর ফলে শত্রু বিনষ্ট হবে। আর 'সংস্পর্শ-বিধানী' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় অপরের ব্যবহৃত কোন জিনিস (যেমন শাড়ির একটা কোণ বা ছেলের কাঁথার অংশ) এনে, তার ওপর ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে, তার অনিষ্ট হবে।

সাত

বাঙালীর লৌকিক জীবনে তুলসীর প্রভাব খুব বেশি। বাঙালীর কাছে তুলসী গাছ অত্যন্ত পবিত্র। বাঙালীরা মনে করে তুলসী যেখানে থাকে হরিও সেখানে থাকেন। সেজন্ত বাঙালী বাড়িতে তুলসীমঞ্চ তৈরি করে। তুলসী পাতা না হলে নারায়ণের পূজা হয় না। শ্রাদ্ধাদি কাজও হয় না। আবার তুলসীপাতা না হলে 'মৃতের দোষপ্রাপ্তি' কাটানো যায় না। শপথ করতে গেলেও তামা ও তুলসীর দরকার হয়। মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়। বৈষ্ণবেরা আবার তুলসী-কাঠের কণ্ঠী ব্যবহার করে। তুলসীর এই মাহাত্ম্যের জন্ত তুলসীতলা পরিষ্কার রাখা হয় ও সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দেওয়া হয়। কিন্তু সধবা মেয়েরা তুলসীপাতা তোলে না কেন ? উত্তর ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, পৌরাণিক উপাখ্যানে তুলসীর সতীত্বনাশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। উপাখ্যানটা কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী নারায়ণ তুলসীর স্বামী শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন। আবার পদ্মপুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণু বৃন্দারূপী তুলসীর স্বামী জলন্ধরের রূপ ধারণ করে এই অপকর্ম করেছিলেন। (লেখকের 'দেবলোকের যৌনজীবন' দ্রষ্টব্য।) অশ্বত্থ, বট, বেল, ঘেঁটু, ইত্যাদি বৃক্ষের পূজাও বাঙালী করে।

ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিকে নষ্টচন্দ্র বলা হয়। ওই দিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ, কেননা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ওই দিন চন্দ্র গুরুপত্নীকে ধর্ষণ করে-ছিলেন। ওই দিন গৃহস্থের বাড়ি থেকে ফলমূল চুরি করার প্রথা আছে। কেউ এটা দোষ বলে মনে করে না।

সবশেষে কয়েকটা লৌকিক দেবতার কথা বলব। এদের মধ্যে আছে রক্ষা-কালী, ওলাইচণ্ডী, শীতলা, ধর্মঠাকুর, টুসু, ভাদু, বড়কুমার, বড়কুমারী, বারামুণ্ড,

কালুরায়, গাজী, বনবিবি, ক্ষেত্রপাল, বাস্তঠাকুর, দক্ষিণরায় প্রভৃতি। বারা ধড়-হীন মনুষ্যমূর্তি ; আর দক্ষিণরায় বাঘ বা ঘোড়ায় চাপা দিব্য দেবতামূর্তি। সন্তান কামনায় বাঙালী পঞ্চাননেরও পূজা করে। সন্তানলাভ করলে, সে ছেলেকে 'পঞ্চাননের ডোর-ধরা' ছেলে বলে।

বারার পূজা হয় চব্বিশ পরগনায় পৌষসংক্রান্তি বা পয়লা মাঘ, বনে বা নদীর ধারে বা গাছতলায় বা ক্ষেতের আলে। অনেক জায়গায় এক পুরুষ-বারার পাশে, এক জলঘটকে স্ত্রীবারার প্রতীক হিসাবে রাখা হয়। আবার অন্যত্র স্ত্রী-পুরুষ যুগ্মমূর্তি স্থাপন করা হয়। এটা যে জাদুবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত লৌকিক উর্বরতা বা সুফলন-বর্ধক পূজা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতির বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

পাঁচ

বাঙালীর লৌকিক জীবনকে আনন্দময় করে রেখেছিল তার নিজস্ব খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ। ঘরের বাইরের খেলার মধ্যে ছিল কাবাডি, কুস্তি, লাঠি-খেলা, সাঁতার, নৌকার বাইচ ইত্যাদি। আর ঘরের ভিতরের খেলার মধ্যে ছিল দাবা, পাশা, গুটিখেলা, বাঘবন্দী, বউ বাসন্তী, মোগল-পাঠান, দশ-পঁচিশ, কড়ি খেলা ও তাসের বিন্তি ও রঙের খেলা। এ ছাড়া, ছেলেমেয়েরা খেলত লুকো-চুরি, কানামাছি, এক্কা-দোক্কা ইত্যাদি।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে লৌকিক জীবনে স্থান পেত যাত্রা, পুতুলনাচ, ভোজবাজী ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল নানা রকমের সংগীত অনুষ্ঠান। বাঙালীর সমস্ত লৌকিক জীবনটাই ছিল গানে ভরা। ছেলে হলে মেয়েরা গান গাইত। গান গেয়ে মেয়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়াতো। বিয়ে বা অন্য শুভানুষ্ঠানেও মেয়েরা গান গাইত। মরে গেলেও লোককে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হত সংকীর্তন গান গেয়ে। তারপর তার শ্রাদ্ধের সময়ও নামকীর্তন করা হত।

মধ্যযুগে বাঙালীর লৌকিক জীবনে পালাগান খুব জনপ্রিয় ছিল। এ সকল পালাগান গাওয়া হত মনসা, ধর্মঠাকুর, শিব, শীতলা, চণ্ডী, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিকে আশ্রয় করে। রাতের পর রাত এ সকল পালাগান গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে রাখত। পালাগান ছাড়া, পাঁচালী গানও খুব জনপ্রিয়

ছিল। পাঁচালীকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন দাশরথি রায়। পাঁচালী গায়ে মূল গায়েন পায়ে নূপুর পরে ও এক হাতে চামর ও অপর হাতে মন্দিরা নিয়ে, নাচতে নাচতে গান করত। পাঁচালীগানের নিজস্ব ছন্দ ও রচনাশৈলী ছিল। যাত্রাভিনয়ে যত লোক লাগে পাঁচালীগানে তত লোক লাগে না। এ ছাড়া গ্রাম্য-জীবনে ছিল কথকতা। কথক ঠাকুর নিজ আসনে বসে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বিবৃত করতেন, আর মাঝে মাঝে গান গাইতেন। বলা বাহুল্য, নিরক্ষর গ্রামবাসীরা এসবের মাধ্যমেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় কবিগানও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবিগানের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক মত আছে। এক মত অনুযায়ী এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অন্য মত অনুযায়ী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ঝুমুর ও ধামালীগান থেকে উদ্ভূত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল গোঁজলা গুঁই, লালু, নন্দলাল, রামজী, রঘুনাথ দাস, কেষ্ট মুচি, রাম নৃসিংহ, হরুঠাকুর, বলাই বৈষ্ণব, নীলমণি ঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, এন্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ভবানী বণিক প্রমুখ। কবিগান ছিল গানের লড়াই। এতে দুই পক্ষ যোগদান করত।

কবিগানের সাধারণত চারটে অংশ থাকত—ভবানী-বিষয়, সখী-সংবাদ, বিরহ ও খেউড়। খেউড়ের মধ্যে আদি-রসাত্মক অনেক গান থাকত। এক পক্ষ অনেকসময় গানের মাধ্যমে অপর পক্ষকে গালি-গালাজও করত। কবিগান মুখে মুখে রচনা করা হত। এর জন্য একজন বাঁধনদার থাকত। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হাফ-আখড়াই গানের অভ্যুদয়ের পর কবিগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে তরজা গানেরও জনপ্রিয়তা ছিল। তরজাও গানের লড়াই। এতে এক পক্ষ প্রশ্ন করত, অপর পক্ষ তার উত্তর দিত—সবই গানের মাধ্যমে।

যাত্রাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় ছিল। যাত্রাভিনয়ের মধ্যে থাকত কথোপকথন ও গান। এর জন্য কোন মঞ্চ তৈরি করা হত না। মাটির ওপরই কাপড় বিছিয়ে আসর তৈরি করা হত। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, লোকা ধোপা, গুর্ধি হাঁড়ি, নীলকণ্ঠ মুখুজ্যে, মণি রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখ যাত্রার জন্য বিখ্যাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কলকাতার লোকের কাছে

যাত্রাভিনয় বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল। তারপর থিয়েটারের চাপে যাত্রাভিনয় গ্রামের আঙ্গিনার মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। গ্রামের জমিদারেরাই এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু জমিদারি বিলোপের পর যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা গ্রামে কমে গিয়েছে। এখন যাত্রাভিনয়কে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এতে না আছে আগেকার দিনের যাত্রার পরিবেশ, না আছে তার বেশ। আগে যাত্রায় পুরুষরাই মেয়ে সেজে মেয়েদের ভূমিকা অভিনয় করত। এখন মেয়েরাই মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণ করে। (বাঙালীর লৌকিক জীবনে আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের 'ফোক্ এলিমেন্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ্' ও 'আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী' দ্রষ্টব্য)।

আর্যসমাজ থেকে বাঙলার সমাজসংগঠন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চাতুর্বর্ণ্যের ওপর। সুতরাং বিদেহের পূর্বে অবস্থিত 'প্রাচ্য' দেশে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। সেখানে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেটা হচ্ছে কৌমসমাজ—বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। সে সমাজের মধ্যে ছিল নানাবৃত্তিধারী মানুষ। কিন্তু তাদের মধ্যে চাতুর্বর্ণ্যের বিভেদ না থাকায় দরুনই আর্যরা প্রাচ্যদেশের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখত।

প্রাক্-আর্যদের প্রতি বৈদিক আর্যদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব খুব বেশি দিন টেকেনি। পঞ্চনদের উপত্যকা থেকে আর্যরা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগল, প্রাক্-আর্যজাতিসমূহের সঙ্গে তাদের ততই সংমিশ্রণ ঘটতে লাগল। এই সংমিশ্রণ বিবাহের মাধ্যমে ঘটেছিল। (লেখকের 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' ও 'ডিনামিকস্ অভ্ সিন্থেসিস্ ইন হিন্দু কালচার' দ্রষ্টব্য)। ক্রমশ আর্যরা প্রাক-আর্যজাতিসমূহের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার অনেক গ্রহণ করতে লাগল। 'সূত্র' যুগেই এই সংমিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান পূর্ণ-মাত্রায় ঘটেছিল। প্রাচ্যদেশের লোকদের প্রতি তাদের একটা উদার মনোভাব এ যুগেই সঞ্চারিত হয়েছিল এবং তারা বিধান দিয়েছিল যে, যদি কেউ তীর্থ-যাত্রা বা অন্ত কোনও কারণে প্রাচ্যদেশে যায়, তবে তাদের সে দোষ স্খলিত হবে পুনোষ্টম বা সর্বপৃষ্ঠা নামক যজ্ঞদ্বারা। কিন্তু পরে এই শুদ্ধিকরণ-বিধানেরও ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটে।

২

আগেই বলা হয়েছে যে বাঙলার সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক ছিল। বাঙলার জনপদগুলি এই সকল কৌমজাতির নামেই অভিহিত হত। এই সকল কৌমজাতির অন্ততম ছিল পুণ্ড্র, বঙ্গ, কর্বট প্রভৃতি। মনে হয়, এই পুণ্ড্রদের বংশধররাই হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি। অনুরূপভাবে এটাও অনুমেয় যে, বর্তমান কৈবর্তজাতি কর্বট-কৌমের বংশধর। এইসব জাতি ছাড়া প্রাচীন বাঙলায় আর

এক জাতি ছিল। তারা হচ্ছে বাগ্‌দি জাতি। এছাড়া আরও ছিল—হাড়ি, ডোম, বাউড়ি প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষরা। প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনাবলী থেকে আমরা জানতে পারি যে, মৌর্যদের সময় পর্যন্ত বাগ্‌দিরাই রাঢ়দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। কৈবর্তদের উল্লেখ মনুর 'মানবধর্মশাস্ত্র'-এ আছে। মনু এদের বর্ণ-সঙ্কর বলে অভিহিত করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ-এ এদের 'অব্রাহ্মণ্য' বলা হয়েছে। মনে হয়, মনু অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণ-এর উক্তিই ঠিক। দেশের অতি প্রাচীন অধিবাসী হিসাবে কৈবর্তদের সংস্কৃতি যে আর্যদের ব্রাহ্মণ্যধর্মবিহিত সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে পালরাজাদের সময় কৈবর্ত-জাতির শক্তির প্রবল অভ্যুত্থান ঘটেছিল। পালরাজাদের অধীনস্থ এক কৈবর্ত সামন্তরাজ দিব্যোক তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালকে (১০৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দ) নিহত করে বরেন্দ্রভূম অধিকার করেন এবং তথায় কিছুকাল রাজত্ব করেন। দিব্যোকের উত্তরাধিকারী হিসাবে আরও দু'জন কৈবর্তরাজা বরেন্দ্রদেশ শাসন করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন রুদোক ও ভীম। এই সময় কৈবর্তরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ও সমাজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। তখন আর তারা 'অব্রাহ্মণ্য' বা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বাইরে ছিল না। বস্তুত তাদের মধ্যে অনেকেই তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল এবং সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করে কবিতা রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। জনৈক কৈবর্ত কবি পপিপ-কর্তৃক রচিত একটি গঙ্গাস্তোত্র 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

আর এক জাতি যারা এই সময় প্রাধান্য লাভ করেছিল, তারা হচ্ছে বর্তমান সদ্গোপ জাতির পূর্বপুরুষরা। তাম্রাশ্মযুগ থেকেই গ্রামের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মনে হয় দক্ষিণরাঢ়ে কৈবর্তদের যেমন আধিপত্য ছিল, উত্তররাঢ়ে তেমনই সদ্গোপদের প্রাধান্য ছিল। বর্তমানকালে এই দুই জাতির পারস্পরিক অবস্থান থেকে তাই মনে হয়। এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, পাল ও শূরবংশীয় রাজারা সদ্গোপ ছিলেন। আরও মনে হয় বাঙলায় তন্ত্রধর্মের ব্যাপক প্রচার তাঁদের চেষ্টাতেই হয়েছিল। বস্তুত তাঁরা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। বর্ধমান ও বীরভূমের অংশবিশেষ নিয়েই ছিল সদ্গোপদের বাসস্থান—যাকে 'গোপভূম' বলা হত। সদ্গোপদের বিভিন্ন শাখা ভালকী, অমরাগড়, কাঁকশা, দিগ্‌নগর, ঢেকরী, মঙ্গলকোট, নীল-

পুর প্রভৃতি স্থানে বহু সদেগাপ রাজ্য স্থাপন করেছিল। পালরাজাদের আধিপত্যের সময় তারা পালরাজাদেরই সামন্তরাজা হিসাবে রাজত্ব করত। এই সকল সদেগাপরাজাদের অন্যতম ছিল ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষ। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি পালরাজ মহীপালের (৯৭৭-১০২৭ খ্রীস্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন। রামগঞ্জের তাম্রশাসনে ইছাই ঘোষের বংশ-তালিকা দেওয়া হয়েছে। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে মহামাণ্ডলিক ইছাই (ঈশ্বর) ঘোষের পিতা ছিলেন ধবলঘোষ (ধর্মমঙ্গল-কাব্য অনুযায়ী সোমঘোষ) ও তাঁর পিতামহ ছিলেন বলঘোষ ও প্রপিতামহ ছিলেন ধূর্তঘোষ। এ থেকে মনে হয় ধূর্তঘোষ খুব সম্ভবত পালরাজ রাজ্যপাল বা দ্বিতীয় গোপালের সমসাময়িক ছিলেন। অমরাগড়ে ইছাই ঘোষের সমসাময়িক সদেগাপরাজা ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। ইছাই ঘোষ ছিলেন ধর্মঠাকুরের উপাসক আর হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ভবানীর উপাসক। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, রামগঞ্জের তাম্র-শাসনে ইছাই ঘোষের নামের সঙ্গে যে-সকল উপাধিসূচক বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা পালরাজগণ-কর্তৃক ব্যবহৃত উপাধিসমূহকেও হার মানিয়ে দেয়।

সদেগাপদের প্রাধান্য যেমন উত্তররাঢ়ে, তেমনই বাঁকুড়া জেলায় ছিল মল্লদের প্রাধান্য। এঁরা প্রাচীন জৈনধর্মাবলম্বীদের উত্তরপুরুষ কিনা তা বিবেচ্য। কেননা, মহাবীর 'মলভার' বহন করতেন এবং অনেক জৈন যতি গৌরবের সঙ্গে 'মলধারী' উপাধি ধারণ করতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য 'মল্ল' শব্দটি 'বীর' শব্দের সমবাচক শব্দ হিসাবেই গণ্য হত। সে যাই হোক, পরবর্তীকালে আমরা আদিমল্ল, জয়মল্ল, কালুমল্ল ও বীর হাম্বীর প্রভৃতি মল্লরাজগণের সাক্ষাৎ পাই। যদিও বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরে তাদের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তথাপি তাঁদের রাজশক্তি উত্তরে সাঁওতাল-পরগনার দামিন-ই-কো থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমানের অংশবিশেষ ও পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অংশবিশেষও তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে উল্লেখনীয় যে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ 'মল্ল'দের অন্ত্যজ জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তিন

যদিও খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকেই বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তবুও গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙলাদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

বস্তুত গুপ্তযুগেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা এসে বাঙলাদেশে বসবাস শুরু করেছিল। সমসাময়িক তাম্রপট্টসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এ সময় বাঙলায় চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হয়েছিল এবং মন্দির নির্মাণ করাও হয়েছিল। এই সকল লিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, এই সকল ব্রাহ্মণ বেদের বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন করা সম্বন্ধে তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সাধারণত এই সকল ব্রাহ্মণ 'শর্মা' ও 'স্বামিন্' উপাধি ধারণ করত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'গাঁই' প্রথারও প্রচলন ছিল। 'গাঁই' বলতে সেই গ্রামকে বোঝাত যে গ্রামে এসে তারা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল। এই সকল 'গাঁই'-এর নাম (যেমন ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি) পরবর্তীকালে উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই সকল তাম্রপট্টলিপি থেকে আমরা ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের যে-সকল উপাধি পাই সেগুলি হচ্ছে দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মণ, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, দাম, ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র ইত্যাদি। এই সকল উপাধি বর্তমানকালে কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিসমূহ নিজেদের পদবী হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলছি সে যুগে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে 'কায়স্থ' জাতির উদ্ভব হয়নি। পরবর্তী কালের তাম্রপট্টসমূহে অবশ্য আমরা এক শ্রেণীর রাজকীয় কর্মচারীর উল্লেখ পাই, যাদের নামের সঙ্গে 'প্রথম-কায়স্থ', 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ', ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তারা সাধারণত সচিবালয়ে লেখকের কাজ করত। সমার্থবোধক শব্দহিসাবে 'করণ' শব্দও ব্যবহৃত হতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকেও আমরা জানতে পারি যে, প্রথমে 'কায়স্থ' এক বিশেষ বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম ছিল, কোনও বিশেষ জাতির নাম নয়। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এর জাতির তালিকার মধ্যে 'কায়স্থ' শব্দের পরিবর্তে সমার্থবোধক 'করণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। চান্দেলরাজ ভোজবর্মণের অজয়গড়-লিপিতেও তাই করা হয়েছে। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের লিপিসমূহেও তাই।

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে যদিও ওই সময়ের লিপিসমূহে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য অনেকেরই নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তারা কেউই নিজেদের ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে দাবি করেনি। বিশেষ করে আমরা প্রচুর পরিমাণে

'নগরশ্রেষ্ঠী', 'সার্থবাহ', 'ব্যাপারী' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাই। কিন্তু তাদের কাউকেই আমরা 'বৈশ্য' বলে দাবি করতে দেখি না। মনে হয়, উত্তরভারতের ন্যায় বর্ণবাচক জাতি হিসাবে 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈশ্য' জাতি কোনও দিনই বাঙলাদেশে ছিল না, যদিও বর্তমানে অনেক জাতির ক্ষেত্রে 'ক্ষত্রিয়ত্ব' দাবি করা একটা নেশায় পরিণত হয়েছে।

উপরে যে সমাজের চিত্র দেওয়া হল, তা হচ্ছে গুপ্তযুগের সমাজের চিত্র। আগেই বলা হয়েছে যে এই যুগেই উত্তরভারত থেকে ব্রাহ্মণরা দলে দলে বাঙলাদেশে এসে বসবাস শুরু করে ও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে। পরবর্তী কালে এরাই 'সপ্তশতী' বা 'সাতশতী' ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়। রাঢ়দেশে তারা সাতটি গোত্রভুক্ত ছিল ও বরেন্দ্রদেশে পাঁচটি। কুলশাস্ত্রসমূহে তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠাহীনতা ও অজ্ঞতার যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা অভিসন্ধিমূলক কু-প্রচার বলে মনে হয়। এটা পালযুগের ভূমিদান-সংক্রান্ত তাম্রপট্টলিপিসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়। কেননা, গুপ্তযুগে সাধারণ ব্যক্তিরাই ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করত। কিন্তু পালযুগে রাজারাজড়ারাও ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতে শুরু করেন। এই সকল তাম্রপট্টলিপিসমূহে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রজ্ঞ ও যাগযজ্ঞাদিকর্মে বিশেষ পারদর্শী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সকল ব্রাহ্মণ যে 'সপ্তশতী' সমাজভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই সকল লিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত চাতুর্বর্ণ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তার মানে গুপ্তযুগের ন্যায় পালযুগেও অনুরূপ সমাজব্যবস্থাই ছিল। মোট কথা, ওই যুগের ব্রাহ্মণেতর সমাজে পরবর্তী কালের ন্যায় কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না। কায়স্থরা পেশাদারী শ্রেণী হিসাবেই গণ্য হত এবং তারা রাজাদের মন্ত্রী ও এমন কি ভিষক্ হিসাবেও নিযুক্ত হত। এরূপ একজন ভিষক্-কায়স্থ 'শব্দপ্রদীপ' নামে একখানি ভেষজ-সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বস্তুত নবম ও দশম শতাব্দী থেকেই কায়স্থরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছিল। এবং তখনই বোধ হয় অন্যান্য জাতিসমূহের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে কৈবর্তদের তো অভ্যুত্থান ঘটেই ছিল, কারণ তা দিব্যোকের বিদ্রোহ থেকেই প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্য কোনও ব্রাহ্মণেতর জাতির উল্লেখ পালযুগের অনুশাসনসমূহে বড় একটা পাওয়া যায় না। এই সকল অনুশাসনে প্রধান ও

অপ্রধান রাজকর্মচারীদের নামের তালিকার পর যাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা হচ্ছে 'প্রতিবেশী', 'ক্ষেত্রকার' (বা 'ভূমিকর্ষক') এবং 'কুটুম্ব' বা প্রধান প্রধান গৃহস্থ। সুতরাং বাঙলাদেশে বর্তমানে যে জাতিবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়, পাল-যুগে তার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের নিম্নকোটির অন্তর্ভুক্ত যাদের নাম এই সকল অনুশাসন থেকে পাওয়া যায়, তাদের অন্যতম হচ্ছে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডাল। কিন্তু চর্যাসাহিত্যে আমরা যে-সকল জাতির উল্লেখ পাই তারা হচ্ছে ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিক। এরা সকলেই নিম্নস্তরের লোক ছিল। ডোমেরা গ্রাম বা নগরের বাইরে বাস করত ও ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক অস্পৃশ্যরূপে গণ্য হত। বৃত্তি হিসাবে তারা ঝুড়ি-চুপড়ি ইত্যাদি তৈরি করত এবং নাচ-গানে তারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। সকলের নীচে স্থান ছিল কাপালিকদের। তারা নর-কঙ্কালের মালা পরে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াত। শবররা পর্বতে ও অরণ্যে বাস করত। তারা ময়ূরপুচ্ছের পরিচ্ছদ পরত এবং গলায় গুঞ্জাবীজের মালা ও কানে বজ্রকুণ্ডল ধারণ করত। তারা সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিল এবং তাদের দ্বারা 'শবরী' রাগের প্রবর্তন হয়েছিল।

চার

এখন দেখা যাক, বাঙলার সমাজবিন্যাসের ইতিহাসে সেনযুগে কি ঘটেছিল। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেনরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁরা যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত পূজা-অর্চনাদি ও যাগযজ্ঞ-সম্পাদনে তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। এই সময়ের সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য পুনরায় ঘটে। তাঁরা স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহের অনুশাসন অনুযায়ী বিধান দিতে থাকেন এবং এই সকল বিধান সমাজকে ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে। এই যুগেই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ছাড়া, বৈদিক, শাকদ্বীপি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-দের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ছড়াছড়ি ঘটায় এই যুগে নূতন করে ব্রাহ্মণসমাজ সংগঠিত হয় এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী সেনরাজা বল্লালসেন কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে গাঁই-এর প্রাধান্য এই যুগে পরিলক্ষিত হয় এবং বন্দ্যো, চট্ট, মুখটী, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলী, কাঞ্জীলাল ও কুন্দলাল—এরা প্রধান বা 'মুখ্যকুলীন' হিসাবে পরিগণিত হয়। আর রায়ী, গুড়, মাহিন্ত, কুলভী, চৌতখণ্ডি, পিপ্পলাই, গড়গড়ি, ঘন্টাসরী,

কেশরকোনা, দিমসাই, পরিহল, হাড়, পিতমুণ্ডী ও ঘোষলি—এরা হয় গৌণ-কুলীন। বাকী ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হয়। রাঢ়ীয়দের ৫৬টি গাঁই (কারুর মতে ৫২ বা ৫৯)। আর বারেন্দ্রদের ১০০টি গাঁই। কিন্তু কিংবদন্তি অনুযায়ী বল্লালসেন কর্তৃক মাত্র পাঁচটি বারেন্দ্র গাঁই, যথা—লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র ও ভাদুড়ী কুলীন বলে স্বীকৃত হয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা—সিদ্ধশ্রোত্রীয়, সাধ্য-শ্রোত্রীয় ও কাষ্ঠশ্রোত্রীয়।

এখানে পরবর্তী কালে রচিত কুলপঞ্জিকাসমূহে বিবৃত এক কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাহিনী অনুযায়ী গৌড়ের রাজা আদিশূর একটি যজ্ঞ সম্পাদন করবার সংকল্প করে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনেন। বাঙলাদেশে সাতশতী, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী ছাড়া আর যত ব্রাহ্মণ বর্তমানে আছে তারা সকলেই এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর। এই পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন ভৃত্য আসে বর্তমান বাঙলায় কুলীন কায়স্থগণ তাদের মধ্যে চারজনের বংশধর। কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূরকে বল্লালসেনের মাতামহ বলা হয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতমহলে আদিশূর-কর্তৃক এই পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করা হয়নি। তবে আদিশূর নামে বাঙলাদেশে যে কোনও রাজা ছিলেন না, বা তিনি কোনও যজ্ঞ সম্পাদন করেননি বা তা অলীক বলে মনে করবার সপক্ষেও কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু কুলপঞ্জিকাসমূহে আদিশূরের বংশাবলী ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় তার বিভিন্ন নাম এবং তিনি যে পঞ্চব্রাহ্মণ এনেছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের বিভিন্ন নাম দেখে ওই কাহিনীর যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

তবে এটা ঠিক যে সেনরাজা বল্লালসেন কর্তৃক নূতন করে সামাজিক সংগঠনের একটা চেষ্টা হয়েছিল, যদিও সেটার ধারা, প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সঠিক কিছু জানা নেই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিন্দু-ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যে তাদের স্থান নির্ণয় করবার প্রয়োজনীয়তা সেনযুগেই অনুভূত হয়। এর ফলে, বাঙলাদেশে নানা জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়। সেনরাজত্বের অব্যবহিত পরেই 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' রাঢ়দেশে রচিত হয়েছিল। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ নানা জাতি ও উপজাতির উল্লেখ আছে।

সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ বর্ণিত জাতি ও উপজাতিসমূহ সেনরাজত্বকালেও বর্তমান ছিল। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ যে সকল জাতি ও উপজাতির তালিকা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে—

১. উত্তম সঙ্কর (শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণরা যাদের পুরোহিতের কাজ করে)—(ক) করণ, (খ) অম্বষ্ঠ, (গ) উগ্র, (ঘ) মগধ, (ঙ) গন্ধবণিক, (চ) কাংস্যবণিক, (ছ) শঙ্খবণিক, (জ) কুম্ভকার, (ঝ) তন্তুবায়, (ঞ) কর্মকার, (ট) সদ্গোপ, (ঠ) দাস, (ড) রাজপুত, (চ) নাপিত, (ণ) মোদক, (ত) বারুজীবী, (থ) সূত, (দ) মালাকার, (ধ) তাম্বুলি ও (ন) তৈলিক।

২. মধ্যম সঙ্কর—(ক) তক্ষ, (খ) রজক, (গ) স্বর্ণকার, (ঘ) সুবর্ণবণিক, (ঙ) আভীর, (চ) তৈলক, (ছ) ধীবর, (জ) শৌণ্ডিক, (ঝ) নট, (ঞ) শবক ও (ট) জালিক।

৩. অন্ত্যজ—(ক) গৃহি, (খ) কুড়ব, (গ) চণ্ডাল, (ঘ) বাডুর, (চ) চর্মকার (চ) ঘট্টজীবী, (ছ) দোলবাহী ও (জ) মল্ল।

এ ছাড়া আরও যেসব জাতির উল্লেখ আছে, তাদের অন্যতম হচ্ছে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ (দেবল, গণক ইত্যাদি) ও ম্লেচ্ছজাতিসমূহ, যথা—পুলিন্দ, কক্কস, যবন, খস, সৌম্য, কম্বোজ, শবর ও খর। লক্ষণীয় বাগদি, ডোম, কৈবর্ত প্রভৃতি যেসব জাতির একসময় বাঙলার জাতিবিন্যাসে প্রাধান্য ছিল, তাদের নাম এই তালিকায় নেই।

উপরে প্রদত্ত তালিকা থেকে বেশ বোঝা যায় যে তৎকালীন জাতিসমূহের উৎপত্তি তিনভাবে ঘটেছিল—(ক) বৃত্তিগত, (খ) কর্মগত, ও (গ) নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগত। তবে সুবর্ণবণিকদের মধ্যমসঙ্কররূপে গণ্য করবার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, বল্লভানন্দ নামে প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক রাজা বল্লালসেনকে অর্থ সরবরাহ করতে অসম্মত হওয়ায় বল্লালসেন তাদের অবনমিত করেছিলেন।

বাঙালীর বৈষয়িক জীবন

এবার প্রাচীন বাঙলার অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। অতি প্রাচীন বাঙলার কৌমসমাজে পশুপক্ষী শিকার দ্বারাই খাদ্য আহরণ করা হত। পরে নবোপলীয় যুগ থেকে লোকরা কৃষিনির্ভর হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর অনুশাসনসমূহে এদের ক্ষেত্রকরণ, কর্ষকরণ, কৃষিকরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেভাবে এদের উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে, এরা তৎকালীন গ্রামসমাজে বেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত। বস্তুত তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে সার্থবাহ বা বণিকদের সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। এ যুগের এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গ্রামে কৃষির উপযোগী ভূমির চাহিদা। এ থেকেই সে যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির ভূমিকা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। বর্তমানযুগের মানদণ্ডে তারা কৃষিকর্মে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। ডাক ও খনার বচনসমূহ আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, কৃষিকর্মের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ত তারা আবহাওয়াতত্ত্বকে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

বস্তুত যখন আমরা চিন্তা করি যে, বাঙলা নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ, তখন বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্ত আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, বাঙলাদেশে সকল জাতির লোকই কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইয়াং চুয়াং যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণরাও কৃষিকর্ম করত। পরে আমরা দেখতে পাব যে, পরবর্তীকালেও ঠিক তাই ছিল।

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করত। বস্তুত ধানের চাষ অস্ট্রিকগোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূহের অবদান। গম ও যবের চাষ বাঙলায় আগন্তুক আর্যরা উত্তরভারত থেকে প্রবর্তন করেছিল। বাঙলায় নানাজাতির ধান্তের চাষ হত এবং তাদের মধ্যে শালিধানের প্রসিদ্ধি ছিল। কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ'-এ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বিবৃত করেছেন যে, বাঙলাদেশের কৃষকপত্নীরা ইক্ষুক্ষেত্রের ছায়ায় উপবিষ্ট হয়ে শালিধান রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকত। বাঙলাদেশে ধান-রোপণ-প্রথার কথাও কালিদাস উল্লেখ করে গেছেন।

ধান্তের পর ইক্ষুই মনে হয় বড় কৃষিজাত পণ্য ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর

'রামচরিত'-এ উল্লেখ করেছেন যে বরেন্দ্রভূমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্ততম কারণ হচ্ছে তার ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ। পূর্বকালে বরেন্দ্রের অপর নাম ছিল পৌণ্ড্র এবং সুশ্রুত লিখে গেছেন যে, পুণ্ড্রবর্ধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মায় যার নাম হচ্ছে 'পৌণ্ড্রক'। এই জাতের আখ এখন ভারতের অন্যত্রও উৎপন্ন হয় এবং তার মৌলিক নাম অনুযায়ী তাকে 'পৌড়িয়া', 'পুঁড়ি' ও 'পৌড়া' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই সম্পর্কে এখানে শব্দতত্ত্বের এক মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুযায়ী 'গুড়' শব্দ থেকে 'গৌড়' শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল। গুড় যে বাঙলার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ পণ্য ছিল, তা আমরা খ্রীস্টপূর্ব-কালের গ্রীসদেশীয় লেখক ইলিয়াস ও লুকেনের রচনা থেকে জানতে পারি। এ ছাড়াও তুলার চাষও বাঙলায় সর্বত্র হত। যদি খনার বচন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ হয়, তা হলে ধানের চাষের দ্বিগুণ তুলার চাষ হত।

সরিষার চাষও প্রাচীন বাঙলায় খুব ব্যাপকভাবে হত। এটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, কেননা অনাদিকাল থেকে বাঙালী সরিষার তেলের সাহায্যে রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে আসছে। বরেন্দ্রদেশে এলাচের চাষও খুব বিস্তৃতভাবে হত। অনুরূপভাবে অন্যান্য যে সমস্ত পণ্যের চাষ হত, তার অন্যতম ছিল আদা, লঙ্কা, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, পিপুল, গুয়া (সুপারী) প্রভৃতি। বাঙলাদেশে এই সকল মসলাজাতীয় পণ্যের ব্যাপক চাষের কথা শুধু যে সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত'-এ বলে গিয়েছেন তা নয়, তাঁর বহুপূর্বে টলেমী, পেরিপ্লাস-এর নাবিক-গ্রন্থকার ও অন্যান্য লেখকরাও বলে গিয়েছেন। বিশেষভাবে রোম-সাম্রাজ্যে বাঙলার লঙ্কার বিশেষ আদর ছিল এবং এক সের লঙ্কার দাম ছিল ৬০ স্বর্ণ দীনার। অন্যান্য পণ্যেরও সেখানে রীতিমত চাহিদা ছিল।

আরও যে দুটি পণ্যের চাষ বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে হত তা হচ্ছে সুপারি ও নারিকেল। এ ছাড়া সারা বাঙলাদেশব্যাপী ছিল পানের 'বরজ'। পান খাওয়ার রীতিও বাঙলাদেশে অস্ট্রিক আমল থেকেই চলে এসেছে। কারণ 'বরজ' শব্দটাই হচ্ছে 'অস্ট্রিক' শব্দ। আর আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, তেঁতুল, আমলকী, ডুমুর প্রভৃতির গাছ ত ছিলই। কিন্তু খুব জনপ্রিয় গাছ ছিল মহুয়া। প্রাচীন বাঙলায় মহুয়াবৃক্ষের বিদ্যমানতা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক ছিল। এখনও দেখা যায় মহুয়াবৃক্ষ ব্যাপকভাবে রোপিত হয় বিহারের সেই অংশে, যে অংশ একসময় রাঢ়দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর-বাঙলায় প্রাপ্ত বহু

অনুশাসনে মহুয়াবৃক্ষ-সমন্বিত জমির উল্লেখ আছে। বাঙলার অন্যত্রও যে মহুয়ার-চাষ হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতনের নিকট-বর্তী স্থানে প্রাপ্ত 'ইরদা' তাম্রশাসন থেকে। অন্যান্য ফলের গাছের উল্লেখের মধ্যে আছে দাড়িম্ব, খেজুর, পর্কটি ও কদলী। নানা জায়গায় প্রাপ্ত ভাস্কর্যের মধ্যে ও পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির 'প্লাকে' কদলী অঙ্কিত দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে কদলী অষ্ট্রিক যুগ থেকেই বাঙলাদেশের প্রিয় খাদ্য ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষার্ধের তাম্রপট্টসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে বাস্তভূমি অপেক্ষা কৃষিভূমির চাহিদাই বেশি ছিল। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে এটাই স্বাভাবিক। ভূমি পরিমাপের জন্য মান ছিল—৮ মুষ্টি=এক কুঞ্চি; ৮ কুঞ্চি=এক পুষ্কল; ৪ পুষ্কল=এক আড়ক বা আঢ়ি; ৪ আড়ক=এক দ্রোণ; ৮ দ্রোণ=এক কুল্যবাপ; ৫ কুল্যবাপ=এক পাটক। আবার সমসাময়িক দান-পত্রসমূহে যে মান দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে—৪ কাক বা কাকিনী=এক উন্মান; ৫০ উন্মান=এক আঢ়ি; ৪ আঢ়ি=এক দ্রোণ। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জমির দামের হেরফের ছিল। কোথাও এক কুল্যবাপ জমির দাম ছিল চার দীনার, আবার কোথাও কোথাও তিন, দুই বা এক দীনার। তবে বাস্তজমি অপেক্ষা কৃষিজমির মূল্য ছিল বেশি।

এটা সহজেই অনুমেয় যে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানারূপ যন্ত্রাদি তৈরি হত। তাম্রাশ্মযুগে বোধ হয় এসব যন্ত্রপাতি তামা দিয়ে তৈরি হত। পরে এগুলি লৌহনির্মিত হতে থাকে। রাঢ়দেশের অরণ্য অঞ্চলে লৌহ-উৎপাদনের উল্লেখ আছে। এই সকল অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল এবং এই অঞ্চলের লোকরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিল। বস্তুত বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত লৌহের উৎপাদন হত।

তাম্রের উৎপাদনও বাঙলাদেশে বহুল পরিমাণে হত এবং তাম্রলিপ্তি, তামা-জুড়ি প্রভৃতি নাম তামার সহিত জড়িত। যা হোক, বর্তমানে ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন তামা ও লোহার খনি সেই অঞ্চলেই অবস্থিত যা একসময়ে রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'গৌড়িক' নামে এক প্রকার রৌপ্যের উল্লেখ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' আছে। নাম অনুযায়ী গৌড়দেশের সহিত এর সম্পর্ক সূচিত হয়। কৌটিল্য স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তার উল্লেখও করেছেন। বাঙলার হীরকখনিসমূহ-

মুঘলযুগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল, কেননা 'আইন-ই-আকবরী'তে গড়মন্দারণের হীরকখনির উল্লেখ আছে। মনে হয় এই সকল হীরকখনি বিহারের সীমান্তে অবস্থিত কোথরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কারণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় কোখরায় একাধিক হীরকখনি ছিল। অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশের হীরকখনির উল্লেখ আছে। আর মুক্তার কথা ত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের রচয়িতা বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'এখানে গঙ্গা নামে একটি নদী আছে। এর তটে গঙ্গা নামে একটি নগর আছে। এই নগরে মুক্তা, অতি সূক্ষ্মবস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে আনীত হয়। শোনা যায়, এর নিকটেই স্বর্ণের খনি আছে এবং 'ক্যালটিস' নামে একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রার এখানে প্রচলন আছে।' যদিও স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল, তা হলেও সাধারণ লোক কড়ির মাধ্যমেই কেনাবেচা করত।

বস্তুতঃ গুপ্তযুগ পর্যন্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। পাল ও সেনযুগে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা ছিল না। তখন সাধারণ লোক কড়িতেই কেনাবেচা করত। তার মান ছিল—২০ কড়া বা কড়ি=এক কাকিনী ; চার কাকিনী=এক পণ ; ১৬ পণ=এক দ্রম্ম (রৌপ্যমুদ্রা) ; ১৬ দ্রম্ম=এক নিষ্ক=এক দীনার।

প্রাচীন বাঙলায় শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্রই খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মস্‌লিন'। বাঙলার মস্‌লিন সারা বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করত এবং রোমসাম্রাজ্যে এর সবচেয়ে বেশী কদর ছিল। বাঙলায় এই সূক্ষ্মবস্ত্রের উল্লেখ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র,' 'পেরিপ্লাস' এবং পরবর্তীকালের চীন, আরব ও ইতালীয় লেখকদের পুস্তকে পাওয়া যায়। কার্পাসজাত এই সূক্ষ্মবস্ত্র ছাড়া রেশমবস্ত্রের উল্লেখও পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়, বাঙলাদেশে খ্রীস্টের তিন-চারিশত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হত।' রেশমের খুব ভাল কাপড়ের নাম ছিল 'পত্রোর্ণ' বা পাতার পশম। তিন জায়গায় এই 'পত্রোর্ণ' হত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে। মগধ ও পৌণ্ড্রদেশের অবস্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সুবর্ণকুড্য কোথায় ? শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে সুবর্ণকুড্য ও কর্ণসুবর্ণ অভিন্ন। কর্ণসুবর্ণ বলতে আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে রাজমহল পর্যন্ত ভূখণ্ড বুঝি। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভাল।

ভারতের অন্যত্র যে রেশমের চাষ হত, সেকথা কৌটিল্য বলেননি। তিনি পরিষ্কার বলে গেছেন যে, বাঙলায় ও মগধেই রেশমের চাষ হত। বাঙলায় রেশমের চাষ বাঙলার নিজস্ব অবদান। এটা চীনদেশ থেকে এদেশে আসেনি, কেননা, চীনের রেশম তুঁতগাছে হত। বাঙলায় রেশম হত নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল ও বটগাছে। তা ছাড়া চীনের রেশম সবই সাদা, পরে তা রঙ করে নিতে হত। বাঙলার নাগবৃক্ষের পোকা থেকে হলদে রঙের রেশম, লিকুচের পোকা থেকে গমের রঙের রেশম, বকুলের পোকা থেকে সাদা এবং বটের পোকা থেকে ননীর রঙের রেশম হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'বাঙালী চীন হতে কিছু না শিখে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

প্রাচীন বাঙলার ধর্মসাধনা

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলাদেশে আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, মানুষ ও প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, 'টোটেম'-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই প্রাক-আর্য ধর্ম গঠিত ছিল। কালের গতিতে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এই সকল সংস্কারই ক্রমশ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান যেমন—দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদি অধিবাসীদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও গৃহীত হয়েছিল আটকৌড়ে, সুবচনীপূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠীপূজা, বিবাহে গাত্র-হরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মী-পূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন ইত্যাদি আচার যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির দান। এ ছাড়া নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজাপূজা, বৃক্ষের পূজা, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি, যেমন—স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলি পর্ণশবরী, প্রভৃতির পূজা ও অম্বুবাচী অরন্ধন, পৌষপার্বণ, নবান্ন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক্-আর্য-জাতিসমূহের কাছ থেকে গৃহীত।

দুই

এই প্রাক্-আর্য ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, আজীবিক ও

বৌদ্ধধর্ম। বৈদিক ধর্মের অনুপ্রবেশ তখন বাঙলাদেশে খুব দুর্বলভাবেই ঘটেছিল। বস্তুত গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙলাদেশে সবলভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের রূপও তখন পালটে গিয়েছিল। তখন বৈদিক ধর্ম পৌরাণিক ধর্মে পরিবর্তিত হয়েছিল। তার আগে বাঙলায় বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম। বস্তুত বহিরাগত ধর্মসমূহের মধ্যে জৈনধর্মই প্রথম বাঙলাদেশে শিকড় গেড়েছিল। এর প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে ঘটেছিল মানভূম, সিংহভূম, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায়। চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে কুড়িজনের নির্বাণ ঘটেছিল হাজারিবাগ জেলায় পরেশনাথ পর্বতে। কিন্তু মনে হয়, জৈনধর্ম খুব সহজে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। জৈনধর্ম প্রচারের জন্য মহাবীরকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা, জৈনগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্রে' বলা হয়েছে যে, রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত বজ্জভূমি ও সুব্বভূমিতে তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। এই দুই অঞ্চলের লোকেরা যে জৈন সন্ন্যাসীদের প্রতি কেবল বিরূপ আচরণই করেছিল তা নয়, তারা তাদের পিছনে কুকুর পর্যন্ত লেলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এরূপ বিরুদ্ধ আচরণ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কেননা, আমরা হরিষেণ-রচিত 'বৃহৎকোষ' থেকে জানতে পারি যে, মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু নামক জৈন আচার্যের জন্ম হয়েছিল পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত দেবকোটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। এই উক্তি থেকে আমরা দুটি তথ্য অবগত হই। প্রথমত মৌর্যযুগেও ব্রাহ্মণরা এসে পুণ্ড্রবর্ধনে বসবাস শুরু করেছিলেন, আর দ্বিতীয়ত বাঙলাদেশে তখন জৈনধর্মের বেশ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। জৈনদের 'ষোড়শ জনপদে'র তালিকায় অঙ্গ, বঙ্গ, লাঢ (রাঢ় ; দেশসমূহের উল্লেখ থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, জৈনরা তখন বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। জৈন 'কল্পসূত্র' গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে যে, গোদাস প্রমুখ জৈন সাধুরা চার শাখায় বিভক্ত ছিলেন, যথা—'তাবলিত্তিয়' (তাম্রলিপ্তীয়), 'কোডিবর্ষীয়' (কোটিবর্ষীয়), 'পুণ্ড্রবর্ধনীয়া' (পুণ্ড্রবর্ধনীয়) ও 'খব্বডীয়' (কর্বটীয়)। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে বাঙলাদেশে জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে না পারলে, এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে কখনই চারটি বিশেষ শ্রেণীর জৈন সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটত না। এদের অভ্যুত্থান যে খ্রীস্টপূর্ব যুগেই ঘটেছিল সে "ম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। খ্রীস্টপূর্ব যুগের বহু অনুশাসনেই

এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন সাধুদের উল্লেখ আছে। মথুরায় প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর এক লিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, জনৈক জৈন সন্ন্যাসীর অনুরোধক্রমে রাঢ়দেশে একটি জৈন মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ১৫৯ খ্রি-ই সনের অনুশাসন থেকেও আমরা জানতে পারি যে, জৈনদের বটগোহালি বিহারের সেবার্থে ভূমিদান করা হয়েছিল। পরিব্রাজক উয়াং চুয়াংও বৈশালী, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কলিঙ্গদেশে অসংখ্য জৈন সন্ন্যাসী দেখেছিলেন। তিনি আরও বলে গিয়েছেন যে, পুণ্ড্রবর্ধনে জৈনদের এক বিশেষ কেন্দ্র ছিল। এ-সব প্রমাণের উপর নির্ভর করে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলাদেশে জৈনধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। কিভাবে বাঙলাদেশে জৈনধর্মের বিলুপ্তি ঘটল, সে সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। কেননা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের পর আমরা সাহিত্য ও অনুশাসনসমূহে জৈনদের সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ পাই না, যদিও পালযুগের কয়েকটি জৈন তীর্থংকরের মূর্তি আমরা বাঙলাদেশে পেয়েছি। যে-সকল মূর্তি আমরা পেয়েছি, সেগুলির অধিকাংশই হচ্ছে জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়ের মূর্তি; মাত্র একটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বাঙলাদেশে জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়েরই প্রভাব ছিল। বলা বাহুল্য দিগম্বর-সম্প্রদায়-ভুক্ত জৈনরা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করত।

তিন

প্রাচীন বাঙলায় আজীবিক ধর্মেরও বেশ প্রাবল্য ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আজীবিক ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহাবীরের বিশেষ বন্ধু এবং উভয়ে একসঙ্গে রাঢ়দেশে ছয় বছর বাস করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, পাণিনি-কর্তৃক উল্লিখিত 'মস্করিন' ও 'আজীবিক' অভিন্ন। তা যদি যথার্থ হয়, তা হলে বলতে হবে যে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম বাঙলায় আজীবিকরা তাঁদের ধর্ম-প্রচারকার্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, মৌর্যসম্রাট অশোক পুণ্ড্রবর্ধনদেশে জনৈক নির্গ্রন্থের অপরাধের জন্য ১৮,০০০ আজীবিক সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করেছিলেন। তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট অশোকের সময় পর্যন্ত আজীবিকরা বাঙলাদেশে বেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল এবং জৈনদের সঙ্গে তাদের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত আজীবিক

সম্প্রদায় যে বাঙলাদেশে বর্তমান ছিল, তা আমরা চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াং-এর ভ্রমণবিবরণী থেকে জানতে পারি। আরও জানতে পারি যে, উয়াং চুয়াং প্রথমে তাদের জৈন মনে করে ভুল করেছিলেন। এ থেকে মনে হয় যে, পরবর্তী-কালে আজীবিকরা জৈনদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আরও অনুমান করা যেতে পারে যে বহু জৈন বৌদ্ধ বা নাথপন্থী হয়ে গিয়েছিল।

চার

জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মও বাঙলাদেশে খুব প্রাচীন কাল থেকেই বিস্তারলাভ করেছিল। 'সংযুক্তনিকায়' অনুযায়ী স্বয়ং বুদ্ধ কিছুকাল পশ্চিম-বঙ্গের সেতক নগরে বাস করেছিলেন। 'বোধিসত্ত্বকল্পলতা'-তেও উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্মপ্রচারার্থে বুদ্ধ ছয়মাসকাল পুণ্ড্রবর্ধনদেশে বাস করেছিলেন। বাঙলা-দেশে বুদ্ধের বসবাস করা সম্বন্ধে উয়াং চুয়াংও তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এক কিং-বদন্তি নিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে বুদ্ধ তিনমাস পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সাতদিন সমতটে ও কর্ণসুবর্ণে বাস করেছিলেন। এছাড়া উয়াং চুয়াং সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত বহু স্তূপ সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণে দেখেছিলেন। সাঁচীর এক দানানুশাসন থেকেও আমরা জানতে পারি যে, ধর্মদত্ত ও ঋষিনন্দনা নামে পুণ্ড্রদেশবাসী জনৈক পুরুষ ও মহিলা সাঁচীস্তূপের তোরণ ও বেষ্টনীর নির্মাণকার্য সমাধার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থদান করেছিলেন। বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের সাহিত্য থেকেও আমরা জ্ঞাত হই যে ষোলজন বৌদ্ধ প্রাচীন মহাস্থবিরগণের অন্যতম কালিকা নামধারী সন্ন্যাসী তাম্রলিপ্তির অধিবাসী ছিলেন। এ-সব প্রমাণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের আমল থেকেই বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এমনকি, বাঙলাদেশে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিস্তারলাভ করে, তখনও বৌদ্ধধর্ম বাঙলাদেশে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন বাঙলাদেশে এসেছিলেন তখন তিনি তাম্রলিপ্তিতে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার দেখে-ছিলেন। ওই সকল বিহারে তিনি দুই বৎসরকাল যাপন করে বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অনুলিপি করে নিয়েছিলেন ও বৌদ্ধ মূর্তি ও চিত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এ-সব থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম তখন বাঙলাদেশে বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। বাঙলার নানাস্থানে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেবদেবীর বহু মূর্তির দ্বারাও

ইহা সমর্থিত হয়। বস্তুত তারনাথের অনুশাসন থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন উয়াং চুয়াং ভারতে আসেন, তখন তিনি কজঙ্গল, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি-অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাবল্য লক্ষ্য করে-ছিলেন। তবে মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তখন কিছু হ্রাস পেয়েছিল কেননা তাম্রলিপ্তিতে ফা-হিয়ান বাইশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন, আর উয়াং চুয়াং-এর সময় ছিল মাত্র ছয়টি। উয়াং চুয়াং ৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত ত্যাগ করে যান এবং ৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং ভারতে আসেন। এই দুই সনের মধ্যে আরও ৫৬ জন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন সেং-চি। তিনি সমতটে এক বৌদ্ধ রাজবংশকে সিংহাসনে আসীন থাকতে দেখেছিলেন। কিন্তু তারনাথের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে গোপাল কর্তৃক পালবংশ প্রতিষ্ঠার সময় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু পাল-রাজ-বংশের আমলে বৌদ্ধধর্ম আবার নূতনভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং বাঙলাদেশ বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। পাল-বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ধর্মপাল বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুশীলনের জন্য ন্যূনতম পঞ্চাশটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ত্রৈকূট বিহার, দেবীকোট বিহার, পণ্ডিত বিহার, সন্নগর বিহার, ফুল্লরী বিহার, পট্টিকেরক বিহার, বিক্রমপুরী বিহার, ও জগদ্দল বিহার। এই সকল বিহারের অধিকাংশই বাঙলাদেশে অবস্থিত ছিল এবং সেগুলিতে তিব্বতদেশীয় বহু বৌদ্ধ-শ্রমণ এসে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। বস্তুত এই সকল বিহারে শত সহস্র ছাত্র নানাদেশ থেকে এসে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুশীলন করতেন এবং তাঁরা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে বিক্রমশিলার মহাবিহারে ৫১ জন মহাপণ্ডিত ছিলেন।

পাঁচ

বজ্রযান নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের এই সময়েই অভ্যুত্থান ঘটে। কেননা, এই সময় আমরা বাঙলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিশেষ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করি। কালযান

ও সহজযান নামে বজ্রযানেরই দুই প্রভাবশালী শাখা ছিল। তার মধ্যে সহজযানের প্রবর্তক ছিলেন একজন বাঙালী, তাঁর নাম লুইপাদ। তিব্বতীয়রা তাঁকে সিদ্ধাচার্য বলে পূজা করে। তিনি অনেক বাংলা দোহাগান লিখে গিয়েছেন। তা ছাড়া, অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থেরও তিনি টীকাটিপ্পনী লিখে গিয়েছেন। আর একজন বাঙালী যাঁকে তিব্বতীয়রা 'মানুষী বুদ্ধ' হিসাবে পূজা করে তিনি হচ্ছেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অতীশ ১০৪২ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতে যান এবং তিব্বত থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে সদ্ধর্ম প্রচার করেন। অতীশ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৯৮২ খ্রীস্টাব্দে ও দেহ রেখেছিলেন ১০৫৪ খ্রীস্টাব্দে।

তারনাথের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি বহু পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু উহা গুপ্ত অবস্থায় ছিল, এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল। পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সিদ্ধাচার্যদের সক্রিয় প্রভাবে উহা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বজ্রযানের চারটি কেন্দ্র বা পীঠস্থান ছিল—উড্ডীয়ান, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ও পূর্ণগিরি। এ চারিটি পীঠস্থানে একটা করে বজ্রযোগিনীর মন্দির ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা প্রবলভাবে চলে। বৌদ্ধরাই তন্ত্রের গূঢ় সাধন পদ্ধতি লিখিত-ভাবে প্রথম প্রকাশ করে। তারা যে তন্ত্রগ্রন্থ প্রথম রচনা করেন তার নাম হচ্ছে 'গুহ্যসমাজতন্ত্র'। সম্ভবত খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অসঙ্গ কর্তৃক এখানা রচিত হয়েছিল। বইখানা বরোদায় গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত হয়। এই সিরিজে বজ্রযান সম্বন্ধে আরও তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল—'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ', 'নিষ্পন্নযোগাবলী', ও 'সাধনমালা'। কিন্তু সবগুলিই এখন দুষ্প্রাপ্য। এ ছাড়া আরও বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ ছিল। যদিও বলা হয় যে, বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা ৭৪, তা হলেও বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে এদের সংখ্যা বহু সহস্র।

বজ্রযানকে সহজযান বা সহজিয়া ধর্মও বলা হয়। এই ধর্মকে 'সহজ' বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এ সহজপথে মানুষকে আত্মোপলব্ধির পথে নিয়ে যায়। সহজাত মনুষ্যস্বভাবকে অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে স্বভাবের অনুকূল পথ অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি করাই সহজ পথ। সহজিয়ারা বলেন যে মন্ত্রতন্ত্র, ধ্যানধারণা হচ্ছে বৃথা; মহাসুখ স্বরূপ সহজের উপলব্ধিই পরম নির্বাণ। যাঁরা সহজপথে যান, তাঁদের আর জন্মমৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ফিরে আসতে হয় না। এই বৌদ্ধ চিন্তাধারাই আমরা চর্যাপদসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করি। সহজপথে নির্বাণ

লাভ করা যায়, গুরু উপদেশে ও সহজপথে সাধনার দ্বারা। দেহই হচ্ছে এ সাধনার অবলম্বন। 'দেহভাণ্ডই হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রহ্মাণ্ড'। মহাসুখের মধ্যে চিত্তের নিঃশেষ নিমজ্জনই হল পরম নির্বাণ।

বজ্রযানীদের কল্পনায় আদিবুদ্ধই হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ। তিনি সর্বব্যাপী। সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তিনি বিদ্যমান। সেজন্য সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই স্বভাব-সিদ্ধ শূন্যরূপ নিঃস্বভাব ও বুদ্বুদ-স্বরূপ। কেবল শূন্যই নিত্য। আদিবুদ্ধই হচ্ছেন এই শূন্যের রূপ-কল্পনা। এই শূন্যই হচ্ছে 'বজ্র'। সেজন্য দেবতা হিসাবে আদি-বুদ্ধকে বজ্রধর বলা হয়। তাঁর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। কোন কোন মূর্তিতে তাঁকে প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগনদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর একক মূর্তিও পাওয়া যায়। একক অবস্থায় তিনি শূন্য, আর যুগনদ্ধ অবস্থায় তিনি বোধিচিত্ত। একটি শূন্যতা, অপরটি করুণা। বজ্রযানীদের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে বোধিচিত্ত লাভ করা। বোধিচিত্তে কেবল মহাসুখের অনুভূতি ছাড়া আর কোন অনুভূতি থাকে না। এই মহাসুখের মধ্যে চিত্তের নিমজ্জনই হচ্ছে পরম নির্বাণ। সবই আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপার।

বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীতে অসংখ্য দেবতা আছে। নানাপ্রকার বোধিচিত্ত থেকেই এসব দেবতার উৎপত্তি। বৌদ্ধ দেবতাদের মধ্যে আছেন আদিবুদ্ধ, পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধ ও তাঁদের শক্তি, যথা অক্ষোভ্য (শক্তি মামকী), অমিতাভ (শক্তি পাণ্ডরা), অমোঘসিদ্ধি (শক্তি তারা), বৈরোচন (শক্তি লোচনা), রত্নসম্ভব (শক্তি বজ্র-ধাত্বীশ্বরী), ও বজ্রসত্ত্ব (শক্তি বজ্রসাত্ত্বিক)। তার পরের পর্যায়ের দেবতাগণ হচ্ছেন সাতটি মানুষী বুদ্ধ ও তাঁদের শক্তি, বোধিসত্ত্বগণ ও তাঁদের শক্তিদেবী-সমূহ, অমিতাভকুলের দেবদেবীসমূহ, অক্ষোভ্যকুলের দেবদেবীগণ, বৈরোচন-কুলের দেবদেবীগণ, রত্নসম্ভবকুলের দেবদেবীগণ, অমোঘকুলের দেবদেবীগণ, দশ দিগ্‌দেবতা, ছয় দিগ্‌দেবী, আটটি উষ্ণীষ দেবতা, পঞ্চ রক্ষাদেবী, চার লাস্যাদি দেবী, চার দ্বারদেবী, চার রশ্মিদেবী, চার গন্ধমুখী দেবী, চার ডাকিনী, দ্বাদশ পারমিতা, দ্বাদশ বশিতা, দ্বাদশ ভূমিদেবী, দ্বাদশ ধারিণী ইত্যাদি।

॥

বলা বাহুল্য যে, তান্ত্রিক ধর্ম বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাঙলাদেশের জনপ্রিয় ধর্ম ছিল, এবং মনে হয় জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পথ সুগম করবার

জন্যই বৌদ্ধরা বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন।

দেখা যায় যে, দুই মূলগত বিষয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রথম, বজ্রযান-বৌদ্ধধর্মে গুরুর সহায়তা ছাড়া তান্ত্রিক আরাধনা হত না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। দ্বিতীয়ত, বজ্রযান-বৌদ্ধধর্মে প্রজ্ঞার সার হচ্ছে বোধিচিত্ত-অবস্থায় আরোহণ করতে হলে স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলন অবশ্য অবলম্বনীয়। ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রধর্মেও শক্তিপূজার নিমিত্ত এইরূপ যৌনমিলন অবশ্য অবলম্বনীয় বা করণীয়।

বৌদ্ধধর্ম যখন এভাবে প্রসারলাভ করছিল, তখন বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের কি ঘটছিল সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, রীতিমতভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ বাঙলাদেশে গুপ্তযুগেই ঘটে-ছিল। এই সময় বেদ-অনুশীলনরত শত শত ব্রাহ্মণ বাঙলাদেশে আসেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভূমিদান লাভ করেন। যদিও সূচনায় তাঁরা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে রত ছিলেন, কালক্রমে তাঁরা এখানকার জনপ্রিয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণাদির দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ এই যুগেই রচিত হয়েছিল এবং বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণভাবে নূতন রূপ ধারণ করেছিল। নূতন নূতন দেবতা, যাঁদের অস্তিত্ব বৈদিক আর্যগণের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তাঁদের প্রবর্তন এই যুগেই হয়েছিল। যে নূতন দেবতা-মণ্ডলী সৃষ্ট হয়েছিল তাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রমুখ দেব-দেবীগণ প্রাধান্যলাভ করেন। তাঁরা শুধু হিন্দুগণ কর্তৃক নয়, বৌদ্ধগণ কর্তৃকও উপাসিত হতে থাকেন। 'এই বৈপ্লবিক সংশ্লেষণ গুপ্তযুগেই সংঘটিত হয়েছিল এবং সেই জন্যই আমরা গুপ্তযুগকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগ বলে অভিহিত করি। পাল-রাজগণ বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আর সেনরাজ-গণের তো কথাই নেই, তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসারের কাজে নিজেদের বিশেষভাবে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বস্তুত তাঁদের সময়েই বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ফুলে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়েই সমধারায় প্রবাহিত হয়ে উভয়ে উভয়কে প্রভাবান্বিত করেছিল। বস্তুত মুসলমান যুগের অনতিপূর্বে উভয় ধর্মই বাঙলার নিজস্ব তন্ত্রধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

৯।৩

তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। হিন্দুরা বলেন যে তন্ত্র-ধর্মের বীজ বৈদিক ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। আর বৌদ্ধরা দাবি করেন যে, তন্ত্রের মূল ধারণাগুলি, ভগবান বুদ্ধ যে সকল মুদ্রা, মন্ত্র, মণ্ডল, ধারণী, যোগ প্রভৃতির প্রবর্তন করেছিলেন তা থেকেই উদ্ভূত। মনে হয় তন্ত্রধর্মের আসল উৎপত্তি সম্বন্ধে 'সূত্রকৃতঙ্গ' নামে এক প্রাচীন জৈনগ্রন্থ বিশেষ আলোকপাত করে। এটা সকলেরই জানা আছে যে, তন্ত্রের আচার, অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি অত্যন্ত গূঢ় এবং উক্ত প্রাচীন জৈনগ্রন্থ অনুযায়ী গূঢ় সাধন-পদ্ধতি শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ ও গৌড়-দেশবাসীদের এবং গন্ধর্বদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মনে হয় এই জৈনগ্রন্থের কথাই ঠিক, কেননা তান্ত্রিকসাধন-সদৃশ ধর্মপদ্ধতি পূর্বভারতে প্রাক্-বৈদিক জনগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং তা-ই 'ব্রাত্যধর্ম' বা তৎসদৃশ কোন ধর্ম হবে। পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা যখন তা গ্রহণ করেছিল, তখন তারা দার্শনিক আবরণে তাকে মণ্ডিত করেছিল। প্রায় ষাট বছর পূর্বে এ সম্বন্ধে বক্রেশ্বরের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু অঘোরীবাবা যা বলেছিলেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'বেদের উৎপত্তির বহু শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্র মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক। অনার্য বলে আর্যরা যাদের ঘৃণা করতেন, সেই দ্রাবিড়দের ভাষাতেই তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল। পুঁথি পুস্তক ত ছিল না, বেদের মতই লোকপরম্পরায় মুখে মুখে তার প্রচার ছিল। সাধকদের স্মৃতির ভিতরই তা বদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির নাম-গন্ধও ছিল না। কারণ তন্ত্রের ব্যবহার যে-সব মানুষকে নিয়ে তার মধ্যে জাত কোথায়? সাধারণ মানুষের ধর্ম-কর্ম নিয়েই ত তন্ত্রের সাধন। তন্ত্রের জগতে বা অধিকারে ঘৃণার বস্তু বলে কিছুই নেই। শবসাধনা, পঞ্চমুণ্ডি-আসন, মদ্য-মৎস্য-মাংসের ব্যবহার—তন্ত্রের এসব তো আর্য-ব্রাহ্মণদের ধারণায় ভ্রষ্টাচার। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণরা যতদিন বাঙলায় আসেননি, ততদিন তাঁদের এ ভাবের যে একটি ধর্মসাধন আছে আর সেই ধর্মের সাধনপ্রকরণ তাঁদেরই একদল গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আর একটি ধর্ম গড়ে তুলবেন, একথা কল্পনায়ও আনতে পারেননি। তারপর তন্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে তাঁরা অনার্যই হয়ে পড়লেন—তাঁদের বৈদিক ধর্মের জোর আর কি রইল?'

বস্তুতঃ তন্ত্রধর্মের উদ্ভব হয়েছিল নবোপলীয় যুগে ভূমিকর্ষণের ব্যাপার নিয়ে।

প্রস্তোপলীয় যুগের মানুষ ছিল যাযাবর প্রাণী। পশুমাংসই ছিল তার প্রধান খাদ্য। পশুশিকারের জন্য তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হত। পশুশিকার থেকে পুরুষের যখন ফিরতে দেরী হত, তখন মেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল এবং যদৃচ্ছভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য খেয়ে প্রাণধারণ করত। তারপর তাদের ভাবনাচিন্তায় স্থান পায়-এক কল্পনা। সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেই হেতু তারা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে পুরুষ যদি নারীরূপ ভূমি (আমাদের সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রেই মেয়েদের 'ক্ষেত্র' বা ভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে, তবে মাতৃরূপ পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন ? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে থাকে। (পশিলুস্কি তাঁর 'আর্য ভাষায় অনার্য শব্দ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ', 'লাঙ্গুল' ও 'লাঙ্গল' এই তিনটা শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন)। মেয়েরা এইভাবে ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল। যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল, তখন পুরুষরা তাই দেখে অবাক হল। ফসল তোলার পর যে প্রথম 'নবান্ন' উৎসব হল সেই উৎসবে জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। এই আদিম উৎসব থেকেই উদ্ভব হয়েছিল শিব ও শক্তির পূজা। এবং এরূপ আরাধনা নিয়েই উদ্ভূত হয়েছিল তন্ত্রধর্ম। (লেখকের 'হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য', সাহিত্যলোক, দ্রষ্টব্য।)

আট

জনপ্রিয় ধর্ম হিসাবে আর একটি ধর্মেরও খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষাংশে ও দ্বিতীয় সহস্রকের সূচনায় অভ্যুত্থান হয়। তার নাম ছিল 'নাথধর্ম'। এটি শৈবধর্মেরই শাখাবিশেষ ; তবে মনে হয়, এর ওপর বৌদ্ধ ও তন্ত্র-ধর্মেরও প্রভাব ছিল। কথিত আছে শিব যখন দুর্গাকে গুহ্যতত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন নাথধর্মাবলম্বীদের আদিপুরুষ মীননাথ গোপনে তা শুনেছিলেন। শিবই নাথদের আরাধ্য দেবতা এবং 'কায়া' সাধনাই নাথদের চরম লক্ষ্য। নাথধর্মাবলম্বীদের গুরুগণ উপাধি হিসাবে 'নাথ' শব্দটি ব্যবহার করেন। সেই জন্যই একে নাথধর্ম বলা হয়। নাথধর্ম প্রধানত বাঙলার নিম্নকোটির লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

তবে এই ধর্মকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা থেকে আমরা মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, গোরক্ষনাথের শিষ্যা রানী ময়নামতী, রানী ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র ও তাঁদের নানারূপ অলৌকিক শক্তির কথা জানতে পারি। ধর্মটি এক সময় সুদূর পেশওয়ার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাঙলাদেশের নাথধর্মীরা অধিকাংশই জাতিতে যুগী ও তাঁদের জীবিকা কাপড় বোনা। তবে কেউ কেউ কবিরাজী চিকিৎসাও করেন। (নাথধর্মের সাহিত্য সম্বন্ধে পরের এক অধ্যায় দেখুন)। পালযুগে ধর্মঠাকুরের পূজারও যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল। এ সম্বন্ধেও পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ

বর্ধমান জেলার উত্তরে ত্রিভুজাকার যে ভূখণ্ড আজ বীরভূম নামে পরিচিত, তাকে আমরা বাঙলার ধর্মীয় সাধনার 'যাদুঘর' বলে অভিহিত করতে পারি। বহু ধর্মেরই এখানে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং বীরভূমের বিচিত্র ভূপ্রকৃতি তার সহায়ক হয়েছে। পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূল থেকে যে তরঙ্গায়িত মালভূমি পূর্বদিকে ভাগীরথীপ্রান্ত পলিমাটির দেশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, তা বীরভূমকে বিভক্ত করে দিয়েছে দুই ভাগে—পশ্চিমে বনজঙ্গল পরিবৃত রুক্ষ ও কর্কশ অঞ্চল ও পূর্বে কোমল শ্যামল শস্যশ্যামলভূমি। বীরভূমের বনজঙ্গলের মধ্যেই ছিল এক মুনি-ঋষির তপোবন। যেমন ভাণ্ডীরবনে ছিল বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম, শিয়ানে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির, শীতলগ্রামে সন্দীপন ঋষির, গর্গমুনির ও দুর্বাসা মুনির। বন-জঙ্গলের শাশ্বত নির্জনতা বীরভূমকে গড়ে তুলেছিল শাক্তধর্মীয় সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে। এজন্যই শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীরভূমের প্রসিদ্ধি। বস্তুত শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীরভূমের (এড়ু মিশ্রের উক্তি অনুযায়ী এর নাম ছিল কামকোটি) তুলনা আর কোথাও নেই। তন্ত্রবর্ণিত মহাপীঠসমূহের মধ্যে বীরভূমে যত মহাপীঠ আছে, তত মহাপীঠ বাঙলায় তো দূরের কথা, ভারতের আর কোথাও নেই। বীরভূমের প্রায় প্রত্যেক শহরের কাছেই সতীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি করে শাক্তপীঠ আছে। যথা বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, লাভপুর, সুলবেড়িয়া, নলহাটি, বৈদ্যনাথধাম (১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল), তারাপীঠ ইত্যাদি। এদের মধ্যে তারাপীঠের সিদ্ধপীঠই প্রসিদ্ধ।

আবার বীরভূমের কোমল অঞ্চলসমূহে গড়ে উঠেছিল মধুর বৈষ্ণবধর্মের পুণ্য-স্থানসমূহ; যথা জয়দেবের কেঁদুলি, চণ্ডীদাসের নান্নুর একচক্রাপুরের নিত্যানন্দ প্রভুর সাধনক্ষেত্র ইত্যাদি।

বীরভূমের গ্রামাঞ্চলসমূহে গ্রামদেবতা ধর্মরাজের পূজারও বহুল প্রচলন আছে। এ ছাড়া, মনসাদেবীর পূজার উদ্ভব বীরভূমেই হয়েছিল বলে মনে হয়। বাউল সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবও বীরভূমে খুব বেশি।

জৈনধর্মের উত্থানও বীরভূমের আশেপাশেই ঘটেছিল, কেননা, মহাবীরের পূর্বগামী কুড়ি জন তীর্থঙ্করকে সমেতশিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে সমাধিস্থ করা

হয়েছিল। পরেশনাথ পাহাড় বীরভূমের সীমান্তরেখা থেকে মাত্র ৭০ মাইলের মধ্যে। সুতরাং এ সকল তীর্থঙ্কর যে বীরভূমের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো, মহাবীরের মতো তাঁরাও বীরভূমে এসেছিলেন। মহাবীর যখন বীরভূমে এসেছিলেন, তখন এর নাম ছিল বজ্জভূমি। বোধ হয়, মাটির কঠিনতার জন্যই একে বজ্জভূমি (বা বজ্রভূমি) বলা হত।

বীরভূমের নানা জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধ বজ্রযান (বা কালযান) দেবদেবীর মূর্তি। এ থেকে বীরভূমে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবও বোঝা যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে ঘটেছিল পালরাজগণের আমলে। সেটা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ব্যাপার। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বীরভূমের সম্পর্ক, একেবারে বুদ্ধের জীবনকাল থেকে। কেননা, বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যাবদান' থেকে আমরা জানতে পারি যে, গৌতম বুদ্ধ বীরভূম অতিক্রম করেই পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বীরভূম যে মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, তারনাথ তাঁর 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে কিংবদন্তী অনুযায়ী সম্রাট অশোকের পিতা বিন্দুসারের জন্ম হয়েছিল গৌড়দেশে। এছাড়া, মহাস্থানের এক লিপি থেকেও আমরা জানতে পারি যে, পুণ্ড্রবর্ধন তখন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াং বীরভূম অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখে গিয়েছেন যে, সে সময় বীরভূমে বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। বস্তুত বাঙলাদেশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হওয়ার সময় পর্যন্ত, বীরভূমে এই সকল বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব ছিল। বাঙলা বিজয়ের সময় মুসলমানগণ রাজমহলের পথ দিয়ে বীরভূমের ওপরই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা বৌদ্ধদের মঠ, বিহার ও মূর্তিসমূহ ধ্বংস করায়, বৌদ্ধরা তিব্বত, নেপাল ও চট্টগ্রামে পালিয়ে যায়। তখন থেকেই বীরভূমের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ছেদ ঘটে।

দুই

আমরা আগেই বলেছি যে, বীরভূম হচ্ছে তন্ত্রধর্মের লীলাক্ষেত্র। তান্ত্রিক সাধনসদৃশ ধর্মপদ্ধতি পূর্বভারতের প্রাক্-বৈদিক জনগণের মধ্যেই ছিল, এবং উহাই 'ব্রাত্যধর্ম' বা তৎসদৃশ কোন ধর্ম হবে। পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা যখন উহা গ্রহণ করেছিল, তখন তারা দার্শনিক আবরণে তাকে মণ্ডিত করেছিল। বজ্রযান

বৌদ্ধধর্মের ওপর অনার্য-সম্প্রদায় যে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, তা আমরা পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী, চোরী, বেতালী, ঘস্মরী, পুক্কশী, শবরী, চণ্ডালী, ডোম্বী ইত্যাদি বজ্রযানমণ্ডলের দেবীগণের নাম থেকেই বুঝতে পারি।

তিন

দেবীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ বক্রেশ্বর। শাক্ত পীঠস্থানসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে, 'পীঠনির্ণয়'-তন্ত্রে যে বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনা অনুযায়ী এখানে দেবীর ভ্রূমধ্য পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'শিবচরিত' অনুযায়ী এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণবাহু। অষ্টাবক্র মুনি এখানেই তাঁর সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় প্রীত হয়ে শিব তাঁকে বর দিয়েছিলেন—'আজ থেকে আমার ভক্তগণ এখানে আমার পূজা করবে এবং তোমার নাম অনুযায়ী এর নাম হবে বক্রেশ্বর।'

বক্রেশ্বরের সঙ্গে অষ্টাবক্র মুনির সম্পর্ক সম্বন্ধে দুটি প্রবাদ-কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনী অনুযায়ী সত্যযুগে বিষ্ণু নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হন, এবং তাঁর হস্তপদযুগে ভীষণ জ্বালা উপস্থিত হয়। অষ্টাবক্র মুনি বিষ্ণুর এই জ্বালা নিজ মস্তকে ধারণ করলে, তিনি জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মুনিকে বক্রেশ্বর শিবের মস্তক স্পর্শ করতে বলেন, এবং ভারতের সকল তীর্থের তীর্থবারিকে সুড়ঙ্গপথে প্রবাহিত হয়ে তাঁর মস্তকে পতিত হতে নির্দেশ দেন। এই স্রোতোধারাই 'পাপহরা' নামে প্রসিদ্ধ।

অপর কাহিনী অনুযায়ী একদা লক্ষ্মীর স্বয়ংবর সভায় সুব্রত ও লোমশ নামে দুই ঋষি নিমন্ত্রিত হন। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলে, নিমন্ত্রণ-কর্তা ও দেবরাজ পুরন্দর সর্বাগ্রে লোমশ ঋষিকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ ও আপ্যায়ন করেন। এই দেখে তাঁর সহচর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করেন। তিনি এমন ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর দেহের আট জায়গা বক্রতা লাভ করে। এর ফলে সকলে তাঁকে অষ্টাবক্র নামে অভিহিত করতে থাকে। মনের ক্ষোভে ও অশান্ত হৃদয়ে অষ্টাবক্র নানা জায়গায় পরিভ্রমণ করে অবশেষে কাশী বা বারাণসীতে এসে পৌছান। শিবকে তুষ্ট করে তিনি তাঁর দেহের বক্রতা দূর করবার সিদ্ধান্ত নেন। শিব তাঁকে বলেন যে তাঁর প্রার্থনার কোন ফল পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তিনি পূর্বদিকে গিয়ে গৌড়দেশে গুপ্তকাশীতে শিবের কাছে তাঁর প্রার্থনা

[illegible]ছিলেন। তখন তিনি বক্রেশ্বরে এসে শিবের উপাসনা করেন। ভক্তের অনন্ত-সাধারণ সাধনায় তুষ্ট হয়ে, শিব অষ্টাবক্রের বক্রতা দূর করেন, এবং বলেন এখন থেকে যারা এখানে আমার পূজা করবে, তাদেরকে প্রথমেই অষ্টাবক্রের অর্চনা করতে হবে।

সিদ্ধপীঠ হিসাবে বক্রেশ্বর-এর প্রসিদ্ধি। কঠিন কঠিন তান্ত্রিক সাধনার জন্ত একসময় উত্তর ভারতের নানা স্থান থেকে সাধকেরা এখানে আসতেন। বহু সাধকের যে এখানে সমাবেশ হত, তার নিদর্শন রয়েছে এক বিশালকায় শমী-বৃক্ষের তলে এক উচ্চ প্রকাণ্ড গোলাকার বেদী। এই বেদীতে বহু সাধক যে একসঙ্গে বসে সাধনা করতে পারতেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তান্ত্রিক সাধনভজনের জন্ত যে বহু সাধক-সাধিকা একসময়ে এখানে বাস করতেন, তারও নিদর্শন রয়েছে মন্দিরের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ইষ্টকনির্মিত আবাসগৃহ-সমূহের ধ্বংসাবশেষে। তা থেকে মনে হয় যে, বক্রেশ্বর একসময়ে বীরভূমের বহু জনবহুল ও জনপ্রিয় মহাতীর্থ ছিল।

॥৩॥

যদিও উভয় পীঠস্থানই দেবীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হলেও বক্রেশ্বরের ভৈরব যেমন প্রসিদ্ধ, তারাপীঠের ভৈরবী তারাদেবী তেমনই প্রসিদ্ধা। তা ছাড়া বামাক্ষ্যাপার সাধনক্ষেত্র হিসাবেও তারাপীঠ সিদ্ধপীঠ হিসাবে পরিচিত।

প্রথম যখন তারাপীঠে যাই তখন যে জিনিসটা আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল, সেটা হচ্ছে যে তারাদেবীর মন্দিরে যেতে হলে, রাস্তা থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে তবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে উঠতে হয়। তারপর মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে আবার সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের চাতালে (plinth) উঠতে হয়। এই দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে তারাদেবীর মন্দির একসময় কোন এক ছোট পাহাড়ের ওপর স্থাপিত ছিল। স্থানীয় লোকের কাছে এ জিনিসটা অজ্ঞাত। কেননা, অনেককেই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু এ-বিষয়ে কেউই আমাকে কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে পুরাতত্ত্ব রেকর্ড-সমূহ অন্বেষণ করে জানতে পারি যে আমার অনুমানই ঠিক। পুরানো রেকর্ডে পরিষ্কার লেখা আছে যে তারাদেবীর মন্দির একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের (hillock) ওপর অবস্থিত। তবে সত্যই কোন ক্ষুদ্র পাহাড় কি, কোন প্রাচীন বৌদ্ধ-

স্তূপের ধ্বংসাবশেষ তা বলা কঠিন। কারণ, প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ বক্রেশ্বরেও বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। মনে হয়, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে তারাপীঠ তারা-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। আগেকার দিনে মহাশ্মশান-গুলিই তান্ত্রিক সাধনার প্রকৃষ্ট কেন্দ্র ছিল, এবং তারাপীঠ মহাশ্মশানের মধ্যেই অবস্থিত।

তারাপীঠ স্থানটি বহুদিন অপ্রচারিত ছিল। কথিত আছে যে, জয়দত্ত নামে গন্ধবণিক সমাজভুক্ত এক সদাগর দ্বারকানদী দিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে তাঁর একটি পুত্র ছিল। পুত্রটি পথিমধ্যে মারা যায়। পরে জীবৎকুণ্ডের জল স্পর্শ করালে, ছেলেটি আবার জীবিত হয়। এর কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে, তিনি তারা-মায়ের মূর্তি দেখেন। তখন তাঁরা বিশেষ উপাচারে তারা-মায়ের পূজা করেন। পরে সদাগর পীঠস্থানের সংস্কার করেন। সেই থেকেই তারাপীঠের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। তবে তারাপীঠের বর্তমান মন্দির নাটোরের মহারানী কর্তৃক নির্মিত হয়। পরে ব্রজবাসী কৈলাসপতি, বামাক্ষ্যাপা ও নাটোরের মহারাজার সাধনক্ষেত্র হিসাবে তারাপীঠের মাহাত্ম্য আরও প্রচারিত হয়।

অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে, তারাপীঠে গিয়ে তাঁরা তারা-মায়ের যে মূর্তি দেখেন সেটা মায়ের আসল মূর্তি নয়। আসল মূর্তিটি পাথরের তৈরি। তার গঠনশৈলী দেখে মনে হয় যে, মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল। এই পাথরের মূর্তিটি ঢাকা দেওয়া আছে, বর্তমান এক খোলস মূর্তির আবরণ দ্বারা। পাথরের মূর্তির রূপও অন্যরূপ। এই পাথরের মূর্তিটি দেখবার সুযোগ সকলের ঘটে না। বাহ্যিক মূর্তিটি উন্মোচন করা হয়, মাত্র দেবীকে স্নান করাবার সময়। সেই সময় পাথরের মূর্তিটিকে স্নান করানো হয়। মাত্র দু-একজন বিশিষ্ট যাত্রীকে মায়ের আসল মূর্তিটি দর্শন করবার সুযোগ পাওয়া যায়। পাথরের মূর্তিটি মুণ্ডহীন। মুসলমান আমলে হিন্দুদ্বেষী মুসলমানরা মুণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। দেবী একটি শায়িত মূর্তির ওপর উপবিষ্টা।

তারার প্রথম প্রকাশ পায়, দক্ষযজ্ঞের পূর্বে যখন দেবী দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ করেন। তারপর বিষ্ণুচক্র দ্বারা ছিন্ন হবার পর দেবীর আটটি দেহাংশ পড়ে বীরভূমে। দেবীর নয়নতারা পড়েছিল চীনদেশে। বশিষ্ঠমুনি ওই নয়নতারা চীনদেশ থেকে এনে তারাপীঠে স্থাপন করেন, এবং সেখানে তাঁর ধ্যান-জপ করে সিদ্ধিলাভ করেন।

তারার উপাসনা মহাচীন থেকে আনা হয়েছিল বলে বৌদ্ধ বজ্রযান দেবীকুলে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল মহাচীনতারা। উগ্রতারা নামেও তাঁকে অভিহিত করা হত।

মনে হয়, বজ্রযান (অপর নাম কালযান বা সহজযান) বীরভূমেই উদ্ভূত হয়েছিল। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রধর্মের বিকাশ বীরভূমে সমানভাবেই হয়েছিল। সুতরাং তারার ধ্যান-কল্পনায় যে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাঁচ

বীরভূমের ন্যায় এত বেশি শাক্তপীঠ আর কোথাও নেই। বক্রেশ্বর ও তারাপীঠে দেবীর দুই দেহাংশ পড়েছিল। বক্রেশ্বরের অদূরে ফুলবেড়িয়ায় পড়েছিল দেবীর দাঁত। সেজন্য ফুলবেড়িয়ায় আছে দেবী দন্তেশ্বরী। ওখানে তাঁর ভৈরব হচ্ছে মহাদেব ফুলেশ্বর। পূর্বদিকে চলে আসুন বোলপুরে। বোলপুরের চার মাইল উত্তর-পূর্বে হচ্ছে কঙ্কালীতলা। ওখানে পড়েছিল দেবীর কঙ্কাল, এখানে আছে দেবী কঙ্কালীর মূর্তি। এখানে তাঁর ভৈরব হচ্ছেন রুরু। কঙ্কালীতলার উত্তরে চলে আসুন লাভপুরে। তার পূর্বপ্রান্তে আছে ফুল্লরা মহাপীঠ। তন্ত্রে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে অট্টহাস। এখানে আছেন দেবী ফুল্লরা ও তার ভৈরব বিশ্বনাথ। কিন্তু 'প্রাণতোষিণীতন্ত্র' মতে দেবী চামুণ্ডা ও তাঁর ভৈরব মহানন্দ। এখানে অন্যান্য উপকরণের মধ্যে, সুরা না দিলে দেবীর ভোগ হয় না।

বোলপুর থেকে পূর্বে চলে যান চণ্ডীদাস নানুরে। এটাও একটা শাক্তপীঠ। সেখানে আছেন দেবী বিশালাক্ষী। শায়িত মহাদেবের নাভিদেশ থেকে উদ্গত কমলে দেবী ললিতাসনে আসীনা।

এবার উত্তরে আসুন তারাপীঠের কাছে রামপুরহাটে। রামপুরহাট থেকে উত্তরে চলে যান নলহাটীতে। নলহাটীতে পড়েছিল দেবীর কণ্ঠের নলী। এখানে আছেন দেবী ললাটেশ্বরী ও তাঁর ভৈরব মহাদেব।

বস্তুত আমরা বীরভূমের নানা জায়গায় দেখতে পাই দেবীর বিভিন্ন মূর্তি। বক্রেশ্বরে আছেন দেবী মহিষমর্দিনী, ফুলবেড়িয়ায় দন্তেশ্বরী, কঙ্কালীতলায় কঙ্কালী-দেবী, লাভপুরে ফুল্লরা, নানুরে বিশালাক্ষী, তারাপীঠে তারাদেবী ও নলহাটীতে ললাটেশ্বরী। বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও আমরা দেখতে পাই দেবীর অনেক

পীঠস্থান, কিন্তু বীরভূমের মতো দেবীর দেহাংশের দ্বারা পূত এতগুলো পীঠস্থান আর কোথাও পাই না। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে ভারতে তান্ত্রিক ধর্মবিকাশের ইতিহাসে বীরভূমের একসময় খুব অর্থবহ ভূমিকা ছিল। তান্ত্রিক সাধনার জন্য একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে নির্জনতা। বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আছে সেই নির্জনতা। বীরভূমের এই নির্জনতাই আকৃষ্ট করেছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রহ্মোপাসনার জন্য তাঁর আশ্রম স্থাপন করতে বোলপুরে।

বীরভূমে যে মাত্র দেবীর পীঠস্থানেরই ছড়াছড়ি তা নয়। বীরভূম হচ্ছে শিবের দেশ। বীরভূমের মাঠে ঘাটে, শহরের সন্নিকটে ও শ্মশানে আছে অসংখ্য শিবমন্দির বা শিবস্থান। দক্ষিণ-পশ্চিমে বক্রেশ্বর ও ভূলেশ্বর ছাড়া, আরও অনেক জায়গাতেই শিবঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায়। দুবরাজপুরে, অর্থাৎ যেখান দিয়ে বক্রেশ্বর ও ভূলেশ্বরে যেতে হয়, তারই অনতিদূরে পাহাড়ের পাদমূলে দেখতে পাওয়া যায় এক শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এখানে মহাদেবকে বলা হয় পাহাড়েশ্বর বা পাহাড়ের অধিপতি। এখানে একখণ্ড শিলাই পূজিত হন দেবতার প্রতীকরূপে। কথিত আছে যে, শিলাখণ্ড একসময় পাহাড়ের শীর্ষদেশে ছিল, এবং ভক্তদের পূজা করতে হত পাহাড়ের পাদতল থেকে পাহাড়ের শীর্ষদেশস্থ দেবতার দিকে ঊর্ধ্বনয়নে তাকিয়ে। একদিন এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের দিনে শীর্ষদেশস্থ ওই প্রস্তরখণ্ড পড়ল মূল পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে। তাতে একজন ভক্ত পুরোহিতের প্রাণনাশ ঘটল। এই ঘটনাকে নির্দেশ করে লোকে বলল, মহাদেবের ইচ্ছা পাহাড়ের কোলেই তাঁর এক মন্দির নির্মিত হোক, যাতে ভক্তদের তাঁকে আরাধনা করার জন্য ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আর ঘাড়ব্যথা করতে না হয়। কথাটা গিয়ে পৌঁছাল দুবরাজপুরের রাজা শঙ্করাজের কানে। তিনিই ওই ভূপতিত শিলাখণ্ডের ওপর নির্মাণ করে দিলেন এক মন্দির। সেই থেকে শিব নীচের মন্দিরে পূজিত হতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে আর এক কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, শিলাখণ্ড যখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে ছিল, তখন এক ভক্তকে প্রতিদিনই পাহাড়ের উপরে উঠে পূজা করতে যেতে হত। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর পক্ষে পাহাড়ের ওপরে ওঠা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, তখন শিবই একদিন ভূপাতিত হয়ে নিজেই নেমে এলেন নীচে ভক্তের পূজা গ্রহণ করবার জন্য। সেই রাত্রিতেই তিনি স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন ভক্তের

সামনে। তিনি বললেন—'তুই বুড়ো হয়ে পড়েছিস, ওপরে উঠতে তোর কষ্ট হচ্ছে, সেজন্য আমি নীচে অবতরণ করেছি, তুই শিগ্‌গির আমার এক মন্দির তৈরি করে দে।'

এই যে প্রস্তরখণ্ডসমূহ যাকে আমরা পাহাড় বলছি, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হচ্ছে এই যে, সেতুবন্ধের জন্য রামচন্দ্র যখন হিমালয় থেকে প্রস্তরখণ্ড আনছিলেন, তখন মাড়া পেয়ে কিছু পাথর দুব-রাজপুরে পড়েছিল, সেই পাথরগুলো থেকেই এই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

দুবরাজপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হচ্ছে ভীমগড়। ভীমগড় অজয় নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। বহু প্রাচীনকাল থেকে লোক দেখে এসেছে এখানে এক পুরাতন দুর্গের নিদর্শন। কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের অজ্ঞাতবাসের সময় কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন এখানে। তাঁরাই স্থাপন করেছিলেন ভীমেশ্বর শিব। অজয়ের দক্ষিণ তীরেও তাঁরা কয়েকটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারেই জায়গাটার নাম হয়েছে পাণ্ডবেশ্বর।

ভীমগড় থেকে পূর্বদিকে চলে আসুন কেন্দুলি গ্রামে। এখানে আছে কুশলেশ্বরের শিবমন্দির। কথিত আছে যে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করবার আগে জয়দেব ছিলেন শাক্ত এবং এই কুশলেশ্বরের মন্দিরেই তিনি নিত্য পূজা করতেন শিবের। উত্তরে চলে যান ময়ূরেশ্বরী নদীর তীরে। সিউড়ি শহর থেকে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়ূরেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে পাবেন ভাণ্ডীরবন। ভাণ্ডীরবনে আছে ভাণ্ডেশ্বর মহাদেবের এক মস্ত বড় মন্দির।

আবার চলে আসুন বোলপুরে। বোলপুরের সন্নিকটেই অবস্থিত সুপুর। সুপুর ছিল সুরথ রাজার রাজধানী। সুপুরে আছে মহাদেব সুরথেশ্বরের মন্দির। কথিত আছে যে, সুরথেশ্বরের মন্দিরেই রাজা সুরথ প্রত্যহ অর্চনা করতেন লিঙ্গরূপী মহাদেবের। আর তাঁর ছিল এক প্রসিদ্ধ কালীমন্দির। ওই কালীর কাছেই রাজা সুরথ এক লক্ষ বলি দিয়েছিলেন। যে জায়গাটায় বলি দেওয়া হয়েছিল, সে জায়গাটার নাম হচ্ছে বলিপুর। সেটাই পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে বোলপুরে।

এ ছাড়া, আদিত্যপুরে আছে কাশীশ্বর শিব, কোটাসুরে মদনেশ্বর শিব, খয়রাবোনায় শৈলেশ্বর শিব, জুবুটিয়ায় জপেশ্বর শিব, ডাবুকে ডাবুকেশ্বর শিব, নারায়ণপুরে মল্লেশ্বর শিব, পাইকোড়ে বুড়োশিব, ময়ূরেশ্বরে ময়ূরেশ্বর শিব, মহুলায়

মহলেশ্বর শিব, মুলুকে বাণেশ্বর শিব, বনার আদিনাথ শিব, সাঁইথিয়ায় নন্দি-কেশ্বর শিব ও হালিসোটে খগেশ্বর শিব। আরও বহুস্থানে শিবমন্দির আছে, যেমন আকোবায়, গোহালীপাড়ায়, চারকলগ্রামে, কলসীতে, তেকহাটিতে, দাসকলগ্রামে, বালিগুনিতে, সেবাতীতে ও সুরুলে। আবার অনেক জায়গায় বহুসংখ্যক শিবমন্দির একসঙ্গে আছে, যেমন গণপুরে আছে ৩৭টা, চণ্ডীদাস-নানুরে ১৪টা, দুবরাজপুরে পাঁচটা, পারগুতীতে সাতটা ও মেহগ্রামে তিনটা।

দেবীর দেহাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-সব শাক্তপীঠের কথা আগে বলেছি, তা ছাড়াও বীরভূমে আরও শাক্তপীঠ আছে। বক্রেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নগর বা রাজনগর। নগর ছিল হিন্দু আমলে বীররাজাদের রাজধানী। বীর-রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন কালী। দেবীর অবস্থান এখানে ছিল কোন মন্দিরে নয়, কালীদহ নামে এক হ্রদে। জনশ্রুতি যে, দেবী মাঝে মাঝে নিজেকে প্রকাশ করতেন জলের ওপর তাঁর হস্তদ্বয় ও মস্তক প্রদর্শন করে। খুব জাগ্রতা বলে দেবীর প্রসিদ্ধি ছিল। নগরের হিন্দুরাজারা যখন পরাভূত হন এবং নগর যখন মুসলমানদের করাধীনে যায়, তখন একদিন এক ইসলাম ধর্মা-বলম্বী লোক গোমাংসের রক্তে রঞ্জিত এক ছুরিকা কালীদহের জলে ধৌত করবার জন্ম নিয়ে আসে। এতে কালীদহের জল কলুষিত হয়। হ্রদের উত্তর দিকটা ধসে পড়ে ও জলও স্রোতস্বিনী হয়ে কুসকর্ণী নদীতে গিয়ে পড়ে। স্রোতের সঙ্গে ভেসে মা-ও চললেন। মা-কে পাওয়া গেল বীরসিংহপুরে। বীর-সিংহপুর হচ্ছে সিউড়ির ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে, তাঁতীরবন থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে। মাকে লোকে বীরসিংহপুরে স্থাপন করে এক মন্দির নির্মাণ করে দেয়। এইভাবে উদ্ভব হয় বীরসিংহপুরের কালীমন্দিরে মায়ের প্রস্তরমূর্তি।

বীরভূমের মানচিত্রের অনেকবার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান আকারের চেয়ে একসময় বীরভূমের আকার বিশালকায় ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাঁওতাল পরগনা বীরভূমেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুর্শিদাবাদের কিছু অংশও বীরভূমের মধ্যে ছিল। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে বলা হয়েছে যে এই অংশের দুই প্রধান তীর্থ ছিল বৈদ্যনাথধাম ও বক্রেশ্বর। বৈদ্যনাথধামও (দেওঘর) এক শাক্তপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর হৃদয়। দেবী এখানে জয়দুর্গা ও ভৈরব বৈদ্যনাথ।

ছয়

মনে হয় শিবকে ব্যাপকভাবে স্বীকার করে নেবার আগে, আর্যসমাজে ভাগবত-ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ভাগবত-ধর্মের উপাস্য দেবতা হচ্ছেন বিষ্ণু। যাঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁদের বৈষ্ণব বলা হয়। 'বৈষ্ণব' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে মহাভারতের একেবারে শেষের দিকে (১৮৷৬৷৯৭—১০৩)। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের (৭৷১০০৷২) এক মন্ত্রে বলা হয়েছে—'হে প্রাপ্তকাম বিষ্ণু, তুমি তোমার সর্বজন হিতকারী দোষ-বিরহিত অনুগ্রহ-বুদ্ধি আমাদিগকে দাও।' বৈষ্ণবধর্ম ভগবৎ-প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২৷৭) বলা হয়েছে—'ভগবান প্রেমস্বরূপ, তাঁকে পেলে আনন্দ লাভ ঘটে।' মুণ্ডক উপনিষদে (৩৷২৷৩) আছে —'যে যাকে বরণ করে, সেই তাকে লাভ করে।' 'ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত তাঁকে পাওয়া যায় না।' এইসব মূলতত্ত্বের ওপরই বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধের অনেক আগেই ভাগবত-ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কেননা পাণিনি বাসুদেবভক্তদের সম্বন্ধে এক জায়গায় (৪৷৩৷৯৮) ইঙ্গিত করেছেন। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিও বাসুদেবের পূজকগোষ্ঠীর কথা বলেছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিস শৌরসেন জাতির (যাঁদের দেশের মধ্যে মথুরা নগরী অবস্থিত ছিল) মধ্যে হেরাক্লিশ দেবতার আরাধনার কথা বলেছেন। 'হেরাক্লিস' শব্দ মনে হয় 'হরেকৃষ্ণ' শব্দের গ্রীক রূপান্তর। পঞ্চম শুঙ্গরাজ ভাগভদ্রের সভায় তক্ষশিলার অধিবাসী হেলিওডোরাস নামক গ্রীকদূত এসে আনুমানিক ১১৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মধ্যপ্রদেশের বেসনগরে এক বিরাট গরুড়ধ্বজ স্থাপন করেন এবং নিজেকে ভাগবত-সম্প্রদায়ের লোক বলে পরিচয় দেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় ভাগবত-ধর্ম তক্ষশিলা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকে বৈষ্ণবধর্ম রাজপুতানাতেও প্রভাব বিস্তার করে। ওই সময় মহারাষ্ট্রেও বৈষ্ণবধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই বৈষ্ণবধর্ম পূর্বভারতে বিস্তারলাভ করে। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে মহারাজ চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামী বিষ্ণুর পূজার জন্য গুহা ও চক্রচিহ্ন নির্মাণ করে দেন। পঞ্চম শতকে ত্রৈকূটক রাজ দর্ভসেন 'পরমবৈষ্ণব' বলে নিজেকে অভিহিত করেন। ওই সময় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে 'পরম ভাগবত' বলে বর্ণিত করেন। কৃষ্ণের উপাসনা ও কৃষ্ণ-সম্পর্কিত যে সকল

উপাখ্যান আছে, সেগুলি যে বাঙলা দেশে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত এক দেবায়তনে। এই দেবায়তনে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

পালবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, এবং বৌদ্ধধর্মেরই তাঁরা পরিপুষ্টি সাধন করেছিলেন। পালরাজবংশের অবনতির পর বাঙলায় রাজত্ব করেন সেনবংশীয় রাজারা। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মী। সেনবংশের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেনবংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেন 'পরমবৈষ্ণব', 'পরমনারসিংহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সময়ে বৈষ্ণবধর্মের আবার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এই লক্ষ্মণসেনেরই রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন 'গীতগোবিন্দ'-এর কবি জয়দেব।

জয়দেবের জন্মস্থান হিসাবে কেন্দুলি বৈষ্ণবদের একটা তীর্থস্থান। জয়দেব এখানে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং একটা মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। তবে কেন্দুলিতে এখন যে মন্দির রয়েছে, তা নির্মিত হয়েছে জয়দেবের অনেক পরে ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের রাজমাতা নৈরানী দেবী কর্তৃক। শ্যামারূপার গড় (সেনপাহাড়ী) থেকে রাধাবিনোদের বিগ্রহ এনে তিনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির এখন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত মোহন্তদের হাতে। নিম্বার্করা সমন্বয়বাদী।

প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তিতে কেন্দুলিতে একটা মেলা বসে। নানান জায়গার বাউলরা এসে এই মেলায় সমবেত হয়। বাউলদের গানই এই মেলার একমাত্র আকর্ষণ।

কেন্দুলির মাইলখানেক পশ্চিমে ছিল সেকালের বেলুত্তিয়া গ্রাম। অনেকেই মনে করেন এই বেলুত্তিয়া গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র রচয়িতা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। কিন্তু 'শ্রীভক্তমালগ্রন্থ' অনুযায়ী বিল্বমঙ্গলের আবাসস্থল ছিল দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাবেন্না নদীতীরে।

কেন্দুলি ছেড়ে চলে আসুন পূর্বদিকে বোলপুরে। বোলপুর ভেদ করে আরও পূর্বে প্রায় মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে অবস্থিত নান্নুর গ্রাম। কেন্দুলি যেমন ধন্য হয়েছে জয়দেবের স্মৃতিবহন করে, নান্নুর তেমনই ধন্য হয়েছে সাধক

চণ্ডীদাসকে স্মরণ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় যে পন্থাকে বলা হয় রাগাত্মিক বা সখী অনুগত অথবা পরকীয়া এবং যা রসসাধনা পদ্ধতি বলে পরিচিত, তারই কবি ছিলেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের লোক ছিলেন। রসিক কবি হিসাবে তাঁর রচিত পদাবলী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

এবার উত্তরে চলে আসুন একচক্রাপুরে। বৈষ্ণবদের কাছে এটাও একটা পীঠস্থান। এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান হিসাবে একচক্রাপুর বৈষ্ণবদের কাছে পুণ্যস্থান।

বীরভূমে বৈষ্ণবদের আরও কয়েকটি পুণ্যস্থান আছে। ভাণ্ডীরবনে আছে গোপালের বিগ্রহ ও মন্দির। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে যে, একজন সাধক নানা তীর্থ ভ্রমণ করে ভাণ্ডীরবনে এসে পৌঁছান। তাঁর কাছে ছিল গোপালের এক বিগ্রহ। তিনি বিশ্রাম করবার জন্য গোপালটিকে নামিয়ে রাখেন, কিন্তু ওঠবার সময় দেখেন গোপালটিকে আর নাড়ানো যাচ্ছে না। সেই থেকে গোপালটি ভাণ্ডীরবনে থেকে গিয়েছে।

বীরচন্দ্রপুরে বৈষ্ণবদের দুটি মেলা বসে—একটা কার্তিক মাসে, আরেকটা ফাল্গুন মাসে। এখানে আছে বাঁকারায়ের মন্দির। বীরচন্দ্রপুরের উপকণ্ঠে যমুনার ওপারে হচ্ছে গর্ভাবাস। এ জায়গাটা মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত। এর পাশেই হচ্ছে ভদ্রপুর। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নানা কাহিনী এখানে প্রচলিত আছে।

চৈতন্য-উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বীরভূমে যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই বীরভূমের নানা স্থানে অবস্থিত বৈষ্ণব মন্দিরে। এছাড়া, বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পুণ্যস্থানও আছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বীরভূমে চলেছিল এক ঘোরতর দ্বন্দ্ব—বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে। সেজন্যই বোধহয় আমরা বীরভূমের কয়েকটি মন্দিরে বিগ্রহের অভাব দেখি। মনে হয় যে প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের লোকরা সেগুলি সরিয়ে ফেলেছিল। এরূপ শূন্য মন্দিরের অন্যতম হচ্ছে ইলামবাজার ও কবিলাসপুরের মন্দিরদ্বয়। দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যই ঠাকুর রামকানাই একদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও অপরদিকে রাণেশ্বর শিব ও অপরাজিতা দেবীর মূর্তি স্থাপন করে, বৈষ্ণব এবং শাক্ত আরাধনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাত

বীরভূমে গ্রামদেবতারও খুব প্রচলন আছে। বীরভূমের গ্রামদেবতাদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজাই সবচেয়ে বড় পূজা। নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে, বিশেষ করে বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি জাতিসমূহের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারা এই ধর্ম যদিও প্রভাবান্বিত হয়েছে, তথাপি ডোম জাতির লোকই শিলারূপী ধর্মঠাকুরের পুরোহিত। তবে রাজা-রাজড়ারাও যে একসময় এই পূজা করতেন, তা 'ধর্মপুরাণ'সমূহ থেকে জানতে পারা যায়।

যে গ্রামে ধর্মঠাকুরের স্থায়ী মন্দির আছে, সেখানে প্রতিদিনই তাঁর পূজা হয়। সে পূজা সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন। তবে যদি কারও 'মানসিক' থাকে, তাহলে সেদিন পাঁঠা বা কবুতর বলি দেওয়া হয়। আবার কোন কোন অঞ্চলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাড়িতেও শালগ্রাম শিলার পরিবর্তে ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে ধর্মঠাকুরের সবচেয়ে বড় পূজা যেটা, সেটা হচ্ছে বাৎসরিক পূজা। এটা সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়। তবে কোন কোন জায়গায় চৈত্রী পূর্ণিমা বা জ্যৈষ্ঠী বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেও বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ পূজাকে 'ধর্মের গাজন' বলা হয়, এবং যাঁরা এই পূজায় সন্ন্যাসী বা ভক্তা হন, তাঁরা শিবের গাজনের ন্যায় নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। ধর্মশিলাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করানো, এই পূজার এক প্রধান অঙ্গ। এটা বারো দিনে সমাপ্ত হয় বলে, একে বলা হয় 'বারোমতী গাজন'। বারো দিন ধরে নানা আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গাজন পূজা সম্পন্ন হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে ধর্মঠাকুর শিলারূপে পূজিত হয়। সুতরাং ধর্ম-ঠাকুরের ধ্যান কি? তাঁর কল্পিত মূর্তি কি? ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ধর্মঠাকুরের যে বর্ণনা আছে, তা থেকে জানতে পারা যায় যে ধর্মঠাকুর নিরাকার ও নিরঞ্জন। তিনি আকারহীন শূন্যময় দেবতা। নিরাকাররূপে কল্পিত হলেও তাঁর বর্ণ হচ্ছে শ্বেত এবং তিনি শ্বেতবর্ণ সিংহাসন বা পর্যঙ্কের উপর আসীন।

এই ধর্মঠাকুর কে? এবং এঁর প্রকৃত পরিচয় কি? এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। নানাজনে নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ এঁকে বুদ্ধ, কেউ কচ্ছপ, কেউ যম, কেউ সূর্য, কেউ বিষ্ণু, কেউ বরুণ ইত্যাদি নানা আখ্যা দিয়েছেন। তবে দেখতে পাওয়া যায় যে, এঁর পূজার প্রাদুর্ভাব নিম্ন-

শ্রেণীর জাতিগণের মধ্যেই আছে। তাছাড়া, এই পূজার পৌরোহিত্য করবার অধিকার একমাত্র ডোম জাতিরই আছে। বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি নিম্নজাতির হিন্দুরা যে বাঙলার আদিমবাসিসভূত, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বীরভূমে একসময় যে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য মনে হয়, আজ যেমন এই সকল জাতি পারিপার্শিক হিন্দুধর্মের চাপে পড়ে হিন্দু হয়েছে, তেমনই বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের সময় এরা সকলে বৌদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ চর্যাপদসমূহে পুনঃপুনঃ ডোম-ডোমনীর উল্লেখ তার সাক্ষ্য দেয়। আদিবাসী সমাজে গোড়া থেকেই কোন-না-কোন স্বজন-উদ্দীপক ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল পরবর্তীকালের শিব প্রভৃতি দেবতা। সুতরাং মনে হয়, বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতি বৌদ্ধ হয়ে গেলেও তারা তাদের প্রাচীন দেবতাকে পরিত্যাগ করেনি। একসঙ্গেই তারা বুদ্ধ ও সেই আদিম দেবতার আরাধনা করত। সুতরাং বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতিসমূহ যখন বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা নিরাকার বুদ্ধের সাধনা করত, এবং যেহেতু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনই এক, তারা বুদ্ধকেই ধর্মরাজ বলত। তারপর যখন বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটল, তখন তারা আবার হিন্দু হয়ে গেল এবং ধর্মরাজকেই হিন্দুসমাজের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। নিরাকার ধর্মরাজ, নিরাকারই রয়ে গেলেন। বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে অতি পুণ্য তিথি। বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্বাণ ওই তিথিতেই ঘটেছিল। সেজন্য ওই তিথিটাই ধর্মঠাকুরের গাজনের প্রশস্ত দিন। আবার যেখানে আদিম শৈবধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সেখানে ধর্মরাজের গাজন বৈশাখী-পূর্ণিমার পরিবর্তে শিবের গাজনের সময় চৈত্র মাসেই হত।

গ্রামদেবতা হিসাবে ধর্মঠাকুরের পূজা বীরভূম জেলায় খুব ব্যাপক। বীরভূমের প্রায় প্রতি গ্রামেই ধর্মঠাকুর পূজিত হন। সেজন্য মনে হয় যে ধর্মঠাকুরের পূজার উদ্ভব বীরভূম জেলাতেই হয়েছিল এবং সেখান থেকে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশে। এখনও এসব জেলায় ধর্মপূজার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব আছে।

আবার অনেক জায়গায় ধর্মঠাকুর, শিবঠাকুরের সঙ্গেই মিশে গিয়েছে।

মনসা

বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বীরভূমেও গ্রামদেবতা হিসাবে পূজিতা হন মনসা-দেবী। মনসা সর্পের দেবতা। সর্পদংশনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই মনসাদেবীর পূজা করা হয়। 'সর্পপূজা' অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। গৃহ্যসূত্রে এর উল্লেখ আছে। মহেঞ্জোদারো-সভ্যতা এবং ভারহুতের যুগ হতে ভারতের সর্বত্র নাগ-নাগিনী মূর্তি দেখা যায়। নাগমুকুট ও ঘটসহ দেবমূর্তি সাতনা, খিচিং, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং অন্যত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে লোকে নানা প্রতিমা নির্মাণ করে ঘটা করে মনসার পূজা করত। আষাঢ়ের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে ঘটে অথবা সিজগাছে কিংবা চালির পিছনে মনসাদেবীর মূর্তি অঙ্কিত করে দুধকলা দিয়ে দেবীর পূজার প্রচলন বঙ্গের নানা স্থানে আছে। পল্লী অঞ্চলে পূজার পর আটদিন ধরে মনসার ভাসান বা অষ্টমঙ্গলা গীত হয়।

বজ্রযানী বৌদ্ধসমাজেও জাঙুলী নামে এক সর্পদেবীর পূজা, সাধনা, মন্ত্রাদি, বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সর্পদংশন হতে রক্ষা করতে এবং সর্পদংশন করলে তার বিষ নষ্ট করতে জাঙুলী ছিল অদ্বিতীয়া। জাঙুলীর নাম শুনলে সাপ পালিয়ে যায়, এ বিশ্বাস সেকালের বৌদ্ধদের ছিল। তাঁর নাম করলে সাপের বিষ শরীরে সঞ্চারিত হয় না বলেও তাদের বিশ্বাস ছিল। জাঙুলীর মূর্তি-কল্পনা নানারূপে করা হয়েছিল। তাঁর রঙ কখনও শাদা, কখনও হরিৎ, আবার কখনও পীত হত। বৌদ্ধদের মন্ত্র থেকে বুঝতে পারা যায় যে, জাঙুলীর উপাসনা আদিবাসী সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছিল। কেননা, নিম্নস্তরের সমাজে সাপের 'রোজা'রা যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে, এ মন্ত্র তার অনুরূপ।

লৌকিক পূজা হিসাবে এঁর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বাঙলাদেশে যে মঙ্গল-কাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল, তা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে মনসাপূজা আদিবাসী সমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছিল। কেননা, মনসামঙ্গল কাহিনীতে লখীন্দরের জন্য যে বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল, তা সাঁতালী পাহাড়ের ওপর। এর দ্বারা বীরভূমের পশ্চিম অঞ্চলে সাঁওতাল পরগনাই সূচিত হচ্ছে। এছাড়া, মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাদেবীর জন্ম সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, তার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর বৈপরীত্যও তাই সূচিত করে। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ইনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী ও আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ

সর্পমন্ত্র সৃষ্টি করে তপোবলে মন দ্বারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উৎপাদন করেন। সেজন্য এঁকে মনসা বা কশ্যপের মানসী কন্যা বলা হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ)। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে ইনি শিবকন্যা। কালিদহে পদ্মপত্রের ওপর এঁর জন্ম। সেজন্য মনসার অপর নাম পদ্মাবতী। শিব ছিলেন আদিবাসী সমাজের দেবতা। সেই হেতু আদিবাসী সমাজে মনসার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক।

মনসামঙ্গল কাব্যের দ্বারাই হিন্দুসমাজে মনসাপূজা প্রচলিত হয়। চাঁদসদাগর কর্তৃক এই পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। বীরভূমে গন্ধবণিক সমাজে মনসা পূজা বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে সকল সম্প্রদায়ের লোকরাই মনসাপূজা করে। মনসা-পূজার সময় মনসাগাছকে মনসার প্রতীক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, আর তা নয়তো চালির পিছনে অঙ্কিত মনসাদেবীর পূজা করা হয়। বীরভূমের অনেক গ্রামে সর্পাসীনা প্রস্তরমূর্তি বা সিন্দুর লেপিত প্রস্তরখণ্ডও মনসাপূজায় ব্যবহৃত হয়। এই প্রস্তরনির্মিত মনসামূর্তি বা সিন্দুর লেপিত প্রস্তরখণ্ড সাধারণত অশ্বত্থ বা অন্য কোন বৃক্ষমূলে স্থাপিত হয়। কখনও কখনও কোন কুটিরেও এইরূপ মনসামূর্তি পূজিত হয়। কোন কোন জায়গায় মনসার জন্য ছোট দেউলও নির্মিত আছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বীরভূমের মুরারই থানার অন্তর্গত ভাদীশ্বর গ্রামে একটি প্রস্তরনির্মিত সুন্দর মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন জায়গায় মন্দির অলঙ্করণের মধ্যেও মনসার প্রতিকৃতি লক্ষিত হয়। ঘুরিষার (শ্রীপুরে) রঘুনাথ জিউর মন্দিরে ও তারাপীঠের মন্দিরের স্তম্ভগাত্রেও মনসার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। চন্দ্রকেতুগড়েও পোড়ামাটির নাগমূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

৪৪

বীরভূমের ধর্মীয় চেতনা ও নান্দনিক অনুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পায় মন্দির-গাত্রের অলঙ্করণে। বীরভূমের অনেকগুলি মন্দিরের অলঙ্করণে আমরা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের দৃশ্যাবলী ও অনেক দেবদেবীর মূর্তির রূপায়ণ দেখতে পাই। এগুলি হয় মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ দ্বারা, আর তা নয়তো মন্দিরের প্রবেশ-পথের মাথায় স্থাপিত প্রস্তরের ওপর উৎকীর্ণ। এছাড়া, কয়েকটি মন্দিরের প্রবেশপথের নিকট অবস্থিত স্তম্ভের ওপরও অঙ্কিত আছে এইসব দৃশ্য। নানুর থানার অন্তর্গত আজোয়ার শিবমন্দিরের প্রবেশপথের মাথার ওপর দেখতে পাই

বৃষবাহন শিব ও ষড়্ভুজ কৃষ্ণকে ; বোলপুর থানার অন্তর্গত আদিত্যপুরের দেউলের প্রবেশপথের উপর এক মৃৎফলকে আমরা দেখি লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান ও গণেশকে ; বোলপুর থানার অন্তর্গত ইটাণ্ডার প্রবেশপথের কাছে এক স্তম্ভগাত্রে আমরা দেখি শুম্ভ-নিশুম্ভদলনী চণ্ডী, কালভৈরব, মহিষাসুরমর্দিনী ও কালীকে ; ওই থানারই অন্তর্গত ইলামবাজারের হাটতলার মন্দিরগাত্রে দেখি দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, রাসমণ্ডল ; বামুনপাড়ার লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের খিলানের উপর দেখি গিরিগোবর্ধন, গোষ্ঠলীলা, রামরাবণের যুদ্ধ ও রামসীতা ও নিকটস্থ অন্য একটি মন্দিরে দেখি অনন্তশায়ী বিষ্ণুকে ; নানুর থানার অন্তর্গত উচকরণে সরখেলদের মন্দিরগাত্রে দেখি কৃষ্ণলীলা, গোপিনীসহ কৃষ্ণ, বৃষোপরি শিব-পার্বতী, জটায়ুবধ, সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন, মহিষাসুরমর্দিনী ও দশমহাবিদ্যা ; মহম্মদবাজার থানার অন্তর্গত গণপুরের কালীতলার মন্দিরের খিলানের উপর দেখি রামরাবণের যুদ্ধ, মহিষমর্দিনী, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, কার্তিক, গণেশ, রাসমণ্ডল, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণের জন্ম ও অন্যান্য দেবদেবী ও কিছু-দূরে অন্য একটি মন্দিরে দেখি দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীকে রক্ষা, সমুদ্রমন্থন, দেবাসুরের মধ্যে মোহিনী কর্তৃক অমৃত বিতরণ, ও গোপিনীগণসহ কৃষ্ণ ; বোলপুর থানার অন্তর্গত সুরিথার (শ্রীপুর) রঘুনাথজিউর মন্দিরের দরজার উপরে দেখি বৃষারূঢ় শিব, কালী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, ত্রিবিক্রম, বলরাম, মনসা, বৃষোপরি শিব-পার্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গামহিষমর্দিনী, নবনারীকুঞ্জর, রাসমণ্ডল, গজেন্দ্রমোক্ষ, দুর্গা, বিষ্ণু অনন্তশায়ী, কালীয়দমন ও গোচারণে কৃষ্ণ ; নানুর থানার অন্তর্গত চণ্ডীদাস-নানুরে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি ; বোলপুর থানার অন্তর্গত সুপুর গ্রাম সংলগ্ন চন্দনপুরে রামসীতা, কল্কি, জগন্নাথ, বলরাম, পরশুরাম, ত্রিবিক্রম ও দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি ; অজয় নদীর তীরে ইলামবাজার থানার অন্তর্গত জয়দেব-কেন্দুলীতে রাধাবিনোদ মন্দিরের মৃৎফলকের উপর দেখি শিব, বিষ্ণু, বায়ু, যম ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পাল, দশাবতার, জটায়ু কর্তৃক সীতার উদ্ধার, কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী ইত্যাদি ; দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত রামপুর-হাট থানার অন্তর্গত তারাপীঠের মন্দিরের খিলানের ওপর দেখি মহিষমর্দিনী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাবলী, ভীষ্মের শরশয্যা, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণের ঘটনাবলী, গজলক্ষ্মী ও মনসা ; নানুর থানার অন্তর্গত

বীরভূমের প্রায় পূর্বসীমানায় অবস্থিত দাসকলগ্রামের শিবমন্দিরের গায়ে দেখি গরুড়বাহনের উপর বিষ্ণু ; দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত দুবরাজপুরের মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের উপর শিবের কৈলাস আক্রমণের ঘটনাবলী ও অন্যান্য পৌরাণিক দৃশ্যাবলী ও দেবদেবীসমূহ ; ময়রাপাড়ার মন্দিরগাত্রে দেখি দশাবতার, অন্নপূর্ণা, শিব, রাম-সীতা, কৃষ্ণলীলা, শিববিবাহ ও ওঝাপাড়ার শিবমন্দিরের দুই পার্শ্বের মৃৎফলকের ওপর রামায়ণের ঘটনাবলী, নরসিংহ অবতার, নারদ ও নৌকাবিহার, খয়রাশোল থানার অন্তর্গত পাথরকুচিতের চারবাংলা মন্দিরের গায়ে দেখি দশাবতার, গণেশ ইত্যাদি ; নানুর থানার অন্তর্গত বালিগুনিতে মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য, গরুড়-বাহনারূঢ় বিষ্ণুর সহিত বৃষারূঢ় পঞ্চানন শিবের সংঘর্ষ ; ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত মল্লারপুরে কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, শিব ইত্যাদি ; সিউড়ি থানার অন্তর্গত মহলায় কৃষ্ণের গাভী-দোহন ; নলহাটী থানার অন্তর্গত মেহগ্রামে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী, দশাবতার, গৌর-নিতাইয়ের প্রতিকৃতি, দুর্গা ও কালী ; সিউড়ি থানার অন্তর্গত রামপুরের এক আটচালা মন্দিরের গায়ে বৃষোপরি নন্দীভৃঙ্গীসহ শিব ; বোলপুর থানার অন্তর্গত সেরাণ্ডীতে রাধাকৃষ্ণ ও শিবের প্রতিকৃতি ; সিউড়িতে মাকড়া পাথরের তৈরি 'ঝুনঝা' মন্দিরের দরজার খিলানের ওপর কালীয়দমন, নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, রাসমণ্ডল, বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, বাহনোপরি ব্রহ্মা, বায়ু, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি ; বোলপুর থানার অন্তর্গত সুপুরে 'শ্যামসায়রে'র দক্ষিণে অবস্থিত মন্দিরে দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের প্রতিকৃতি ও ওই থানারই অন্তর্গত সুরুলের লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দিরের গায়ে দেখি রামায়ণের ঘটনাবলী, রাম-রাবণের যুদ্ধ, অশোকবনে চেড়ী পরিবৃতা সীতা, মহিষাসুরমর্দিনী, ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন, পার্বতী ও গণেশ, রামসীতা ইত্যাদি ; দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত হেতমপুরের চন্দ্রনাথ মন্দিরের গায়ে গণেশজননী, জগদ্ধাত্রী, গজলক্ষ্মী, ও দেওয়ানজী শিবমন্দিরের ওপর রামসীতা, গোপিনীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা ও অন্যান্য পৌরাণিক দৃশ্যাবলী। এছাড়া, অনেক মন্দিরের গায়ে তৎকালীন সামাজিক ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রও রূপায়িত আছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে মন্দিরগাত্রে এরূপ অলংকরণ বাঙলার অন্যান্য সব জেলার মন্দিরেই আছে।

বাঙালীর জীবনচর্যার বিবর্তন

এখন বাঙালীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, ঘরবাড়ি, খাদ্যাখাদ্য, পোশাক-আশাক ও মেয়েদের অলঙ্কার-ভূষণ প্রভৃতির বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রাচীন বাঙলার গ্রামের লোক বাস করত এখনকার মতোই কুঁড়ে-ঘরে। মাটির দেওয়াল গড়াই বাঙলাদেশের রীতি। অনেক জায়গায় চ্যাচা বাঁশের বেড়া তৈরি করে তার দুপিঠে মাটি লেপেও দেওয়া হত। পূর্ববঙ্গের লোকেরা অনেক জায়গায় তল্লা-বাঁশ চিরে সুন্দর টাটি বুনে তা দিয়ে দেওয়াল করে, এবং অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রাচীন কালেও করত। বাঙলাদেশে অধিকাংশ স্থানেই খড় বা ছনের চাল দেওয়া হয়। তবে হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় খোলার চালেরও প্রচলন আছে। পশ্চিম বাঙলার রীতি হচ্ছে ঘরের চালকে হাতির পিঠের মতো কতকটা গোলাকার করা। একে চালে 'ঝাগ' দেওয়া বা 'কোর' দেওয়া বলা হয়। সাধারণত কুটিরগুলি চারচালা হয়। মোট কথা, কুটিরগুলিকে ঢালু করা হয় যাতে বৃষ্টির জল গড়িয়ে মাটিতে পড়তে পারে। মেঝে শক্ত করা হত গোবর দিয়ে, তবে অনেক সময় চুনের ব্যবহারও করা হত। বসতবাড়ির চারদিক ঘেরা থাকত বাঁশ বা কাঠের বেড়া দিয়ে। ঘরের মধ্যে বসবার এবং শোবার জন্য ব্যবহার করা হত মাদুর। কখনও কখনও কাঠের চৌকিও ব্যবহার করা হত। খাবার সময় বসবার জন্য ব্যবহার করা হত পিঁড়ি এবং খাওয়া-দাওয়া করা হত সাধারণত মাটি বা ধাতুনির্মিত বাসনে।

নগরের লোকরা অবশ্য ইট দিয়ে কোঠাবাড়ি তৈরি করত। এগুলির ছাদ সমপৃষ্ঠ হত। ইটগুলি গাঁথা হত মাটি দিয়ে। পরে চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথবার পদ্ধতিও লক্ষ্য করা যায়। দেওয়ালে পলস্তরা দেওয়া হত চুনবালির। অনেক সময় 'পঙ্খের' কাজও করা হত। নগরের লোকরা সাধারণত শোবার জন্য ব্যবহার করত খাট বা পালঙ্ক। তাছাড়া, নগরের ধনীলোকরা ব্যবহার করত সোনা-রূপার বাসন।

দুই

গ্রামে সাধারণ গৃহস্থের খাওয়া-দাওয়া ছিল খুব সাদাসিধে ও সরল। সবচেয়ে

যে প্রাচীন বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, বনিতা তাঁর পুণ্যবন্ত স্বামীকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছেন—কলাপাতে গরম ভাত, সঙ্গে গাওয়া ঘি, দুধ, মাছ, নালিতা বা পাটশাক ; আদা ও নুনও দেওয়া হত। ধনী সমাজের খাদ্য যে অন্যরকম ছিল তা বলা বাহুল্যমাত্র। বাঙলার উচ্চকোটি সমাজে ব্যবহৃত চৌষট্টি রকম ব্যঞ্জনের কথা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের সময়ও বাঙালী যে তার খাদ্যের কোনরূপ পরিবর্তন করেনি তার প্রমাণ আছে। মৎস্য বাঙালীর প্রিয় খাদ্য এবং বাঙালী বৌদ্ধ হয়ে গেলেও মৎস্য আহার বর্জন করেনি। সহজযানের প্রবর্তক লুইপাদ তো মাছের পোঁতড়ি (অন্ত্র) খা তেলচচ্চড়ি খেতে ভালবাসতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকরা যে শূকরের মাংস খেত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, শূকর পোষা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রকে শূকর বলি দিতে হবে)। বস্তুত বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগে বাঙালীর কোনও রূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল না। এ বিষয়ে বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হয় 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এর যুগে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। বাঙালী ব্রাহ্মণের খাদ্যের ওপর তখন পঞ্জিকার শাসনও এসে গিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, একাদশী, রামনবমী, শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীতে ব্রাহ্মণ উপবাসী থাকবেন। যদি তিনি ওই সকল দিনে আহার করেন, তা হলে তিনি বিষ্ঠা-মূত্র আহার করবেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, বিপক্ক অন্ন বা চিঁড়া ব্রাহ্মণের প্রশস্ত খাদ্য নয়। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ যদি তামার বাসনে আহার করেন বা দুন দিয়ে দুধ খান বা এঁটো পাতে ঘি খান, তা হলে তা গোমাংস খাওয়ার সমান হবে। মদ্যপান বোধ হয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, কেননা বলা হয়েছে যে, কাঁসার বাসনে নারিকেলের জল ও তামার বাসনে মধু ও আখের রস খাওয়া মদ্যপানের সমান। কার্তিক মাসে বেগুন ও মাঘ মাসে মুলা খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আরও বিধান দেওয়া হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণ যদি ডাল, মসুর ডাল ও মাছ খান, তা হলে তাঁকে তার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিন রাত্রি উপবাসী থাকতে হবে। তবে বাঙালী ব্রাহ্মণ যে এ সকল বিধান মানতে নারাজ ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহন বলেছিলেন যে, বাঙালী ব্রাহ্মণ মাছ খেতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনও রায় দিলেন যে, বাঙালী ব্রাহ্মণের পক্ষে মসুর ডাল নিষিদ্ধ নয়। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' আর যা যা

খাদ্য নিষিদ্ধ বলেছিল, তা হচ্ছে তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, ষষ্ঠীতে নিম ও চতুর্দশীতে মাষকলাই। সকলের চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে যদিও 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ'-এ ব্রাহ্মণের পক্ষে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তথাপি বলা হয়েছিল যে, পূর্ণিমা ছাড়া অন্য তিথিতে ব্রাহ্মণ দেবতার কাছে বলি দেওয়া মাংস খেতে পারে।

তিন

তবে পরবর্তী কালে উপবাস ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে এ সকল বিচার-বিধান যে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছিল তা চলতি বচন, পঞ্জিকার অনুশাসন ও লৌকিক রীতি থেকে বুঝতে পারা যায়। 'বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক রূপ' সংজ্ঞক অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করেছি। তবে পাঠকদের আর একবার সেকথা-গুলো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। উপবাস সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যে চলতি বচন রচিত হয়েছিল তা হচ্ছে—"শোয়া ওঠা পাশ মোড়া। / তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া ॥ / কেশার চৌদ্দ কেশীর আট। / এই নিয়ে কাল কাট ॥" এর মানে হচ্ছে এই যে, শয়ন একাদশী (আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), পার্শ্বপরিবর্তন (ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), ভীম একাদশী (মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), উত্থান একাদশী (কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), শিবরাত্রি (ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী) ও দুর্গাষ্টমী (আশ্বিন মাসের শুক্ল-পক্ষের অষ্টমী)—এইগুলিই হচ্ছে উপবাসের বিশেষ দিন। এছাড়া, অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীর দিন সন্তানবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার হিসাবে গণ্য হয়। ওদিনও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুপূজার দিন। ওই সকল দিনেও মেয়েরা মাছ খায় না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিন স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে হিন্দুরা মাছ খায় না। দশহরার দিন কলার আহার করবার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া কোন কোন দিনে ঠাণ্ডা খাদ্য খাবার নিয়ম আছে। তার মধ্যে পড়ে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন। ওইদিন তপ্ত খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। মাত্র পূর্বদিনের রান্না-করা জিনিসই খাওয়া চলে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী শীতল-ষষ্ঠী নামে অভিহিত। ওদিনও ঠাণ্ডা খাদ্য খাওয়া বিধেয়। মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ পর্যন্ত পালন করে আসছে। তবে

পঞ্জিকায় যেসকল খাদ্য বা কর্ম বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তার সবগুলি বাঙালী হিন্দু আজ আর পালন করে না। সে সকল নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মুলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমিশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মাষকলাই। এছাড়া অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তেল, মৎস্যমাংসাদি সম্ভোগও নিষিদ্ধ। আগেকার দিনে বিধবারা আলুও খেত না, কেননা আলু বিদেশ থেকে আগত সবজি।

শাক-সবজির মধ্যে আগেকার দিনে বাঙালীর খাদ্যে যা স্থান পেত, তা হচ্ছে —শাকের মধ্যে পলতা, নটে, কলমি, হিঞ্চে, বিম্বি, পুঁই, কুমড়া, পাট শাক ইত্যাদি ; সবজির মধ্যে লাউ, কুমড়া, পটল, বেগুন, ঝিঙা, চালতা, কাঁচকলা, কন্দ-আলু, রাঙা-আলু প্রভৃতি। পিঁয়াজ ও রসুনের চাষও ছিল, তবে ভদ্রসমাজে তার ব্যবহার ছিল না। অতি প্রাচীন বাঙলায় চা-ও যে ব্যবহার করা হত উয়াং চুয়াং তা বলে গিয়েছেন।

ফলমূলের মধ্যে ছিল কদলী, দাড়িম্ব বা লকুচ, বেল বা শ্রীফল, কলা, কাঁকুড়, তেঁতুল, ইক্ষু বা আখ, নারিকেল, তাল, তালশাঁস, কাঁঠাল, আম, কালজাম, লেবু প্রভৃতি।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু, ষাঁড়, ঘোড়া, হাতি, গাধা, শুকর, কুকুর, ও ভেড়া। নানারকম পাখিও পোষা হত এবং অনেক সময় তাদের বার্তাপ্রেরণের কাজে ব্যবহার করা হত।

বেশভূষার দিক থেকে চিরকালই বাঙালী পুরুষরা ধুতি ও মেয়েরা শাড়ি পরে এসেছে। নানারকম শাড়ির নাম আমরা প্রাচীন সাহিত্যে পাই, যথা— 'নিয়রমেলানী', 'মেঘ-উদুম্বর', 'গঙ্গাসাগর,' 'লক্ষ্মীবিলাস', 'ধারবাসিনী', 'সিলহটি', 'গাজেরী', প্রভৃতি। সূক্ষ্ম মসলিনের সূতা কাটা হত ঘরে ঘরে এবং তাঁতিকে দিয়ে সেই সূতায় ধুতি-শাড়ি বানিয়ে নেওয়া হত। বাঙালী মেয়েদের ঘরে ঘরে সূতাকাটার রীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এছাড়া পট্ট ও নেতবস্ত্রের (সিল্কের) শাড়িরও প্রচলন ছিল। শণের তৈরি ক্ষৌমবস্ত্রের প্রচলনও চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াঙের সময় পর্যন্ত ছিল। আর বাঙলার

মসলিন তো জগদ্‌বিখ্যাত ছিল। তা ছাড়া ছাতার ব্যবহারও বাঙলাদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে ছিল।

বাঙালী মেয়েরা তখনও মাথায় সিঁদুর দিত এবং হাতে নোয়া, রুলি ও শাঁখা পরত। এখনও তাই পরে। তবে মেয়েদের হাতে রুলি পরার প্রথা এখন প্রায় উঠে গেছে। এগুলি সবই লোকসমাজের অলঙ্কার ছিল বলে মনে হয়। অতি প্রাচীন লোকায়ত সমাজ থেকে এগুলি যুগ-পরম্পরায় চলে এসেছে। এ ছাড়া পুরুষ ও মেয়েরা উভয়েই নানা রকমের অলঙ্কার পরত। বাঙালী পুরুষদের অলঙ্কার পরা মাত্র কয়েক দশক আগে উঠে গেছে। এখন মাত্র আংটি, মাদুলী ও কারও কারও গলায় একগাছা সরু হারে এসে দাঁড়িয়েছে। তা-ও ছিনতাইয়ের ভয়ে সোনার বদলে রুপায়। বাঙালী মাথায় টিকিও রাখত, তাও আজ উঠে গেছে।

প্রাচীন কালে মেয়েরা মাথায় নানারকম খোঁপা বাঁধত ; এখনও বাঁধে, তবে তার ঢঙ পালটে গেছে। তখনকার দিনের মেয়েদের অনেক অলঙ্কার আজ উঠে গিয়েছে, যেমন—নাকের নোলক ও নথ, হাতের বাউটি ও তাগা, ও গলায় হাঁসুলি এবং সাতনরী হার, পায়ে তোড়া ও মল, কোমরে গোটহার ইত্যাদি। আজকালকার শহরে মেয়েরা অনেকে হাতে নোয়া পরে না, পরে হাতঘড়ি।

গত কয়েক দশকে মেয়েদের বেশভূষা ও পোশাক-আশাকের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বাঙালী মেয়েরা পাছাপেড়ে শাড়ী পরত। আজ মেয়েদের শাড়ী থেকে মধ্যেকার এই তৃতীয় পাড়টা মুছে গেছে। তাছাড়া মেয়েরা আর বুক পর্যন্ত ঘোমটা দেয় না।

বা. ও বা. বি.-১০

বাঙলার মনীষা ও সাহিত্যসাধনা

প্রাচীন বাঙলার মনীষা ও সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে এবার কিছু বলা যেতে পারে। বাঙালীর মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য খুব প্রাচীন নয়। সবচেয়ে পুরানো যে সাহিত্যের নিদর্শন আমরা পাই তা হচ্ছে 'দোহা' বা 'চর্যাগীতি'। এগুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে রচিত হয়েছিল। তার পূর্বেকার সাহিত্য হয় সংস্কৃতে, আর তা নয়তো প্রাকৃত ভাষায় রচিত হত। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ পৌছবার পূর্বেই বাঙলায় সংস্কৃত ভাষা প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বণিক ও সাধুসন্তদের মারফত। সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশের পূর্বে যে ভাষায় বাঙলাদেশের লোক কথাবার্তা বলত তা অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আল্পীয় নরগোষ্ঠীর ভাষা। এদের মধ্যে আল্পীয় নরগোষ্ঠীর লোকরা আর্যভাষাভাষী ছিল। কিন্তু এই আর্যভাষার সঙ্গে বৈদিক আর্যগণের ভাষার কিছু প্রভেদ ছিল। ('আর্য ও প্রাগার্য সভ্যতার সংশ্লেষণ' অধ্যায় দেখুন)। পতঞ্জলি এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, পূর্বভারতের লোকেরা কতকগুলি 'ক্রিয়াপদ' বিশেষ অর্থে এবং 'র' বর্ণটির পরিবর্তে 'ল' বর্ণ ব্যবহার করে। পতঞ্জলি আরও বলেছিলেন যে, এরূপ ব্যবহার 'অসুর' জাতির উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'র' স্থানে 'ল'-এর উচ্চারণ মাগধী-প্রাকৃতেরও বৈশিষ্ট্য। এ থেকে মনে হয় যে, বাঙলার আদিভাষা মাগধী-প্রাকৃতেরই অনুরূপ কোন ভাষা ছিল। তবে বাঙলায় সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন যা পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে মহাস্থান থেকে প্রাপ্ত এক অনুশাসন। এই অনুশাসনের ভাষা মাগধী-প্রাকৃতের অনুরূপ ভাষা। এই অনুশাসন খ্রীস্টপূর্ব কালের। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত এর পরবর্তী যে অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর। এটা হচ্ছে শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত চন্দ্রবর্মণ রাজার গিরিলিপি। এর ভাষা সংস্কৃত হলেও মনে হয় সংস্কৃত ভাষা তখন বাঙলায় সবেমাত্র প্রবেশ করেছে, কেননা এই লিপিটি গদ্যে রচিত। পরবর্তী কালে বাঙালী যখন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে তখন সুললিত ভাষায় কবিত্বপূর্ণ প্রশস্তি রচনা করতে শুরু করেছিল।

দুই

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। উত্তর এবং পশ্চিম ভারত থেকে ব্রাহ্মণগণের বাঙলায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃতচর্চার বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এরূপ চর্চার জন্য যে কেবল ব্রাহ্মণরাই টোল স্থাপন করে-ছিলেন তা নয়, বৌদ্ধদের বিহারগুলিও সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অনুশীলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অন্তত উয়াং চুয়াং যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি তাই দেখে-ছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য চৈনিক পরিব্রাজকরা বলে গেছেন যে, বৌদ্ধ বিহারগুলি সংস্কৃত ভাষায় মাত্র বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র ছিল তা নয়, সেখানে ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ন্যায়, দর্শন, চিকিৎসা, বেদ, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ছন্দ-জ্ঞান, যোগ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হত।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই যে বাঙলায় সংস্কৃত ভাষা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই এই সময়ের অনুশাসনগুলি থেকে। এগুলি সুললিত ছন্দে ও উপমাবহুল আলঙ্কারিক ভাষায় রচিত হয়েছিল। বিশেষ করে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা খুব উচ্চশীর্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কেননা সংস্কৃত ব্যাকরণের চান্দ্রশাখার প্রবর্তক চন্দ্রগোমিনের এই সময়েই আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর গ্রন্থ থেকে 'কাশিকা' ৩৫টি সূত্র স্বীকার না করেই গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা এ সময় বাঙলাদেশে খুব ব্যাপকভাবে চলেছিল এবং অন্যান্য যে-সমস্ত বৈয়াকরণদের নাম আমরা অবগত হই তাঁরা হচ্ছেন জিনেন্দ্র-বোধি গোবর্ধন, দামোদরসেন ও ইন্দুমিত্র। অভিধান রচনাতেও বাঙলাদেশের পণ্ডিতেরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বানন্দ, পুরুষোত্তমদেব ও মহেশ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাশাস্ত্রেও বাঙালী পণ্ডিতদের নাম সুদূর-প্রসারিত হয়েছিল। উয়াং চুয়াং বলে গিয়েছেন যে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। নিদান সম্বন্ধে এই যুগের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন চক্রপাণি দত্ত। তিনি 'আয়ুর্বেদদীপিকা' ও 'ভানুমতী' নামে যথাক্রমে চরক ও সুশ্রুতের ওপর টীকা রচনা করে গিয়েছেন। এ ছাড়া, তিনি আরও রচনা করেছিলেন 'শব্দচন্দ্রিকা', 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ'। এগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে মৌলিক রচনা। আরও যাঁরা চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সুরেশ্বর বা সুরপাল ও বঙ্গসেন। সুরেশ্বর রচনা করেছিলেন

'শব্দপ্রদীপ', 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' ও 'লৌহ-পদ্ধতি' এবং বঙ্গসেন রচনা করেছিলেন 'চিকিৎসাসার-সংগ্রহ'। উয়াং চুয়াং বলে গিয়েছেন যে, এ সকল গ্রন্থ তাল-পাতায় লিখিত হত। রাজকীয় দপ্তরের বিবরণীসমূহও তালপাতায় লিখিত হত এবং সেগুলি বাঁধা হত নীল ফিতা দিয়ে। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে কাগজের ব্যবহারও খুব ব্যাপক ছিল।

বাঙলায় পণ্ডিতগণ অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করে-ছিলেন তার অন্যতম ছিল জ্যোতিষ, দর্শন, কাব্য ও স্মৃতি। এই যুগের বাঙালী পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মল্লিকার্জুন সূরী 'শিষ্যধীবৃদ্ধিতন্ত্র' নামে লল্লাচার্যের গ্রন্থের ওপর এক টীকা রচনা করেছিলেন। দার্শনিক শ্রীধরদাস 'ন্যায়কন্দলি', 'অদ্বয়সিদ্ধি' ও 'তত্ত্ববোধ-সংগ্রহ'-এর টীকা রচনা করেছিলেন। দর্শন বিষয়ে ভট্ট ভবদেবের 'তৌতাতিতমত-তিলক' এবং হলায়ুধের 'মীমাংসা-সর্বস্ব' ও শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' এই যুগেই রচিত হয়েছিল। স্মৃতির ক্ষেত্রে এই যুগের বড় স্মার্তকার ছিলেন ভট্ট ভবদেব, মাধবভট্টের পুত্র গোবিন্দরাজ, 'দায়ভাগ'-এর রচয়িতা জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'-এর রচয়িতা হলায়ুধ ও তাঁর দুই ভাই পশুপতি ও ঈশান। কাব্যের ক্ষেত্রে এযুগের বড় কবি ছিলেন 'বেণীসংহার'-এর রচয়িতা ভট্টনারায়ণ, 'রামচরিত'-এর রচয়িতা অভিনন্দ ও অপর সুপ্রসিদ্ধ 'রামচরিত'-এর রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী। বৈয়াকরণদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ক্রমদীশ্বর। তিনি খ্যাতনামা হয়েছিলেন সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ রচনা করে। বস্তুত পাল ও সেন-যুগকে আমরা বাঙলায় সংস্কৃত ভাষাচর্চার স্বর্ণযুগ নামে অভিহিত করতে পারি। যে সকল স্থানে নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে অনুশীলন হত, তার অন্যতম ছিল তাম্র-লিপ্তি (মেদিনীপুর জেলায়), ভূরিশ্রেষ্ঠ (হুগলী জেলায়), সিদ্ধল (বীরভূম জেলায়) ও বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত বনগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে।

তিন

বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনায় পাল সম্রাটগণের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। পালসম্রাট ধর্ম-পালের পৃষ্ঠপোষকতায় হরিভদ্র রচনা করেছিলেন তাঁর 'অভিসময়ালংকার'-এর বিখ্যাত টীকা। দ্বিতীয় গোপালের আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশীলা বিহারে রচিত হয়েছিল 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'। মহীপালদেবের আমলে

'গুহ্যসমাজ'-এর অনেকগুলি টীকা প্রণীত হয়েছিল। নয়পালদেবের আমলে রাজ্ঞী উদ্দাকার ব্যয়ে রচিত হয়েছিল 'পঞ্চরক্ষা' নামে একখানি গ্রন্থ। রামপালদেবের রাজত্বকালে অভয়াকর গুপ্ত কালচক্রযান সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'যোগাবলী', 'মর্মকৌমুদী', ও 'বোধিপদ্ধতি' প্রসিদ্ধ। রামপালদেবের রাজত্বকালেই নালন্দা বিহারে গ্রহকুণ্ড নামক জনৈক লেখক কর্তৃক 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থটি অনুলিখিত হয়েছিল। তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে বিক্রমশীলা মহাবিহারে অনুরূপভাবে 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র আর একখানি অনুলিপি সম্পাদিত হয়েছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারের অন্যতম মহাস্তম্ভ জ্ঞানশ্রীমিত্র (আনুমানিক একাদশ শতাব্দী) রচনা করেন 'কার্যকারণভাবসিদ্ধি', 'ক্ষণভঙ্গাধ্যায়', 'অপোহ প্রকরণ', 'সাকার সিদ্ধিশাস্ত্র' ইত্যাদি গ্রন্থ। উল্লেখনীয় যে রাজগীরের নিকট অবস্থিত নালন্দা ও পূর্ব-মগধে অবস্থিত বিক্রমশীলা বিহারদ্বয়ই এ যুগের বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুশীলন ও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন ছিল।

মোটকথা বিবিধ শাস্ত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাই যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৌদ্ধ পণ্ডিতদেরও বিশিষ্ট অবদান ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বজ্রযান-বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি বাঙলাদেশেই হয়েছিল। বলা হয়, উড্ডীয়ান বা ওড্ডানের রাজা ইন্দ্রভূতি (সম্ভবত সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী) ভগিনী বা কন্যার সহযোগে বাঙলায় 'বজ্রযোগিনী সাধন' প্রবর্তন করেন। বাঙলাদেশের বৌদ্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পণ্ডিতবিহার, পট্টিকেরকবিহার, শালবন বিহার, ত্রৈকূটক ও অন্যান্য স্থানে। এই সকল বিহারের বৌদ্ধ শ্রমণরা ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে শত শত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে-সকল গ্রন্থের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা তিব্বত, চীন ও মধ্য-এশিয়া থেকে মাত্র তাদের অনুবাদ পেয়েছি। ওই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন মহাচার্য দীপঙ্কর (অপর নাম অতীশ)। অন্যান্য আরও যেসব পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন শীলভদ্র, শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত, জ্ঞানশ্রীমিত্র, অভয়ংকরগুপ্ত, দিবাকরচন্দ্র, দানশীল, কুমারবজ্র, বিভূতিচন্দ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা, মোক্ষকরগুপ্ত, পুণ্ডরীক, মৎস্যেন্দ্রনাথ (লুই-পা), গোরক্ষনাথ, জালন্ধরীপাদ, বিরূপা, তিল্ল-পা, নব-পা, কাহ্ন-পা, দারিক, কিল-পা, করমার, চীন-পা, ডঙরীপাদ, কঙ্কণ ও

গর্ভপাদ। তাঁরা হয় মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, আর তা নয়তো বিদ্যমান গ্রন্থের ওপর টীকা রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত ও অপভ্রংশ—এই উভয় ভাষাতেই তাঁরা তাঁদের গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া, পালরাজাদের সময় বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুণীও মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ রচনা করে যশস্বিনী হয়েছিলেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই সকল বিদুষী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মধ্যে ছিলেন বিলাসবজ্রা, জ্ঞানডাকিনী নিগু, লক্ষ্মীকরা, লীলাবজ্র প্রমুখ।

২২

বাঙলায় সংস্কৃত চর্চার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটেছিল তৃতীয় সেন নৃপতি লক্ষ্মণ-সেনের (১১৭৯-১২০৮) আমলে। যে সকল সংস্কৃত কবি তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর প্রমুখ। জয়দেবই ছিলেন ভারতের শেষ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি। তাঁর রচিত 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে এক অনবদ্য অবদান। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কেন্দুলির এক সুপ্রাচীন গোস্বামী-বংশে জয়দেবের জন্ম। পিতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী দুজনেই ছিলেন পরম ধার্মিক। বহুদিন তাঁদের ছেলেপুলে হয়নি। তারপর দেবতার কাছে সন্তান প্রার্থনা করায়, দেবতা তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এক শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে জয়দেবের জন্ম হয়।

শৈশবেই জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। যথাসময়ে জয়দেবের উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর জয়দেবের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। একদিন গৃহত্যাগ করে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেন। শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে দেবাদিদেব জগন্নাথের চরণে নিজেকে নিবেদিত করেন ও তাঁরই ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকেন। এখানে তিনি মাধবাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাধবাচার্য তাঁকে ব্যাকরণ, ছন্দ ও শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। তারপর জয়দেব আশ্রয় নেন মন্দিরের বাইরে এক গাছতলায়। সকাল-সন্ধ্যায় সমুদ্রে স্নান করে এসে ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন, আর তাঁর সামনে নিজের রচিত বন্দনা-গীতি গান। বৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাতেই সুখে দিন কাটাতে থাকেন। তাঁর অনেক শিষ্য জুটে যায়, তার মধ্যে ছিল সুপায়ক পরাশর।

তখন তাঁর ষোল বছর বয়স। একদিন সন্ধ্যা-আরতির সময় মন্দিরে এসে

উপস্থিত হন এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর রূপসী কন্যা। মেয়েটি এসেছে নববধূবেশে ফুলের মালা হাতে করে, নিজেকে জগন্নাথের সেবায় সমর্পণ করবার জন্য। আগন্তুক ব্রাহ্মণ বাঙালী, নাম বাসুদেব ভট্টাচার্য, নিবাস নদীয়ায় নবগ্রামে। বহুদিন নিঃসন্তান ছিলেন। জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে যদি তাঁর সন্তান হয়, তাকে সমর্পণ করবেন জগন্নাথের সেবায়। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই আজ তিনি এসেছেন জগন্নাথের মন্দিরে।

মেয়েটির নাম পদ্মাবতী। ঠাকুরের সামনে গিয়ে পিতা ও কন্যা পদ্মাবতী দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুরকে প্রণাম করছেন। পিতা বাসুদেব প্রত্যাদেশ শুনলেন—'আমি আমার মানসকন্যা পদ্মাবতীকে গ্রহণ করলাম। কিন্তু তুমি একে নিয়ে মন্দিরের বাইরে যাও। সেখানে আমার পরম ভক্ত জয়দেব আমার ধ্যানে বিভোর হয়ে আছে। তার হাতে তুমি তোমার কন্যাকে সমর্পণ কর।'

বাইরে এসে গরুড়স্তম্ভের সামনে দেখতে পেলেন দিব্যকান্তি জয়দেবকে। ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। ধ্যান ভঙ্গ হলে, বাসুদেব জয়দেবকে বললেন ঠাকুরের প্রত্যাদেশের কথা। জয়দেব বললেন, 'আমি ঠাকুরের এ আদেশ রক্ষা করতে পারব না।' ব্রাহ্মণ যখন জয়দেবকে এ-বিষয়ে অচল অটল দেখলেন, তখন তিনি পদ্মাবতীকে তাঁর সামনে রেখে সরে পড়লেন। জয়দেব সংজ্ঞা হারালেন।

গভীর রাত্রে যখন তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল, জয়দেব তখন দেখলেন যে পদ্মাবতী যুক্তকরে তাঁর সামনে বসে আছে। জয়দেব তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি গেলে না যে?' মেয়েটি উত্তরে বলল—'আমার বাবা যে আপনার হাতে আমাকে সম্প্রদান করে গেলেন। দেবতার আদেশ ও পিতার নির্দেশ অবহেলা করে, আমি তো আপনাকে ত্যাগ করতে পারব না।'

জয়দেব অগত্যা বাধ্য হলেন পদ্মাবতীকে গ্রহণ করতে। সেই থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে তাঁদের ভক্তি ও প্রেম দিয়ে জগন্নাথের আরাধনায় নিজেদের নিযুক্ত রাখলেন। পুরীর রাজা আনন্দদেব মাঝে মাঝে মন্দিরে এসে জয়দেবের গান শুনতেন ও পদ্মাবতীর আরতি দেখতেন।

এরপর পিতামাতার জন্য জয়দেবের মন উতলা হয়ে ওঠে। কেন্দুলিতে তিনি আবার ফিরে আসেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রাধামাধবের বিগ্রহ। তাঁর চরণে নিবেদন করেন জয়দেব নিজেকে ও পদ্মাবতীকে। জয়দেবের গানে এবং পদ্মাবতীর নৃত্যে মুখরিত হয় কেন্দুলির আকাশ-বাতাস। তাঁর কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য

মুগ্ধ করে সমগ্র জগতকে। রাজা লক্ষ্মণসেন সাদরে নিয়ে গেলেন তাঁকে নিজের রাজসভায় সভাকবি হিসাবে।

জয়দেব রচনা করতে লাগলেন তাঁর অমর গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ'। যে-দিন যে সঙ্গীতটি রচিত হয়, স্বামী-স্ত্রীতে সুধাময় কণ্ঠের সুর-তান-লয়ে ও হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবের চরণতলে সমর্পণ করে তবে সাধারণে প্রকাশ করেন।

একদিন কবি লিখেছেন—'ওগো প্রিয়ে, তোমার কুচকুম্ভের উপরে যে মণিহার দুলছে, তার দীপ্তিতে তোমার বুক আলোকিত হয়ে উঠুক। তোমার সঘন-জঘনের মেখলা রতিরঙ্গে মুখরিত হয়ে মন্মথের জয়বার্তা ঘোষণা করুক। স্থল-কমল গঞ্জন আমার হৃদয়রঞ্জন ওগো প্রিয়ে, তুমি আদেশ কর রতিরঙ্গে সুশোভিত তোমার ওই রক্তচরণখানি আমি অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি। মদনের দহনজ্বালায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। অতএব হে প্রিয়ে—'স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্'।" কবি থেমে গেলেন, আর লিখতে পারলেন না। পরমপ্রকৃতি রাধিকার পদযুগলকে তিনি শিরোভূষণ করতে চান। কিন্তু বিশ্ব যাঁর চরণাশ্রিত সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজে কি করে শিরে রাধিকার চরণ স্থাপন করবেন? চিন্তিত মনে জয়দেব গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে গেলেন। পুঁথি খোলা পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে জয়দেব আবার ফিরে এলেন। পদ্মাবতীকে বললেন—আজ আর গঙ্গায় গেলাম না, অজয়ের জলেই স্নানটা সেরে ফেললাম। এই কথা বলে তিনি ঘরে ঢুকে পুঁথিটায় কি লিখলেন। তারপর আহার শেষ করলেন। পদ্মাবতী পদসেবা করে তাঁর ভুক্তাবশেষ অন্নভোজনে নিযুক্ত হল। এমন সময় স্নান সেরে জয়দেব বাড়ি ফিরলেন। জয়দেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে পদ্মাবতী তাঁর ভুক্তাবশেষ ছাড়া খায় না, সে আজ তাঁর আগেই খেতে বসেছে। এদিকে, পদ্মাবতীও স্বামীকে আবার ফিরতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। পরস্পর পরস্পরের কথা শুনে সংশয়াচ্ছন্ন হলেন। ঘরে গিয়ে দেখেন তাঁর অসমাপ্ত পাদপূরণ হয়ে গিয়েছে। লেখা রয়েছে—'দেহি পদপল্লবমুদারম্'। বুঝতে কারুর বাকী রইল না যে, তাঁদের প্রাণের ঠাকুর নিজে এসেই লিখে দিয়ে গেছেন—'দেহি পদপল্লব-মুদারম্।' জয়দেব বললেন—"পদ্মা, তুমিই ধন্যা, তুমিই সৌভাগ্যবতী, তোমার স্বামীর রূপ ধরে পরমপুরুষ আজ তোমাকে দেখা দিয়ে গিয়েছেন। আর তুমি তাঁর পদসেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছ। আমিই অভাজন, তাই তাঁকে

দর্শন করতে পারলাম না।"

এর কিছুদিন পরে সাধক-দম্পতি তাঁদের প্রাণের ঠাকুর রাধামাধবকে নিয়ে বৃন্দাবন যান। 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে' তাঁরা তাঁদের বসতি স্থাপন করেন। জয়দেব ও পদ্মাবতীর কণ্ঠে গীতগোবিন্দ কীর্তন বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলল।

তারপর একদিন তাঁর প্রাণের ঠাকুরের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন জয়দেব। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভক্তের প্রাণবায়ু ভগবানের প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিশে গেল। স্বামীকে অনুসরণ করে পদ্মাবতীও অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন রাধারানীর দিকে। তাঁর প্রাণবায়ুও পরমা প্রকৃতির প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিশে গেল।

জয়দেবের মৃত্যুর পর তাঁর পূজিত রাধামাধব মূর্তিটি বহুদিন কেশীঘাটের মন্দিরে অবস্থিত ছিল। মন্দিরটি জীর্ণ হলে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ভ্রমরঘাটের ওপর নূতন রাধামাধব মন্দির নির্মাণ করে দেন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যখন হিন্দুর মন্দির ও দেবদেবীর ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন জয়পুরের মহারাজা বৃন্দাবনের অন্যান্য বিগ্রহের সঙ্গে রাধামাধবকে জয়পুরে নিয়ে যান। জয়দেবের রাধামাধব এখনও সেখানে বিরাজ করছেন। বৃন্দাবনে এখন মাত্র প্রতিনিধি বিগ্রহ আছে। (কেন্দুলির বিগ্রহ ও মন্দির সম্বন্ধে 'ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ' অধ্যায় দেখুন)।

পাঁচ

বাঙলাদেশে রচিত হিন্দু যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হল। এবার ওই যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ওই যুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন হচ্ছে 'চর্যাগীতি' বা চর্যাগান। এগুলি বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীদের সাধন-ভজনের গান। এগুলি আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে। তিনি চারখানা পুঁথি প্রকাশ করেছিলেন। এগুলির নাম হচ্ছে—'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরোহবজ্রের 'দোহাগান', কাহ্ন-পাদের 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব'। কারও কারও মতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুঁথিখানির যথার্থ নাম 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'। পুঁথিগুলির ভাষা যে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সূক্ষ্ম বিচারে

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একে 'অবহট্ঠ' ভাষা বলেছেন। পুঁথির গানগুলিতে এমন অনেক শব্দ আছে যা বর্তমান কালেও বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে। যেমন—'জান', 'নিল', 'গেল', 'রাতি', 'দুই', 'ঘরে', 'করি', 'বিছু', 'মাঝে', 'চড়িল,' 'ছাড়ি', ইত্যাদি। গানগুলি 'সন্ধাভাষা'য় রচিত বলা হয়। তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, সন্ধাভাষা কোন ভাষার নাম নয়। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সংস্কৃত-অবহট্ট-বাংলা রচনায় অবলম্বিত বিশিষ্ট রীতির নাম 'সন্ধা'। এই রীতিতে শব্দের বাচ্যার্থের এক অর্থ, গুহ্যার্থের আর এক অর্থ। শব্দের গুহ্যার্থের সাহায্যে সাধকেরা সাধন-পদ্ধতির নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করেছেন।

চর্যাগানগুলিতে ব্যবহৃত রূপক প্রতিভাসের ভিতর দিয়ে তদানীন্তন বাঙালী জনজীবনের যে নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে তার একটা পরিচয় দিয়েছেন জাহ্নবী-কুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের নানা উপকরণ এতে ছড়ানো রয়েছে। অষ্টম-নবম শতাব্দের তাম্রপট্টলিপিতে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-এ এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের যে উপাদান পাওয়া যায়, চর্যাগানের ঐতিহাসিক চিত্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। সেজন্য মনে করা হয় যে, চর্যা-গানগুলির উদ্ভব ওই যুগেই ঘটেছিল। উপরন্তু চর্যাগীতিতে আছে নতুনতর উপকরণ। চর্যাগীতিতে আমরা যে সমাজ-গড়নের পরিচয় পাই, তা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যসমাজেরই গড়ন। সে সমাজের উচ্চকোটিতে রয়েছেন বটুব্রাহ্মণ; নিম্ন-কোটিতে ডোম-চণ্ডাল, মধ্যে উত্তম ও অধম শূদ্র। আর বর্ণসমাজ থেকে দূরে রয়েছে অরণ্যবাসী শবর-নিষাদ। তবু চর্যায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নানা প্রসঙ্গে নিম্ন-শ্রেণীর কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে।...চর্যাগীতি কর্মবহুল সাধারণ জীবনের বিচিত্র চিত্রশালা। চর্যাগানে যে অভিজাত বা ঐশ্বর্যবান মানুষের প্রসঙ্গ নেই, তা নয়। দেশে ধনবান লোক ছিলেন, তাঁরা কেউ ছিলেন পণ্যপাটনের মালিক, কারও সঞ্চয় চতুকোটি মুদ্রার ভাণ্ডার—সোনারূপায় সম্পন্ন ত ছিলই। কিন্তু সময়ে সময়ে দস্যুরা এমন ধনীকে নিঃস্ব করে ফেলত।...চর্যাগীতিতে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে সাধারণ জীবনেরই ছবি। সে জীবন সুখে-দুঃখে, আশা-নিরাশায় করুণ-মধুর। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, বধূ নিয়ে বাঙালীর যৌথ পরিবার। কখনও পরিবারে জালিকারও স্থানও হত। কার্পাসবস্ত্র পরে, মোটা ভাত খেয়ে জীবন মোটামুটি সুখেই কাটত। কিন্তু দুঃখের বোঝাও বাঙালীকে বইতে হত। একটি গীতে বলা হয়েছে 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী'। এ দুঃখের হাহাকার

বুঝি অভাবপীড়িত বাঙালী জীবনের একটি অতি সাধারণ মর্মান্তিক সুর। চর্যা-গানে এই দুঃখ-গভীর নারী চায় ঘরমুখী স্বামী, ঘরমুখী সন্তান। কিন্তু যা সে চায় তা সে পায় না। স্বামী হয় বেকার উদাসীন, সন্তান হয় 'বাবুরা' (বাউল)। এ দুঃখের কী শেষ আছে ? তখন গভীর দুঃখেই শ্লেষকঠিন হয় কণ্ঠ—আমার নব যৌবন সার্থক হল—'নব জৌবন মোর ভইলেসি পূরা।' তবে নারীচরিত্র সর্বত্র সাধ্বীর চরিত্র হত না। বধূর শীলখণ্ডন ঘটত। কেউ বাইরের উঠানকেই ঘর মনে করত। দিনের বেলায় যে বৌ নিজের দেহছায়া দেখে ভয় পেত, রাত্রিতে তার কামরূপে অভিসার—'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ। / রাত্তি ভইলে কামরু জাঅ।' পুরুষচরিত্রও সুস্থির ছিল না। পরকীয়া নারীর অধরামৃত পুরুষভুজঙ্গের পক্ষে কমল-রস। আর একটি ঘটনাও গৃহ-জীবনে ঘটত—তা গৃহবন্ধন ছিন্ন করে পুরুষের কপালী-ব্রত-গ্রহণ। শাশুড়ী, ননদ, শ্যালিকা ও মায়ের মায়াবন্ধন কেটে পুরুষ কপালী হয়ে যেত—'সাসুরি নাসু ননদ ঘরে শালী। / মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী।' চর্যাগানের আরও দু-একটি নমুনা—'গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই। / তহি বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করই।'

চর্যাগীত সম্বন্ধে ডঃ নীলরতন সেন একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। তিনিও বলেছেন : 'চর্যাগীতের মধ্যে তখনকার দেশ-কাল-সমাজের নানা তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয় গ্রামীণ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য -ভিত্তিক একটি সমাজ পরিবেশ গীতগুলিতে বেশ ধরা পড়েছে। গ্রামগুলি বেশীর ভাগই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। সেখানে যাতায়াতের মুখ্য বাহন ছিল নৌকা, কাঠের সাঁকোতেও পারাপার চলত। নৌকার হাল-বৈঠা, গলুই, পাল, গুণ, নোঙর করবার খুঁটি, জল সেঁচবার সেঁউতি প্রভৃতির বিশদ নাম-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কুলীনজনেরা,—অর্থাৎ উঁচুবর্ণের লোকেরা গাঁয়ের কেন্দ্রে বাস করতেন। ডোম, চণ্ডাল—এরা গাঁয়ের প্রান্তে, পাহাড়ি টিলায় বাস করত। পাহাড়ের গায়ে ত্রিতল বাড়ির বর্ণনা রয়েছে। কৃষিকর্ম ছাড়া, নৌকা বাওয়া, তাঁত বোনা, ধুনুরির কাজ, ডালা-কুলো তৈরী, হরিণ শিকার, কাঠুরিয়ার ও ছুতোরের কাজ, নৌকাপথে সোনা-রুপোর ব্যবসা-বাণিজ্য,—এসবের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে নৃত্যগীত, মদ চোলাই ও বিক্রয় এমনকি বারাঙ্গনাবৃত্তির প্রচলন ছিল। সম্রান্ত লোকদের বেশ বিষয়-আশয় থাকত। ঘরে সোনারূপা গয়নাগাঁটি থাকবার ফলে চোর-ডাকাতের উপদ্রবও হত। অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারে দুবেলা খাবার জুটত

না। যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ছাড়া, শ্বশুর, ননদ, শ্যালিকা এক পরিবারে বসবাস করতেন। অল্পবয়সী বধূ তাদের একদিকে ভয় করতেন, অন্যদিকে রাতের আঁধারে অভিসারেও যেতেন। চোর-ডাকাত ছিল বলেই গৃহস্থকে তালাচাবির ব্যবহার শিখতে হয়েছিল। গৃহস্থেরা যেসব তৈজসপত্র ব্যবহার করতেন তার কিছু কিছু নাম পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, ভাতের হাঁড়ি, দুধ দুইবার পীঠা, জল আনবার (বা মদ রাখবার) ঘড়া, ঘড়ী, আরও ক্ষুদ্র মাপের ঘড়ুলি। কাঠুরেদের কুঠার, টাঙ্গী, কৃষকদের নখলি (মাটি খুঁড়বার খোন্তা) ইত্যাদি। মেয়েরা গয়না পরতেন নূপুর, কঙ্কন, মুক্তার হার, কুণ্ডল, কানেট (কর্ণাভরণ) ইত্যাদি। প্রসাধনে সুন্দরীদের দর্পণ প্রয়োজন হত। কর্পূর-সুবাসিত পান খাবার বিলাসিতা ছিল। খাটে পরিপাটি বিছানা পেতে ওরা শয়ন করতেন। গোঁড়া সনাতনী হিন্দুরা আগম, বেদ, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতেন, কোশাকুশি নিয়ে পূজা করতেন। ইষ্টমালা জপ করতেন। দীর্ঘজীবন লাভের জন্য রস-রসায়নের ব্যবহার করা হত। এসব নিয়ে বৌদ্ধরা হিন্দুদের বিদ্রূপ করেছেন। কাপালিকদের মধ্যে তন্ত্রসাধনের নানা কদাচারও চলত। কৃষ্ণা-চার্যের একটি গীতে বিয়ের যে ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে বেশ ধুমধাম হত মনে হচ্ছে। নানা বাদ্য বাজিয়ে, শোভাযাত্রা করে বর বিয়েতে চলেছেন। বিয়েতে যৌতুকও দেওয়া হত। নাচ-গানে করণ্ড, কসালা, লাউয়ের একতারা, মাদল, দুন্দুভি, বীণা—এসবের ব্যবহার হত। কৃষ্ণাচার্য 'নয়বল' নামে দাবাখেলার ছবি দিয়েছেন। কুঁড়েঘর এবং 'তইলা বাড়ি' (ত্রিতল গৃহ) দুয়েরই উল্লেখ থেকে সেকালের আর্থিক শ্রেণী-বৈষম্যের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। ধনী ব্যক্তিরা বোধ হয় শখ করে হাতি পুষতেন। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাই-বলদের নাম মিলছে। বন্য পশুপাখির মধ্যে সিংহ, হাতি, হরিণ, শিয়াল, খরগোশ, ইঁদুর, সাপ, কাক, ময়ূর, কুমীর এদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ইঁদুর ধান নষ্ট করত। ফল-ফুলের নাম কম ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্ম বা কমল বিশেষ পারিভাষিক অর্থে এসেছে; কাপাস ফুলের উল্লেখ দেখছি একটা গীতে। 'কঙ্গুচিনা' ফল ঠিক কি বস্তু বলা যাচ্ছে না। তবে শবর-শবরী এ ফল পাকলে আনন্দে মেতে উঠত। বোধ করি কোনো নেশা ধরানো প্রিয় খাদ্য ছিল। উঁচু সমাজে নারীদের সতীত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হত, পুরুষরা কিছুটা চারিত্রিক শৈথিল্য দেখাতেন মনে হয়। 'নগর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামের সঙ্গে পার্থক্য ছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। মদ্য

পান চলত। শুঁড়ি মেয়েরা গাছের ছালের সাহায্যে চোলাই করে মদ বেচতেন। কৃষ্ণাচার্য একটি গীতে (১৮ নং) 'কুলীনজনের' উল্লেখ করেছেন। চর্যাগীতে বঙ্গাল, বঙ্গালী, বঙ্গ—শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। ভুসুকু বঙ্গদেশের চণ্ডালীকে বিয়ে করে বঙ্গালী হলেন। তাতে আত্মীয়েরা তাকে সম্পত্তি থেকে বোধ হয় বঞ্চিত করেছিল, ৪৯ নং গীতে তার আভাস আছে। বঙ্গাল রাগ একাধিক গীতে ব্যবহৃত হয়েছে। চর্যাগীতে নদী হিসাবে গঙ্গা, যমুনার নাম করা হয়েছে। পদ্মাকে খাল বলা হয়েছে।

চর্যাগানগুলি থেকে আমরা তৎকালীন বাঙলার আর্থিক জীবনেরও একটা ছবি পাই। নৌকার ব্যাপক প্রসঙ্গ প্রমাণ করে যে তখন নৌবাণিজ্যের প্রসার ছিল। বণিকবৃত্তিও প্রচলিত ছিল। নৌকা শুধু নদী পারাপার করত না, সোনায় ভরা নিয়ে সীমাহীন নদীপথে যাত্রা করত। নৌকার ব্যাপক প্রসঙ্গ থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে সূত্রধর, কর্মকার প্রভৃতি বৃত্তির বেশ ব্যাপক প্রচলন ছিল।

মঠ-মন্দির ও শিল্পপ্রতিভা

মঠ-মন্দির, স্তূপ ও বিহার, মূর্তি ও মন্দির-অলংকরণ—এসব নিয়েই বাঙলার স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ইতিহাস। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আছে যে যদিও বাঙলাদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তা হলেও তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আর্যসমাজের লোকরা বাঙলাদেশে আসত। তীর্থস্থান বললেই আমরা দেবস্থান বুঝি। দেবস্থানের বৈশিষ্ট্য, সেখানে মন্দির বা দেবায়তন থাকা। সুতরাং বাঙলাদেশে প্রাক্-আর্য-কাল থেকেই যে মন্দির বা দেবায়তন ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারপর ভগবান বুদ্ধের তিরোভাবের পর তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের অনুগামীরা বহু চৈত্য, স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করেছিল। স্তূপগুলি ভগবানের উপস্থিতির প্রতীকরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেত। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে সম্রাট অশোক তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যে আশী হাজার স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এবং যেহেতু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় থেকেই বাঙলা মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল সেহেতু আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি বাঙলাদেশেও এরূপ বহু স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মণি নদীর (পূর্ব নাম লালুয়া গাঙ) উত্তরে দুটি মঠবাড়ি, প্রাচীন দুর্গের দেওয়াল, বাঁধানো পথ, শিলালিপি, স্বর্ণমুদ্রা, বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য মৌর্য-উত্তর যুগের এক সুমহান সভ্যতার নিদর্শন অনাবৃত করেছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, সপ্তম শতাব্দীতে উয়াং চুয়াঙ (৬৪৪ খ্রীস্টাব্দ) ও ই-চিং (৬৭৩ খ্রীস্টাব্দ) বাঙলা দেশে বহু স্তূপ ও বিহার দেখেছিলেন। তার পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী বাঙলাদেশ গুপ্তসম্রাটগণের অধীন ছিল। গুপ্তসম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসারে বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের আমলে বাঙলাদেশে যে বহু হিন্দুর দেবমন্দির নির্মিত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে সেনরাজগণের আমলেও হিন্দুর বহু দেব-দেউল নির্মিত হয়েছিল। সম্প্রতি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বামুনপুকুর গ্রামে বল্লালঢিবি নামে সেন-যুগের এক বিরাট 'পঞ্চরথ' মন্দির 'কমপ্লেকস্'-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তার আগে পালরাজগণের চারশত বৎসরব্যাপী শাসনকালে

বৌদ্ধধর্ম বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বহু স্তূপ ও বিহার নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বাঙলায় মঠ-মন্দির ও স্তূপ-বিহারের এরূপ সুমহান ইতিহাস থাকলেও এর নিদর্শন খুব বিরল। প্রায় সবই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ, বাঙলা যখন ১২০৪ খ্রীস্টাব্দের পর মুসলমান অধিকারে যায়, তারা ধর্মদ্বেষের বশীভূত হয়ে এদেশের দেব-দেউল সবই বিনষ্ট করেছিল। ওই সব বিনষ্ট দেব-দেউলের উপাদান দিয়ে তারা মসজিদ নির্মাণ করেছিল। মুসলমান আমলে নির্মিত বহু মসজিদ এর সাক্ষ্য বহন করছে। (পরে দেখুন)

দুই

বড় স্তূপগুলি বিনষ্ট হলেও মুসলমানদের ধর্মদ্বেষের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে ক্ষুদ্রকায় স্তূপগুলি। দরিদ্র ভক্তগণ যারা দেবতার নিকট 'মানত' করত যে তাদের বিশেষ প্রার্থনা বা অভিলাষ পূর্ণ হলে তারা স্তূপ নির্মাণ করে দেবে, অথচ সঙ্গতিতে কুলাত না বড় স্তূপ নির্মাণ করিয়ে দেবার, তারাই এরূপ ক্ষুদ্রকায় স্তূপ নির্মাণ করে ঠাকুরের কাছে উৎসর্গ করত। এরূপ ক্ষুদ্রকায় স্তূপের বোধ হয় সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে ঢাকা জেলার আসরফপুর গ্রামে রাজা দেবখড়্গের তাম্রশাসনের সঙ্গে যে ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতুনির্মিত স্তূপটি পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুরে ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঝেওয়ারিতেও সেরূপ ধাতুনির্মিত স্তূপ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া পাহাড়পুর ও বাঁকুড়ার বহুলাড়াতেও ইষ্টক নির্মিত বহু স্তূপের অধোভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে। যোগী-গুম্ফা নামক স্থানে এরূপ পাথরের তৈরী ক্ষুদ্রকায় স্তূপ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বৃহদাকায় কোন স্তূপের নিদর্শন আমরা পাইনি। তবে বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথিতে আমরা বরেন্দ্রের মৃগস্থাপন স্তূপের ও তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান স্তূপ-এর চিত্র পাই।

তিন

বিহারগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। চৈনিক পরিব্রাজকদের কাহিনী থেকে আমরা বাঙলাদেশের বহু বিহারের সংবাদ পাই। তবে সেসব বিহারের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেগুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি থেকেই আমরা ওইসব বিহারের আকার-প্রকার সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। এরূপ এক বিশালকায় বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত

হয়েছে। খুব সম্ভবত পালসম্রাট ধর্মপাল অষ্টম শতাব্দীতে 'সোমপুর বিহার' নামে যে বিখ্যাত বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন এটি তারই ধ্বংসাবশেষ, যদিও এক তাম্রশাসন থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এখানে এক জৈন বিহার ছিল। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত এই বিরাট বিহারের অঙ্গনটি প্রতি দিকে ৬০০ হাত দীর্ঘ ছিল। এতে ১৩ ফুট করে দীর্ঘ ১৭৭টি কক্ষ ছিল। অঙ্গনটির মাঝখানে এক প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। ভারতে আজ পর্যন্ত যত বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সোমপুর বিহারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

কুমিল্লার কাছে ময়নামতী নামে যে ছোট ছোট পাহাড় আছে, তার ওপরেও কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। মালদহ জেলার জগদ্দলেও একটি মহাবিহার ছিল।

চার

বাঙলার প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। মাত্র কয়েকটি বৌদ্ধ-গ্রন্থের পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্র ও কতকগুলি প্রস্তরমূর্তিতে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতি থেকেই আমরা প্রাচীন বাঙলার মন্দিরসমূহের গঠনরীতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। মন্দিরগুলি সাধারণত সেই রীতিতে নির্মিত হত, ওড়িশায় যা 'ভদ্র' ও 'রেখ' মন্দির নামে অভিহিত হয়। কোন কোন জায়গায় এই সকল মন্দিরের মাথায় একটি করে স্তূপ স্থাপন করে আরও তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির নির্মাণ করা হত।

আবিষ্কৃত মন্দির খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। বাঁকুড়ার একেশ্বর মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর যে ছোট মন্দিরটি আছে, তা 'ভদ্র' রীতিতে গঠিত মন্দিরের একমাত্র নিদর্শন। বর্ধমান জেলার বরাকরে ও বাঁকুড়ার দেহারের মন্দির 'রেখ' রীতিতে নির্মিত মন্দিরের নিদর্শন। এই মন্দিরগুলি হয় পাথরের, আর তা নয় তো ইটের তৈরী। ইটের তৈরী মন্দিরের নিদর্শন বর্ধমানের দেউলিয়ার মন্দির, বাঁকুড়ার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির ও সুন্দরবনের জটার দেউল। আর পাথরের তৈরী মন্দিরের নিদর্শন বাঁকুড়ার দেহারের সর্বেশ্বর ও সল্লেশ্বরের মন্দির। পাহাড়-পুরের অঙ্গনের মধ্যে যে বিশাল মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ঊর্ধ্বভাগ বিলুপ্ত হওয়ায় ওটি ঠিক কোন্ শ্রেণীর মন্দির তা বলা কঠিন। বড় বড় মন্দিরের অনুকরণে ছোট ছোট মন্দিরও নির্মিত হত। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নিমদীঘি

ও দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ে এরূপ প্রস্তরনির্মিত ও চট্টগ্রামের ঝেওয়ারিতে ব্রোঞ্জনির্মিত এরূপ ক্ষুদ্রকায় মন্দির পাওয়া গিয়েছে। শেষোক্ত মন্দিরটি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। এখানে উল্লিখিত বাণগড়ে অনেক কাম্বোজ রাজার লিপিযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভ ও পালরাজ তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের লেখযুক্ত সদা-শিবের প্রস্তরনির্মিত মূর্তি এবং পোড়ামাটির গণেশমূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া মৌর্য-শুঙ্গ-কুশান-গুপ্তযুগের ইষ্টক নির্মিত বাস্তগৃহ, দেবমন্দির, দুর্গপ্রাচীর, গৃহপ্রাচীর, শস্যাগার, রক্ষিগৃহ, ভূগর্ভস্থিত সুরঙ্গ, জলাগার, কূপ প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে, যা ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের মনোরম নিদর্শন। বাণগড়কে অসুররাজ বলির পুত্র বাণের রাজধানী বলা হয়। ইহা দেবীকোট ও কোটিবর্ষের সহিত অভিন্ন।

পাঁচ

ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে বাঙলার বহুস্থানে নানা দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। গোড়ার দিকের মূর্তিগুলি অধিকাংশই পোড়ামাটির মূর্তি। মৌর্যযুগের এরূপ পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গিয়েছে মহাস্থানগড়ে। শুঙ্গযুগের যক্ষিণীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে বাঁকুড়ার চন্দ্রবর্মার রাজধানী পুষ্করণায় ও মেদিনীপুরের তাম্র-লিপ্তিতে। কলকাতার নিকটবর্তী চন্দ্রকেতুগড় বা বেড়াচাঁপায় প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি ও মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রামের বিষ্ণুমূর্তিটি কুশানযুগের ঢঙে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুন্দরবনের কাশীপুর ও বগুড়ার দেওরায় প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি দুটি গুপ্তযুগের শিল্পরীতি অনুযায়ী গঠিত। অনুরূপভাবে গুপ্তযুগের আদর্শে গঠিত মহাস্থানের নিকট বলাইধাপভিটায় প্রাপ্ত সোনার পাতে ঢাকা অষ্টধাতুনির্মিত একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি। তবে মূর্তিগঠনে বাঙালীর নিজস্ব শিল্পরীতির একটা বিবর্তন পাওয়া যায়। এর আভাস আমরা পাই দেবখড়্গের রানী প্রভাবতীর লিপিযুক্ত সর্বাণীর ধাতুনির্মিত এক মূর্তিতে ও তার সঙ্গে প্রাপ্ত এক ক্ষুদ্র সূর্যমূর্তিতে ও চব্বিশ পরগনার মন্দির-হাটে প্রাপ্ত ধাতুনির্মিত এক শিবমূর্তিতে। এ মূর্তিগুলি পালযুগের শিল্পরীতির লক্ষণ সূচনা করে।

[illegible]

প্রায় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবল প্রতাপশালী পালরাজাদের আমলে বাঙলাদেশে ভাস্কর্যের এক নূতন ধারা গড়ে উঠেছিল। মূলগতভাবে এই নূতন

ঘরানা গুপ্তযুগের সারনাথ-ঘরানা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। উত্তরবাঙলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত কয়েকটি ভাস্কর্য উভয় যুগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। যদিও গুপ্তযুগের সারনাথ-ঘরানার সঙ্গে বাঙলা ভাস্কর্যের এই ঘরানা সংযুক্ত ছিল, তথাপি উন্নত অবস্থায় এই ঘরানার এক নিজস্ব স্বকীয়তা ছিল। সেজন্য বাঙলার এই ঘরানাকে ভারতীয় ভাস্কর্যের 'প্রাচ্যদেশীয় ঘরানা' বলা হয়। প্রাচ্যদেশীয় ঘরানার ভাস্কর্যগুলি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই উভয় ধর্মের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল।

বাঙলায় বৌদ্ধ ভাস্কর্যের উদ্ভব হয়েছিল তখন, যখন বাঙলাদেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল। যে সকল মূর্তি এ যুগের ভাস্করেরা নির্মাণ করেছিলেন, সেগুলির বর্ণনা আমরা বৌদ্ধ 'সাধনমালা' গ্রন্থসমূহে পাই। বৌদ্ধ পুরুষ-দেবতামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল নানাশ্রেণীর বোধিসত্ত্ব মূর্তি, যথা—লোকনাথ, মৈত্রেয়ী, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি। বৌদ্ধ দেবী বা শক্তিমূর্তির মধ্যে আমরা দেখি তারা, মারীচি, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি। এছাড়া, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য—এই উভয় ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি মূর্তি আমরা পাই, যেমন—কুবের, সরস্বতী ও গণেশ মূর্তি।

প্রাচ্যদেশীয় ঘরানার ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত মূর্তিসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(১) বৈষ্ণব, (২) শৈব ও (৩) বিবিধ। বিষ্ণুমূর্তি বাঙলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই সকল মূর্তির অধিকাংশই একাদশ শতাব্দীর। তা থেকে বোঝা যায় যে, ওই সময় বিষ্ণুর আরাধনা বাঙলাদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মূর্তি-সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহে নানা ধরনের বিষ্ণুমূর্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু বাঙলাদেশে যে সকল বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশই বাসুদেবশ্রেণীর। চারিহস্ত-বিশিষ্ট এই সকল মূর্তির দক্ষিণের উপর হস্তে আছে গদা ও নিম্নহস্তে চক্র এবং বামের উপর হস্তে আছে চক্র ও নিম্নহস্তে শঙ্খ। কতকগুলি মূর্তির পৃষ্ঠদেশের পাথরফলকের ওপর অঙ্কিত আছে বিষ্ণুর দশাবতারের দৃশ্য। এ ছাড়া বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি স্বতন্ত্রভাবেও পাওয়া গিয়েছে, বিশেষ করে বরাহ, নরসিংহ ও বামন-অবতার মূর্তি। রাজশাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি মূর্তিতে বিষ্ণুকে গরুড়ের উপর আসীন অবস্থায় দেখা যায়। এই মূর্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এর দ্বারা প্রকাশ পায় যে বাঙলার শিল্পীরা মূর্তিগঠন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান পরিহার করে স্বভাবসুলভ প্রকাশভঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বাঙলার একশ্রেণীর বৈষ্ণব মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই সকল মূর্তিতে শয্যাশায়ী এক নারীমূর্তির বুকের কাছে এক শিশুকে দেখানো হয়েছে

এবং শয্যার নিচে নানারূপ অর্ঘ্য, উভয় পার্শ্বে নারীমূর্তি ও পৃষ্ঠফলকে নানা দেবতার মূর্তিও খোদিত হয়েছে।

প্রাচ্যদেশীয় শিল্পে শিবমূর্তি কেবল যে লিঙ্গাকারে দেখানো হয়েছে, তা নয়। শিবের বিরূপাক্ষ, তাণ্ডব, ভৈরব প্রভৃতি রূপও দেখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে পার্বতীর মূর্তি, দুর্গামহিষমর্দিনী, চণ্ডী ও অর্ধনারীশ্বররূপে নির্মিত হত। এ ছাড়া আর যেসব দেবীমূর্তি আমরা পাই, তার অন্যতম হচ্ছে সপ্তমাতৃকা, বৈষ্ণবী, কার্তিকেয়ানী, মহেশ্বরী, ইন্দ্রাণী, বরদা, চামুণ্ডা ও গণেশ শক্তি।

কলকাতার পূরণচাঁদ নাহারের সংগ্রহশালায় দৃষ্ট এক বিচিত্র শৈব মূর্তির উল্লেখ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় করেছিলেন। মূর্তিটিতে দেখানো হয়েছে এক শায়িত নারীমূর্তির কোলের কাছে এক শিশু এবং শয্যার মাথার দিকে একটি শিবলিঙ্গ। মনে হয়, এখানে শিল্পী ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত এক উপাখ্যান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। এই উপাখ্যান অনুযায়ী উমা তাঁর স্বামীকে চিনতে পারেন কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য শিব শিশুরূপে উমার শয্যা'পরি তাঁর কোলের কাছে শায়িত হয়েছিলেন, কিন্তু উমা তাঁকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যে সকল মূর্তি বাঙলাদেশের ভাস্কর্যশিল্পে পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে সূর্য, গণেশ, ব্রহ্মা, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও মনসা মূর্তি।

বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস

অতি প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে কিংবদন্তী। এই সকল কিংবদন্তী নিবদ্ধ আছে নানা গ্রন্থে—দেশীয় ও বিদেশীয়। শ্রীলঙ্কার 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ' নামে দুইটি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশের বঙ্গনগরে এক রাজা ছিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের এক অতি সুশ্রী কন্যা হয়; কিন্তু সে অত্যন্ত দুষ্টা ছিল। সে একবার পালিয়ে গিয়ে মগধ-যাত্রী এক বণিকের দলে ঢুকে যায়। তারা যখন বাঙলার সীমানায় উপস্থিত হয়, তখন এক সিংহ তাদের আক্রমণ করে। বণিকেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু রাজকন্যা সিংহকে তুষ্ট করে তাকে বিবাহ করে। (মনে হয়, এখানে আক্ষরিক অর্থে 'সিংহ' না ধরে, সিংভূম জেলার 'সিংহ' উপাধিধারী কোন উপজাতীয়কে ধরে নিলে, এর অর্থ খুব সরল হয়ে যায়)। ওই সিংহের ঔরসে তার গর্ভে সিংহবাহু নামে এক পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। সিংহবাহু বড় হয়ে সিংহকে হত্যা করে ও নিজ ভগ্নীকে বিবাহ করে। (প্রাচীন ভারতে ভগ্নী-বিবাহ সম্বন্ধে লেখকের 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' ও 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' গ্রন্থদ্বয় দেখুন)। পরে রাঢ়দেশে সে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সিংহবাহুর অনেকগুলি পুত্রসন্তান হয়। প্রথম দুটির নাম বিজয় ও সুমিত্র। বিজয় দুর্বিনীত ও অত্যাচারী ছিল। তার দুর্ব্যবহারে রাঢ়বাসিগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে রাজা সাত শত অনুচরের সঙ্গে বিজয়কে এক নৌকা করে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেন। বিজয় প্রথমে সুপ্পরাক নগরে (আধুনিক ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ সোপারা নগরী) যায়, কিন্তু সেখানে অত্যাচার শুরু করলে সেখানকার লোকেরা তাকে তাড়া করে। তখন বিজয় নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপে এসে উপস্থিত হয় এবং কুবেণী নামে এক যক্ষিণীকে বিবাহ করে শ্রীলঙ্কায় এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। যে দিন বিজয় লঙ্কাদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়, সেদিনই কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের মহানির্বাণ ঘটেছিল ৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। সুতরাং সেটাই বিজয়ের শ্রীলঙ্কায় অবতরণের তারিখ।

প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের আরও দুটি রাজ্যের কথা আমরা জাতক গ্রন্থসমূহে পাই।

এ দুটি হচ্ছে শিবি ও চেতরাষ্ট্র। অধ্যাপক অবনীকুমার চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন যে, শিবিরাজ্য ছিল বর্ধমান বিভাগে। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তরনগরে (বর্তমানে মঙ্গলকোট)। তখন দামোদর নদের নাম ছিল কণ্টিকার নদী। রূপনারায়ণের নাম ছিল কেতুমতী নদী। কেতুমতীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল চেতরাজ্য (বর্তমান ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া পরগনা)। তার রাজধানী ছিল চেতা। চেতরাজ্যের পশ্চিমে ছিল বনভাগ ও পূর্বে ছিল 'প্রত্যন্ত' প্রদেশ ছল্‌লিতত্‌ত। এর দক্ষিণে ছিল কলিঙ্গ রাজ্য, বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। শিবি ও চেতরাজ্যের পূর্বসীমায় ছিল ভাগীরথী। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে শিবি এবং চেতরাষ্ট্রদ্বয়কে 'মহাজনপদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং এ দুটি রাষ্ট্র যে তৎকালীন ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আরও যে সকল দেশীয় গ্রন্থে প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্পর্কে কিংবদন্তী নিবদ্ধ আছে, তাদের অন্যতম হচ্ছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে যে সময়েই রচিত হোক না কেন, এগুলির মধ্যে নিবদ্ধ কাহিনীসমূহ যে এগুলির রচনাকালের বহুপূর্বেই প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (এখানে স্মরণীয় যে, মহাভারতের শান্তিপর্বে 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং' বাক্যটি আছে)। আমরা অসুর-রাজা বলির কথা আগেই বলেছি। তাঁর ক্ষেত্রজ সন্তানসমূহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম জাতিসমূহ। মহাভারত থেকেই আমরা আরও জানতে পারি বাঙলার তিনজন রাজার কথা। তাঁরা হচ্ছেন পুণ্ড্রের রাজা বাসুদেব। (ইনি কিরাতদেশেরও রাজা ছিলেন), বঙ্গের রাজা সমুদ্রসেন ও সুহ্মের এক অনামী রাজা।

আলেকজাণ্ডার (৩২৫-৩২৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) গঙ্গারিডি রাজ্যের কথা শুনে-ছিলেন। তার মানে আলেকজাণ্ডারের সময় পর্যন্ত বাঙলা স্বাধীন ছিল। এর অনতিকাল পরেই বাঙলা তার স্বাধীনতা হারায়। কেননা, মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, উত্তরবাঙলা মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কারণ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত পুণ্ড্রবর্ধন নগরে এক কর্মচারীকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। মনে হয়, এই সময় থেকেই আর্যসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বাঙলাদেশে ঘটেছিল। 'মনুসংহিতা' রচনাকালে (২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীস্টাব্দের

মধ্যে) বাঙলাদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হত। কুশাণসম্রাটগণের মুদ্রাও বাঙলার অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাঙলা-দেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শুশুনিয়া পাহাড়ের অভিলেখ থেকে আমরা জানি যে এ সময় পুষ্করণায় (বাঁকুড়া জেলায়) চন্দ্রবর্মা (আনুমানিক ৩৪০–৩৫০ খ্রীস্টাব্দে) নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। পরে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বাঙলা গুপ্তরাজগণের অধীন ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলাদেশ আবার স্বাধীনতা লাভ করে। কোটালি-পাড়ার পাঁচখানা ও বর্ধমানের মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে এই সময় গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন স্বাধীন রাজা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। গোপচন্দ্র ওড়িশারও এক অংশ অধিকার করেন। তাঁরা শক্তিশালী রাজা ছিলেন। দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ তাঁদের অধীন ছিল। এর অনতিকাল পরে বাঙলাদেশের রাজা শশাঙ্ক (৬০৬–৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ) পশ্চিমে কান্যকুব্জ ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি কামরূপ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন ও উত্তরপ্রদেশের মৌখরিদের দমন করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) তাঁর রাজধানী ছিল। উয়াং চুয়াং পরিদৃষ্ট রক্তমৃত্তিকা বিহার এখানেই অবস্থিত ছিল।

'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' থেকে আমরা জানতে পারি যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানব মাত্র আটমাস পাঁচদিন সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে উয়াং চুয়াঙ এদেশে আসেন। তখন তিনি বাঙলা পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখেছিলেন, যথা কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। এ থেকে মনে হয় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলা খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল এবং নানা স্বাধীন নৃপতির অভ্যুত্থান ঘটেছিল। মনে হয় এই সময় গৌড়ে জয়নাগ নামে একজন নৃপতি এবং সমতটে রাজভট (খড়্গবংশীয় ?) নামে আর একজন নৃপতি রাজত্ব করতেন। তবে শ্রীধারণরাতের কইলাণ তাম্রশাসন থেকে আমরা জানতে পারি যে ৬৪০ থেকে ৬৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমতটে জীবধারণ ও তাঁর পুত্র শ্রীধারণ নামে রাতবংশীয় দুজন রাজা রাজত্ব করতেন। ঢাকা অঞ্চলের খড়্গবংশীয় রাজারা রাতবংশ উচ্ছেদ করে সমতটে রাজ্যবিস্তার করেন। পাঁচখানা তাম্রশাসন

এবং একটি মূর্তিলেখ থেকে খড়গবংশের পাঁচজন রাজার নাম আমাদের জানা আছে, যথা খড়্গোত্তম (৬২৫-৪০), জাতখড়্গ (৬৪০-৫৮), দেবখড়্গ (৬৫৮-৭৩), রাজভট্ট (৬৭৩-৯০) ও বলভট্ট (৬৯০-৭০৫)। তবে তারিখগুলো সবই আনুমানিক।

তারপর বাঙলা বৈদেশিক আক্রমণ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। রঘোলি অভিলেখ থেকে আমরা জানতে পারি যে শৈলবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ধনের পিতামহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাঙলা আক্রমণ করে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ৭৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মণ বাঙলাদেশ অধিকার করেন। তারপর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য, কামরূপরাজ হর্ষদেব প্রমুখদের দ্বারা বাঙলা বিধ্বস্ত হয়। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের সময় বাঙলায় ঘোর বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায় ও মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব হয়।

দুই

অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের হাত থেকে বাঙলাদেশকে রক্ষা করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মদনপালের সময় পর্যন্ত পালবংশই বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। একই রাজবংশের ক্রমান্বয়ে চারশ বছর রাজত্ব করা ভারতের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা।

পালরাজবংশের বংশতালিকা এইরূপ—প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক নির্বাচিত গোপাল (৭৫০-৭৭০)। ধর্মপাল (৭৭০-৮০৭)। দেবপাল (৮০৭-৮৪২)। মহেন্দ্রপাল (৮৪২-৮৫০)। প্রথম শূরপাল (৮৫১-৮৬২)। প্রথম বিগ্রহপাল (৮৬২-৮৬৩)। নারায়ণ পাল (৮৬৩-৯১৭)। রাজ্যপাল (৯১৭-৯৫২)। দ্বিতীয় গোপাল (৯৫২-৯৭২)। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৭২-৯৭৭)।

দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য: প্রথম মহীপাল (৯৭৭-১০২৭)। নয়পাল (১০২৭-৪৩)। তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৪৩-৭০)। দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭১), কৈবর্তরাজ দিব্যোক ও রুদ্রক কর্তৃক অধিকারচ্যুত। দ্বিতীয় শূরপাল (১০৭১-১০৭২)।

তৃতীয় পালসাম্রাজ্য: রামপাল (১০৭২-১১২৬)। কুমারপাল (১১২৬-২৮)। তৃতীয় গোপাল (১১২৮-৪৩)। মদনপাল (১১৪৩-১১৬১)। সেনবংশীয়

বিজয়সেন কর্তৃক বাঙলা অধিকৃত। গোবিন্দপাল (১১৬১-৬৫)। পলপাল (১১৬৫-১২০০)।

বরেন্দ্রভূমের কোন একস্থানে সিংহাসনে আরোহণ করে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল অচিরে দেশমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি মগধ পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর পুত্র ধর্মপাল নিজ রাজ্য বিস্তার করেছিলেন দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে গান্ধার পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। বস্তুত পালরাজগণের রাজত্বকালই বাঙলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। সামরিক অভিযানে পালরাজগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন তাঁদের বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁদের কৌশলী মন্ত্রণা দিয়ে।

পালরাজগণ নিজেরা বৌদ্ধ হলেও, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতা করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথম শূরপাল (৮৫১-৬২) তাঁর মাতা শিব-ভক্তা মাহটাদেবীর অনুরোধে বারাণসীর সন্নিকটে চারখানা গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ওই কার্যের ভারপ্রাপ্ত পাশুপত আচার্যপর্ষদের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহার্থ দান করেছিলেন।

আমরা পালযুগের রাজমহিষীদের কথা কিছু বলি। গোপালের মহিষী ছিলেন দেদ্দদেবী। ধর্মপালের মহিষী ছিলেন রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের কন্যা রন্নাদেবী ও দেবপালের মহিষী হুনকরাজতনয়া মাহটাদেবী। বিগ্রহপালের মহিষী ছিলেন হৈহয় বা কলচুরি বংশীয়া রাজকন্যা লজ্জাদেবী। রাজ্যপালের মহিষী ছিলেন রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের মেয়ে ভাগ্যদেবী। তৃতীয় বিগ্রহপালের দুই মহিষী ছিলেন— একজন কলচুরিরাজ কর্ণের মেয়ে যৌবনশ্রী ও অপরজন রাষ্ট্রকূটবংশীয়া এক রাজকন্যা। রামপালের মহিষী ছিলেন মদনদেবী। এ থেকে প্রকাশ পায় যে পালরাজগণ অবাঙালী মেয়েদের বিবাহ করতেন। একটা প্রশ্ন যা স্বাভাবিকভাবে এখানে মনে জাগে, তা হচ্ছে এইসব অবাঙালী মেয়েরা বাঙলাদেশে এসে কিভাবে বাংলাভাষা শিখে তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে ঘর করতেন। মনে হয়, এসব রাজকন্যারা বিদুষী হতেন এবং সংস্কৃত ভাষা ভালোরূপেই জানতেন। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই তাঁরা বাংলাভাষা শিখে নিতেন। অবশ্য, বাংলাভাষা তখন বিবর্তিত হয়ে সংস্কৃতভাষাভিত্তিকই ছিল। এখনকার মতো তখন বাংলা-ভাষায় আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ

ঘটেনি। তবে বাংলাভাষায় তখন বহু দেশজ শব্দ ছিল। বিশেষ করে মাগধী-প্রাকৃত। রাজারাজড়ারা যখন অবাঙালী মেয়ে বিয়ে করতেন, সাধারণ লোক যে বিয়ে করত না, একথা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের এদিকটা আমরা কোনদিন ভেবে দেখিনি।

উত্তরভারতে সাম্রাজ্যিক অভিযান চালাবার জন্য পালরাজগণ কান্যকুব্জ ও ভীনমলের গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় রাজগণের চিরশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা পালদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় রাজারা পালদের সহায় ছিল বলে, গুর্জর-প্রতিহাররা পালদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু কোন কারণে রাষ্ট্রকূটগণের সহিত পালদের বিবাদ ঘটায় পালরা যখন সহায়হীন হয়ে পড়ে, তখন গুর্জর-প্রতিহার রাজা প্রথম ভোজ মগধ পর্যন্ত অধিকার করে নিয়ে পালসাম্রাজ্যকে খর্ব করে। এই সময় রাষ্ট্রকূটরাও পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। চন্দেল ও কম্বোজরাও পালদের পরাজিত করে। পালরাজ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল পরাজিত হয়ে দক্ষিণ বাঙলার কোন অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু পালদের রাজশক্তি বহুদিন এভাবে অস্তমিত থাকেনি। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল শীঘ্রই পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বহু যুদ্ধবিগ্রহ করে পালরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পূর্ব বাঙলায় বর্মণরা একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এদিকে উত্তর বাঙলায় কৈবর্তরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও তাদের অধিপতি দিব্যোকের নেতৃত্বে গৌড় অধিকার করে নেয়। দিব্যোকের পর তার ভাই রুদ্রক গৌড়াধিপতি হয়। রুদ্রকের পুত্র ভীমের নিকট হতে পাল-রাজ রামপাল তাঁর পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে তৃতীয় পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নানাদিকে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পালরা দুর্বল হতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পালরাজ মদনপালের রাজত্বকালে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন পালদের কাছ থেকে বাঙলা অধিকার করে নেয়। 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে বিজয়সেনের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা লিখিত আছে।

তিন

পালবংশের পতনের পর বাঙলায় সেনবংশ রাজত্ব করে। সেনবংশের বংশ-তালিকা হচ্ছে—বিজয়সেন (১০৯৪-১১৬০) ; বল্লালসেন (১১৫৯-১১৭৯) ; লক্ষ্মণ-

সেন (১১৭৯-১২০৩)। সেনরাজগণ প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের কিংবদন্তীর সহিত সংশ্লিষ্ট। ১৯৮২-৮৩ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নদীয়া জেলার ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে বল্লালঢিবি (পূর্বনাম বামনপুকুর দুর্গ) উৎখনন করে এক বিশাল (বাঙলার বৃহত্তম) মন্দির-Complex আবিষ্কার করেছে। অনুমান করা হয়েছে যে এখানে পাল যুগের এক বৌদ্ধ বিহার বা স্তূপের ওপর রাজা বল্লালসেন এক প্রাসাদ ও ওই মন্দির-Complex তৈরি করেছিলেন। সেনবংশের তৃতীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের আমলেই গৌড় মুসলমানদের হাতে চলে যায়। ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি অকস্মাৎ নদীয়া আক্রমণ করে গৌড় দখল করে নেয় এবং গৌড়ে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তবে অধিকারচ্যুত হয়েও সেনরাজারা কিছুকাল মধ্য এবং পূর্ববঙ্গে আধিকার রাখতে পেরেছিলেন। এছাড়া, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থানে আঞ্চলিক শাসকরা সেনবংশের নামে অথবা স্বাধীনভাবে বেশ কিছুদিন হিন্দুশাসন অব্যাহত রেখেছিলেন।

প্রাচীন বাঙলার শাসনপ্রণালী

আগেই বলেছি যে একেবারে গোড়ায় বাঙলার সমাজব্যবস্থা কৌমভিত্তিক ছিল। ঋগ্বেদ পড়লে বুঝতে পারা যায় যে আর্যসমাজেও সেই ব্যবস্থা ছিল। এই কৌমভিত্তিক শাসনপদ্ধতি থেকেই রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তবে এটার উদ্ভব প্রাচ্যদেশের অসুরগণ কর্তৃকই সাধিত হয়েছিল; আর্যগণ কর্তৃক নয়। এটা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।১৪) খুব সরলভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—দেবগণের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ চলছিল। অসুররা দেবগণকে পুনঃ পুনঃ পরাহত করছিল। দেবগণ বলল—আমাদের মধ্যে কোন রাজা নেই (অ-রাজত্বং) বলেই অসুররা আমাদের পরাহত করছে। অতএব অসুরগণের মতো আমাদেরও একজন রাজা নির্বাচন করা হউক। সকলেই এতে রাজী হল ('রাজ্যনাম করবামাহের ইতি তথেতি')। অথর্ববেদেও বলা হয়েছে—প্রাচ্যদেশের সার্বভৌম নৃপতিকেই 'একরাট' বলা হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আর্যরা মাত্র রাজতন্ত্রের ধারণাটাই প্রাচ্যভারতের অসুরদের কাছ থেকে নেয়নি, সার্বভৌম 'একরাট'-এর ধারণাটাও নিয়েছে।

বাঙলায় যে রাজতান্ত্রিক রাজ্যসমূহ ছিল, তা আমরা মহাভারত ও জাতকগ্রন্থ থেকেও জানতে পারি। শ্রীলঙ্কার 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ' নামে দুটি প্রাচীন গ্রন্থও এ সম্বন্ধে আলোকপাত করে। এসব আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

দুই

বাঙলা মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হবার পর মনে হয়, মৌর্য শাসনপদ্ধতিই বাঙলা দেশে প্রচলিত হয়েছিল। কেননা, মহাস্থানগড়ের লিপিতে আমরা 'মহামাত্র' উপাধিধারী একজন মৌর্যরাজকর্মচারীকে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনে অধিষ্ঠিত দেখি। তবে উত্তরবঙ্গ ছাড়া, বাঙলার অন্যত্রও মৌর্যশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তার কোন সংবাদ আমাদের জানা নেই। বাঙলা, গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হবার পর বাঙলার মাত্র এক অংশই গুপ্ত সম্রাটগণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। যে অংশ গুপ্তসম্রাটগণের অধীন ছিল, সে অংশ কতকগুলি নির্দিষ্ট শাসনবিভাগে বিভক্ত

ছিল, যথা—ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি ও গ্রাম। ভুক্তিই ছিল সবচেয়ে বড় শাসনবিভাগ। এক একটা ভুক্তি বিভক্ত ছিল কতকগুলি 'বিষয়'-এ। আবার 'বিষয়'গুলি বিভক্ত ছিল কতকগুলি 'মণ্ডল'-এ। এক এক 'মণ্ডল' বিভক্ত ছিল কতকগুলি 'বীথি'তে। আবার বীথিগুলি বিভক্ত ছিল কতকগুলি 'গ্রাম'-এ। গ্রামই ছিল ন্যূনতম শাসনবিভাগ।

গুপ্তরাজগণের সময় ভুক্তি ছিল মাত্র দুটি—পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি ও বর্ধমান-ভুক্তি। এ দুটি ভুক্তি যথাক্রমে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের রাজশাহী ও বর্ধমান ডিভিসনের সীমারেখার প্রায় সমান ছিল। প্রতি ভুক্তির এক একটি অধিকরণ থাকত, এবং তার শাসনভার ন্যস্ত ছিল এক এক জন রাজকর্মচারীর ওপর। প্রতি ভুক্তির শাসনকর্তার নাম ছিল 'উপরিক-মহারাজ'। সম্রাট নিজেই ভুক্তির শাসনকর্তাদের নিযুক্ত করতেন।

পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল—কোটিবর্ষ, খটপর বা খরপর ও পঞ্চনগরী। ভুক্তির অধিকরণে নানারূপ আমলা ছিল। মহাসাক্ষ অভিলেখে আমরা এরূপ অনেক আমলার নাম উল্লিখিত হতে দেখি, যথা 'ভোগপতিক', 'পট্টলক', 'চৌরদ্ধরণিক', 'অবসথিক', হিরণ্যাসমুদয়িক', 'ঔদ্রঙ্গিক', 'ঔরঙ্গনিক' 'কণ্ডকৃত্তিক','দেবদ্রোণিসম্বন্ধ', 'কুমারামাত্য','অগ্রহারিক,' 'বিষয়পতি' ইত্যাদি।

বিষয়গুলির শাসনকর্তা ছিল বিষয়পতি। বিষয়পতিগণ উপরিক কর্তৃকই নিযুক্ত হতেন, কিন্তু কোন কোন সময় সম্রাটও তাঁদের নিযুক্ত করতেন। বিষয়পতিরও নিজ অধিকরণ থাকত। তার নাম ছিল বিষয়াধিকরণ। বিষয়াধিকরণের আমলারা নানা নাম বহন করতেন যথা, 'নগরশ্রেষ্ঠী', 'প্রথম কুলিক', 'প্রথম কায়স্থ', 'প্রথম সার্থবাহ' ইত্যাদি।

বীথি বিভাগেরও নিজস্ব অধিকরণ থাকত। এর আমলাদের নাম হত 'মহত্তর', 'খড়গি' ও 'বহনায়ক'। গ্রামগুলিরও অধিকরণ থাকত। গ্রামের অধিকরণকে 'অষ্টকুলাধিকরণ' বলা হত। এগুলি আজকালকার দিনের পঞ্চায়েতের সামিল ছিল। এ সকল অধিকরণে থাকত ব্রাহ্মণ, মহত্তর, কুটুম্ব, গ্রামিক ইত্যাদি। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিই গ্রামিক নির্বাচিত হতেন।

গুপ্তসম্রাটগণের সরাসরি অধীন ভূভাগ উপরে বর্ণিত শাসনপদ্ধতি অনুযায়ী শাসিত হত। যেসব ভূভাগ সরাসরি তাদের অধীনস্থ ছিল না, সেগুলির শাসনভার সামন্ত-রাজগণের হস্তে ন্যস্ত হত। গুপ্তসাম্রাজ্যের অবনতির সময় এই

সকল সামন্তরাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'মহারাজাধিরাজ' বা 'ভট্টারক' উপাধি গ্রহণ করে, ও নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। ৫০০ খ্রীস্টাব্দ হতে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাঙলার নানাস্থানে এরূপ স্বাধীনরাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই সকল স্বাধীন রাজ্যে গুপ্তসম্রাটগণের প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী অব্যাহত ছিল। তবে 'বিষয়'গুলি গুপ্তসম্রাটগণের সময় যেভাবে শাসিত হত, ঠিক সে ভাবে হত না। বিষয়গুলির শাসনভার 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' বা 'জ্যেষ্ঠকম্নপিক' নামধারী প্রধান কর্মচারীদের দ্বারা সম্পাদিত হত।

গুপ্তযুগে 'পুস্তপাল' নামে একজন কর্মচারীর আমরা উল্লেখ পাই। তাঁর কাজ ছিল জমি বিক্রয়যোগ্য কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। অনুসন্ধানের পর তিনি যদি দেখতেন যে জমি বিক্রয়যোগ্য তা হলে গ্রামের 'মহত্তর' (মাতব্বর) ও কুটুম্বগণের (সাধারণ গৃহস্থ) সামনে মাপ-জোখ করে জমি বিক্রয় করা হত।

তিন

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল নিজে 'প্রকৃতিপুঞ্জ' কর্তৃক নির্বাচিত হলেও তিনি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন। গুপ্তযুগের ন্যায় পালযুগেও ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল প্রভৃতি শাসনবিভাগ বজায় ছিল। তবে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমান-ভুক্তি ছাড়া, বাঙলায় আর এক ভুক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা 'দণ্ডভুক্তি' (বর্তমান মেদিনীপুরের অংশবিশেষ)। এছাড়াও উত্তর বিহারে 'তীরভুক্তি' (ত্রিহুত), দক্ষিণ বিহারে 'শ্রীনগরভুক্তি' ও আসামে 'প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তি'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাঙলার ইতিহাসে পালরাজগণের আমলেই আমরা প্রথম 'মন্ত্রী' বা 'সচিব' পদের উল্লেখ পাই। পালরাজগণের মন্ত্রিগণ অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হতেন। তাঁদেরই পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা দেশশাসন করতেন ও সাম্রাজ্যিক অভিযানে লিপ্ত হতেন। পালরাজগণ নিজেরা বৌদ্ধ হলেও, তাঁদের মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। গোড়ার দিকে এক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশকে আমরা পালেদের মন্ত্রী হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখি। এই বংশের গর্গ ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। গর্গের পুত্র দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন ও তাঁর পৌত্র কেদারমিশ্র বিগ্রহ-পাল ও নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। কেদারমিশ্রের পর তাঁর পুত্র গুরবমিশ্রও নারায়ণপালের মন্ত্রী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আর এক বংশীয় মন্ত্রীর পরিচয়

পাই। ওই বংশের যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপাল ও বৈদ্যদেব কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন। পরে পালরাজবংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বৈদ্যদেব কামরূপে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

পালরাজগণের রাজ্ঞীরা অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী হতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে 'যুবরাজ'-এর পদে অভিষিক্ত করা হত। রাজার অন্যান্য সন্তানকে 'কুমার' বলা হত।

পালরাজগণ প্রধান মন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রিগণেরও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। নানা অভিধাধারী এরূপ অনেক মন্ত্রী ছিলেন। যথা 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক', 'রাজামাত্য', 'মহাকুমারামাত্য', 'দূতক', 'মহাসেনাপতি', 'মহাপ্রতিহার', 'মহাদণ্ডনায়ক', 'মহাদৌঃসাধসাধনিক', 'মহাকর্তাকৃতিক', 'মহাক্ষপটলিক', 'মহাসর্বাধিকৃত', 'রাজস্থানীয়', এবং 'অমাত্য'। এছাড়া, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার জন্য 'অধ্যক্ষ' অভিধাধারী পরিচালকবর্গ ছিল, যথা 'বলাধ্যক্ষ', 'নৌকাধ্যক্ষ' বা 'নাবাধ্যক্ষ', ইত্যাদি। এছাড়া, রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকর্ম সমাধার জন্য নানা শ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিল, যথা 'শৌল্কিক', 'ক্ষেত্রপ', 'ধর্মাধ্যক্ষ' ইত্যাদি। সমসাময়িক লিপিসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে পালরাজগণের আমলে সামন্তসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা নানা উপাধিবিশিষ্ট হতেন, যথা 'রাজন', 'রাজন্যক', 'রাণক', 'রাজনক', 'সামন্ত', 'মহাসামন্ত', ইত্যাদি। অপারমন্দারের শাসক লক্ষ্মীশূর কর্তৃক 'অনন্তসামন্তচক্র', 'আটবিক-সামন্তচক্র চূড়ামণি' ইত্যাদি অভিধা বহন থেকে মনে হয় যে বিভিন্ন সামন্তবর্গের মধ্যে কোনরূপ মৈত্রীসঙ্ঘও ছিল। পালরাজগণের আমলে সামন্তসংখ্যা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করে যে সাধারণ প্রজারা ক্রমশ কেন্দ্রীয় সার্বভৌম রাজশক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলছিল। পালসাম্রাজ্যের পতনের এটাও মনে হয় একটা কারণ ছিল।

চার

পালরাজগণের শাসনপদ্ধতি পরবর্তীকালে সেন, কাম্বোজ, চন্দ্র ও বর্মবংশীয় রাজগণ গ্রহণ করেছিলেন। তবে কিছু কিছু পার্থক্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। আমলাতন্ত্র আরও বৃহদাকার ধারণ করেছিল, এবং অনেক নতুন রাজকর্মচারী সৃষ্ট হয়েছিল। আগে 'গ্রাম'ই সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম শাসনবিভাগ ছিল। কিন্তু এযুগে

আমরা 'গ্রাম'কে 'পটক' বা পাড়ায় বিভক্ত হতে দেখি। এছাড়া, কোন কোন ভুক্তির সীমা বাড়িয়ে (যেমন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির) বা হ্রাস করে নূতন ভুক্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল। যেমন বর্ধমান-ভুক্তিকে খণ্ডিত করে তার উত্তর অংশে 'কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি' সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কেশবসেনের ইদিলপুর লেখ থেকে আমরা জানতে পারি যে সেনরাজগণের একশত মন্ত্রী থাকত, এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক' উপাধি গ্রহণ করতেন। মন্ত্রীবর্গের মধ্যে 'মহামহত্তক' বা 'মহত্তক' অভিধাধারীগণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। অন্যান্য মন্ত্রীরা নানা নামে অভিহিত হতেন। যথা, 'বৃহদ-উপরিক', 'মহাভৌগিক', 'মহাভোগপতি', 'মহাধর্মাধ্যক্ষ', 'মহা-সেনাপতি', 'মহাগণস্থ', 'মহাসমুদ্রাধিকৃত', 'মহাসর্বাধিকৃত', 'মহাবলাধিকরণিক', 'মহাবলকোষ্টিক', 'মহাকরণাধ্যক্ষ', 'মহাপুরোহিত', 'মহাতন্ত্রাধিকৃত' ইত্যাদি। অনুমিত হয় যে তাঁরা শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের অধিকরণসমূহের অধিকর্তা ছিলেন। সেনযুগের অধিকরণসমূহের অধিকর্তাদের অভিধা পাল-যুগের অধি-করণসমূহের অধিকর্তাদের অভিধাসমূহের সহিত তুলনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। যেমন পালযুগে প্রধান বিচারপতিকে 'মহাদণ্ডনায়ক' বলা হত; কিন্তু সেনযুগে তাঁকে বলা হত 'মহাধর্মাধ্যক্ষ'। তবে সব নামই যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, তা নয়। যেমন পালযুগের ন্যায় প্রধান হিসাব-রক্ষককে 'মহাক্ষপটলিক' বলা হত, এবং অনুরূপভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলা হত 'মহামহত্তক', পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক' ইত্যাদি। পররাষ্ট্রমন্ত্রীই 'দূতক'-এর কাজ করতেন। গুপ্তচর বিভাগের মন্ত্রীকে বলা হত 'মন্ত্রপাল', শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী মন্ত্রীদের বলা হত 'মহাপ্রতিহার', 'চৌরোদ্ধরণিক', 'দণ্ডপাশিক' ও 'চটভট'। প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধানকে বলা হত 'মহা-সেনাপতি'। এছাড়া অন্যান্য বিভাগের অধিকর্তাদের বলা হত 'কোট্টপাল' বা 'কোট্টপতি', 'মহাব্যূহপতি', 'নৌবলাধ্যক্ষ', 'বলাধ্যক্ষ', 'হস্তি-অশ্ব-গো-মহিষ-অজবিকাধ্যক্ষ', 'মহাপিলুপতি', 'মহাগণস্থ', 'মহাবলাধিকরণিক', 'মহাবল-কোষ্টিক' ও 'বৃহদ্ধক'। পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের শক্তিশালী বৃহৎ নৌবহর ছিল এবং এ সম্পর্কেও বহু কর্মচারী ছিল।

পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের আমলে বাঙলায় যে এক সুদৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ শাসনপ্রণালী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভাষা থেকেই জাতির পরিচয়। কিন্তু এখন বাংলা সাহিত্য যে ভাষায় রচিত হয়, তা হচ্ছে এক বিশেষ নগরের ভাষা। সে নগর হচ্ছে মহানগরী কলকাতা। যদিও কলকাতার ভাষায় রচিত সাহিত্য সমগ্র বাঙলাদেশের লোকই পড়তে সক্ষম, তা হলেও বাঙলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 'গবেষণা পরিষদ' এরূপ আঞ্চলিক ভাষার একখানা অভিধান সংকলন করেছেন। তাঁরা যে হাজার হাজার আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ করেছেন, তার একটাও কলকাতার লেখকরা যখন বিভিন্ন জেলার পটভূমিকায় সাহিত্য রচনা করেন তখন ব্যবহার করেন না।

দুই

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতেই কলকাতার ভাষার আরম্ভ। তবে আগেকার যুগের ভাষাকে আমরা তিন কাল-স্তরে ভাগ করি—(১) আদি, (২) মধ্য ও (৩) আধুনিক। আদি যুগের ভাষার স্থিতিকাল আনুমানিক ৯৫০ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ। এ যুগের ভাষার নিদর্শন হচ্ছে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর গীতগুলি। মধ্য-যুগের ভাষার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগকে আবার দুই স্তরে ভাগ করা হয়—(১) আদি-মধ্য (১৩৫০-১৬০০ খ্রীস্টাব্দ) ও (২) অন্ত-মধ্য (১৬০০-১৮০০ খ্রীস্টাব্দ)। আদি-মধ্যযুগের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ। অন্ত-মধ্য যুগের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় যেসব গ্রন্থে তাদের অন্যতম হচ্ছে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালের ভাষাকে আমরা আধুনিক যুগের ভাষা বলি। ('বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তিন

বাংলা ভাষার ভিত্তি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মাগধী-প্রাকৃত। এই তিন ভাষার শব্দগুলিকেই আমরা 'দেশজ' শব্দ বলি। এই তিন ভাষা ছেড়ে দিলে, বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার কিছু প্রভেদ আছে। উচ্চারণের দিক দিয়ে বাংলার 'অ', সংস্কৃতের 'অ' থেকে পৃথক। সংস্কৃতে 'আ' দীর্ঘধ্বনি, বাংলায় হ্রস্বধ্বনি। 'এ', 'ও', 'ঐ' ও 'ঔ' ধ্বনিও বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় উচ্চারিত হয় না। 'শ', 'ষ' ও 'স' এই তিনটি ব্যঞ্জন-ধ্বনির উচ্চারণ বাংলায় প্রায় এক, সংস্কৃতে বিভিন্ন। 'ঋ' ধ্বনি এখন বাংলায় লুপ্ত। এর উচ্চারণ 'র'-এর মতো। উচ্চারণের প্রভেদ ছাড়া বাংলায় মাত্র দুটি লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গও আছে। বাংলায় বিশেষণে কারক-বিভক্তি যোগ হয় না, সংস্কৃতে হয়। এ ছাড়া, আরও অনেক প্রভেদ আছে। আবার আদি ও মধ্যযুগের বাংলার সঙ্গে আধুনিককালের বাংলার অনেক পার্থক্য ঘটেছে।

মোটামুটি বর্তমান বাংলায় দুই শ্রেণীর শব্দ আছে—(১) মৌলিক ও (২) আগন্তুক। মৌলিক শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত। তবে সেগুলি তিন শ্রেণীতে পড়ে (১) তদ্ভব, (২) তৎসম, ও (৩) অর্ধ-তৎসম। আর আগন্তুক শব্দ-গুলির মধ্যে আছে, (১) দেশজ (তার মানে সূচনায় যার ওপর বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল), যথা অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, হিন্দি ইত্যাদি, ও (২) পরবর্তী-কালে গৃহীত বিদেশী শব্দ যথা আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজি, ফরাসী, ওলন্দাজ, আমেরিকান, ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে লেখার জন্য তাম্রপট্ট, তালপত্র ও ভূর্জপত্র ব্যবহৃত হত। কাগজেরও ব্যবহার ছিল, তবে কাগজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে।

চার

মৌর্যযুগে ব্রাহ্মীলিপি সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মীলিপি বিবর্তিত হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রূপ ধারণ করে। তা হলেও এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লিপি পড়তে পারত। লিপির বিবর্তনে বাঙলাদেশের লিপিতে একটা স্বকীয়তা আমরা প্রথম

লক্ষ্য করি গুপ্তযুগে। এই স্বকীয় লিপি থেকেই বাংলা লিপির উৎপত্তি হয়। এর একটা বিশিষ্ট রূপ আমরা লক্ষ্য করি সমাচারদেবের কোটালিপাড়ার তাম্রশাসনে। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে এর অনেক পরিবর্তন ঘটে। প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপিতে ব্যবহৃত অ, উ, ক, খ, গ, জ, ধ, ন, ম, ল, শ অনেকটা বাংলা অক্ষরের রূপ ধারণ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তির ২২টা অক্ষর পুরাপুরি বাংলা অক্ষরের মতো। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় তাম্রশাসনসমূহের অক্ষর দেখা যাচ্ছে আধুনিক বাংলা অক্ষরের মতো হয়ে গেছে। পরে তার আর কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দী হতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের ফলে বাংলা অক্ষরগুলির একটা নির্দিষ্ট রূপ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

বাঙলা নদীবহুল দেশ। সেজন্যই বাঙলার পরিবহণের জন্য ছিল নৌকার ব্যবহার। সম্প্রতি (১৯৮৯) রংপুর জেলার দেবীগঞ্জে এক পুকুর খুঁড়তে গিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে চার কিলোগ্রাম ওজনের বাহারী কাজ করা এক সোনার নৌকা। এর আগেই আমরা বলেছি মেদিনীপুরের পান্না গ্রামে এক পুকুর খোঁড়ার সময় ৪৫ ফুট তল থেকে পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালাবশেষ। নৌকার সাহায্যে বাঙালী যে মাত্র বাঙলারই এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যেত তা নয়। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সে সারা বিশ্বে যেত বাণিজ্য করতে। বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙালী বণিকরা যে মাত্র ভূমধ্যসাগরীয়, পারস্য উপসাগরীয়, আরবসাগরীয় ও ভারতমহাসাগরের দেশসমূহে পাড়ি জমাত, তা নয়, বঙ্গোপসাগর ও তার দক্ষিণের দেশসমূহের সঙ্গেও পণ্য বিনিময় করতে যেত। পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে আরও নিয়ে যেত বাঙলার ধর্ম ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ।

ক্রীটদেশের সঙ্গে বাঙালীর বাণিজ্য, বাণিজ্য উপলক্ষে সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র লোথালে বাঙালীর উপস্থিতি, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাঙলার দামাল রাজপুত্র বিজয়সিংহের সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যে বাঙলার পণ্যদ্রব্যের সমাদর, এসব বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে বাঙালীদের সম্বন্ধে কথার উল্লেখও আমরা আগে করেছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঙালী সংস্কৃতির কথা আজ সুবিদিত। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থের যুগ থেকেই ভারতীয়দের কাছে এসব দেশ জানা ছিল। যেসব দেশে গিয়ে এদেশের লোক অতি প্রাচীনকাল থেকে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল চম্পা (ভিয়েৎনাম), কম্বোজ (কাম্পুচিয়া), শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), যবদ্বীপ (জাভা), ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি। সঙ্গে করে তারা নিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের ধারা। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সেকালে বাঙলার তাম্রলিপ্তি বন্দরেরই ছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা।

স্থলপথে হিমালয় অতিক্রম করে বাঙলার বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতেরা যেতেন নেপাল, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায়। চীনদেশের সঙ্গেও বাঙলার আদান-প্রদান

ছিল। সম্প্রতি আমেরিকায় প্রাপ্ত ৯২৩ খ্রীস্টাব্দের এক শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছে যে ভারতীয় বণিকরা আমেরিকাতেও যেত। (বর্তমান, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৮৯)।

দুই

ব্রহ্মদেশের প্রাচীন স্থাপত্য যে বাঙালীর সৃষ্টি, সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈত নেই। 'গৌড়' নামের সাদৃশ্যেই ব্রহ্মদেশের এক নাম ছিল 'গৌড়'। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্বীপসমূহে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তারে বাঙালীর প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। মালয় উপদ্বীপের এক অভিলেখে বাঙলার রক্তমৃত্তিকাবাসী বুদ্ধগুপ্ত নামে এক মহানাবিকের নাম খোদিত আছে। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন এক বাঙালী। শৈলেন্দ্ররাজবংশীয় রাজগণের সঙ্গে বাঙলার পালসম্রাটগণের যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল তা দেবপালের সময়ের এক অভিলেখ থেকে জানা যায়। দেবপাল শৈলেন্দ্রবংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেবকে নালন্দা বিহারে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন ও তার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানা গ্রাম দান করেছিলেন। যবদ্বীপের কতকগুলি মূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপি বাংলা অক্ষরেই লিখিত হয়েছিল। তা ছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও যে বিস্তার ও প্রসার ঘটেছিল, তা ওইসব দেশের ভাস্কর্যশিল্পে রামায়ণ ঘটিত নানান দৃশ্যাবলী থেকে প্রকাশ পায়।

তিন

বাঙালী পণ্ডিতগণ যে তিব্বতদেশে বিশেষরূপে সমাদৃত হতেন, তা আমরা তিব্বতীয় গ্রন্থসমূহ থেকে জানতে পারি। তিব্বতের রাজা খ্রী-সং-দে-বৎ-সন বাঙালী বৌদ্ধাচার্য শান্তিরক্ষিতকে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভবও ওই একই উদ্দেশ্যে রাজনিমন্ত্রণে তিব্বতে যান। তাঁরাই তিব্বতে বিখ্যাত 'লামা' সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তা ছাড়া তিব্বতের রাজা মগধের ওদন্তপুরী বিহারের আদর্শে তাঁর রাজধানী লাসায় বসময়া নামে এক বিহার নির্মাণ করেন ও শান্তিরক্ষিতকে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। শান্তিরক্ষিত তেরো বৎসর ওই পদে অধিষ্ঠিত থেকে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

শান্তিরক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য কমলশীল তাঁর আরব্ধ কাজসমূহ সমাপ্ত করেন। নেপাল ও তিব্বতে যাবার পূর্বে শান্তিরক্ষিত নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 'মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা' ও তার বৃত্তি এবং 'সত্যদ্বয়-বিভঙ্গপঞ্জিকা' নামে দুই মহাযানী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তিব্বতে যেসব বৌদ্ধ আচার্য গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানই সুপ্রসিদ্ধ। তিনি অতীশ নামে সুপরিচিত। তিনি ভারতের বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন ও দণ্ডপুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিত কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি পান। 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধিও তিনি পেয়েছিলেন। সুবর্ণদ্বীপের প্রধান বৌদ্ধাচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকটও তিনি বারো বৎসর শিক্ষালাভ করেছিলেন। পালসম্রাট নয়পাল তাঁকে বিক্রমশীলার মহাস্থবির নিযুক্ত করেন। তিব্বতরাজ হ্লা-লামা নিজ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যখন তাঁকে প্রথম আমন্ত্রণ করেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তী রাজা চ্যান-চাব জ্ঞানপ্রভ পুনরায় তাঁকে আহ্বান করলে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন (১০৪০ খ্রীস্টাব্দে)। পথে তিনি নেপালরাজ অনন্তকীর্তি কর্তৃক সংবর্ধিত হন ও রাজপুত্র পদ্মপ্রভাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তিব্বতে তিনি ক-দম (পরবর্তী নাম গে-লুক) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভোট ভাষায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তিনি নিজেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে 'রত্নকরণ্ডোদ্‌ঘাট', 'বোধিপাঠ-প্রদীপপঞ্জিকা' ও 'বোধিপাঠপ্রদীপ' প্রসিদ্ধ। ভোট ভাষায় তিনি যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন, তার মাধ্যমেই বৌদ্ধধর্ম এখনও তিব্বতে টিকে আছে। সেজন্য তিব্বতের লোকেরা তাঁর স্মৃতির প্রতি এখনও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

নেপালেও বহু বৌদ্ধ আচার্য বিশেষরূপে সমাদৃত হতেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত নিদর্শন চর্যাপদসমূহ নেপাল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এছাড়া ভারতের অভ্যন্তরেও বাঙালী পণ্ডিতরা বহুরাজ্যে আমন্ত্রিত হতেন, এবং তাঁরা বিচারযুদ্ধে অন্যান্য প্রদেশের পণ্ডিতদের পরাজিত করতেন।

বাঙলায় মুসলিম রাজত্ব

১২০৪ খ্রীস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাঙলার তৃতীয় সেন নৃপতি লক্ষ্মণসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে, বাঙলা অধিকার করেন ও বাঙলায় মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময় (১২০৪ খ্রীস্টাব্দ) থেকে তুঘরল মুগীসুদ্দিন-এর সময় (১২৮২ খ্রীস্টাব্দ) পর্যন্ত মোট কুড়িজন সুলতান বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর ১২৮২ থেকে ১৩০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বলবন বংশীয় দুজন সুলতান বাঙলায় রাজত্ব করেন। এ দুজনের পর ১৩০১ থেকে ১৩২৭ পর্যন্ত বাঙলা ফিরোজশাহী বংশীয় পাঁচজন সুলতান কর্তৃক শাসিত হয়। এর পর ১৩২৭ থেকে ১৩৩৮ পর্যন্ত মহম্মদ তুগলকের অধীন দুজন ও ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২ পর্যন্ত মুবারক শাহী বংশের তিনজন সুলতান বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। এযাবৎকাল বাঙলার সুলতানগণ দিল্লীর সুলতানের অধীনস্থ হয়েই বাঙলাদেশ শাসন করছিলেন। এ বশ্যতা প্রথম অস্বীকার করেন ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৬-১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দ)। সুতরাং তাঁকেই বাঙলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের উদ্বোধক বলা যায়। এই বংশের সুলতানগণ ১৪১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলাদেশ শাসন করেন। তাঁরা সকলেই যোগ্য শাসক ছিলেন। ১৪১২ থেকে ১৪১৪ পর্যন্ত এই স্বল্পকালের মধ্যে বাঙলায় বায়াজিদ শাহী বংশীয় দু'জন সুলতান গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন। তারপর ১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব কয়েক বছরের জন্য গৌড়েশ্বর হন। তারপর রাজা গণেশের পুত্র যদু ধর্মান্তরিত হয়ে জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করে ১৪৩৩ পর্যন্ত বাঙলাদেশ শাসন করেন। বোধ হয় এর মধ্যে রাজা গণেশের আর এক পুত্র মহেন্দ্রদেব (১৪১৮ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তারপর যথাক্রমে ১৪৩৬ থেকে ১৪৮৭ পর্যন্ত মাহমুদ শাহী বংশের, ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ পর্যন্ত সুলতান শাহজাদা ও হাবশী সুলতানগণ ও ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮ পর্যন্ত হুসেন শাহী সুলতানগণ বাঙলাদেশ শাসন করেন। এ সময় বহিরাক্রমণের ফলে বাঙলাদেশে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশ মুঘলদের অধিকারে চলে যায়। কিছুদিনের জন্য সংঘর্ষ চলে, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঙলাদেশে মুঘল শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৬

খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আকবরের আমলে বাঙলাকে এক স্বতন্ত্র সুবায় পরিণত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশ-পনেরো বৎসর পর্যন্ত বাঙলা মুঘল সুবেদারগণ কর্তৃক শাসিত হয়। এই সকল সুবেদারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইসলাম খান, ইব্রাহিম খান ফতেজঙ্গ, রাজা মানসিংহ, সুলতান শাহ সুজা, মীরজুমলা, সায়েস্তা খান, আজিম-উশ-শান ও মুরশিদকুলি খান। ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুরশিদকুলি খান বাঙলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সৃষ্টি করেন। নবাবরা ছিলেন সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খান, আলিবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলা। শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজগণের হাতে পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ) পরাজিত হন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা দেওয়ানী লাভের পর কার্যত বাঙলায় মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটে।

দুই

সার্ধ পাঁচশত বৎসর কাল বাঙলায় মুসলমান রাজত্ব ছিল। বিজেতা বখতিয়ার খিলজি (১২০৪ খ্রীস্টাব্দ) এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে অসি নিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। ধর্মীয় উন্মাদনার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানরা গোড়া থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধদের মঠ-মন্দির-মূর্তি ভাঙা ও ধর্মান্তরকরণের অভিযান চালিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তারা পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চল জয় করতে পারেনি। গোড়ার দিকে বর্তমান দিনাজপুর জেলার দেবকোটই বাঙলায় মুসলমান শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল। বহু হিন্দুকে তারা ধর্মান্তরিত করেছিল ও মঠ-মন্দির ভেঙে ফেলে তারই উপাদান দিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি নির্মাণ করেছিল। এটা বখতিয়ার খিলজির আমল থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং পরবর্তী অনেক সুলতানই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। নিরীহ দরিদ্র লোকদের ওপর তাদের অত্যাচার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। নারীধর্ষণ হামেশাই ঘটত। এটাই ছিল ধর্মান্তরিত করবার একটা প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্ষিতা নারীকে হিন্দুসমাজ আর স্থান দিত না। এভাবে হিন্দুসমাজ ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল। ক্ষীয়মাণ হিন্দুসমাজকে আসন্ন বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য স্মার্ত রঘুনন্দন বিধান দেন যে ধর্ষিতা নারীকে সামান্য প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা চলবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুঘরল খানই (১২৭৮–১২৮২) প্রথম

পূর্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুসলিম রাজত্ব বিস্তার করেন। তিনি ওড়িশাও আক্রমণ করেছিলেন। এ সময় ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত ছিল মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার অনেকাংশ। ওড়িশা জয় করা অবশ্য তুঘরলের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধনরত্ন ও হস্তী ইত্যাদি লুণ্ঠন করা।

চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শামসুদ্দিন ফিরোজশাহ একজন পরাক্রান্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন সুলতান ছিলেন। দীর্ঘ একুশ বৎসর (১৩০১-১৩২১ খ্রীস্টাব্দ) শাসনকালের মধ্যে তিনি সাতগাঁ, ময়মনসিংহ ও সোনারগাঁ, এমনকি সুদূর শ্রীহট্ট পর্যন্ত তাঁর রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে (১৩২৫-১৩২৮ খ্রীস্টাব্দ) লখনৌতি, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ বাঙলার সুলতানদের হস্তচ্যুত হয়, এবং ওই সময় সম্রাট মহম্মদ তুগলকের অধীনস্থ শাসকরা লখনৌতি, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ অঞ্চলে শাসন করেন। এই সময় ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩২৮-১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দ) সম্রাটের নিযুক্ত শাসকগণকে যুদ্ধে পরাহত করে সোনারগাঁ সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল পুনরধিকার করেন ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন। শ্রীহট্ট জেলাও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁকেই বাঙলায় প্রথম স্বাধীন সুলতান বলা চলে। লোক হিসাবে তিনি ভাল হলেও হিন্দুদের ওপর তিনি খুব অত্যাচার করতেন। ফখরুদ্দিনের রাজত্ব-কালেই মিশরের ইবন বতুতা বাঙলাদেশে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে শ্রীহট্টের হিন্দুদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে দিতে হত। এ ছাড়া, আরও অনেক রকম করও দিতে হত। স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে চতুর্থ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহও (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দ) হিন্দুদ্বেষী সুলতান ছিলেন। নেপাল আক্রমণ করে তিনি পশুপতিনাথের মূর্তি ত্রিখণ্ডিত করেন ও বহু নগর এবং মন্দির ধ্বংস করেন। ত্রিহুতের লোকদের ওপরও তিনি অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালিয়ে ত্রিহুত অধিকার করেন। ওড়িশা আক্রমণ করেও তিনি বহু ধনরত্ন ও হস্তী লুণ্ঠন করেন। কামরূপের কিয়দংশও তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯০ খ্রীস্টাব্দ) আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীর বাদশাহের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন ও নিজেকে বাঙলা মুলুকের সার্বভৌম শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনিই প্রথম চীনদেশের সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন বিনিময় প্রথা শুরু

করেন। সিকান্দর শাহের বিশিষ্ট কীর্তি পাণ্ডুয়ায় বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা। 'স্থাপত্যকৌশলের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয়।' কিন্তু এর নির্মাণে বহু হিন্দু মন্দিরের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল। তা থেকে সিকান্দার শাহের হিন্দুবেষী মনোভাব প্রকাশ পায়। পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০ খ্রীস্টাব্দ) অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, রসিক, কাব্যামোদী ও লোকরঞ্জক সুলতান ছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি তিনি ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করেছিলেন। রাজ্যের উচ্চপদ থেকে তাঁদের অপসারণ করেছিলেন। যে সকল হিন্দু আমীরকে তিনি পদচ্যুত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা গণেশ, যিনি খুব সম্ভবত গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করে বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন।

তিন

রাজা গণেশ (১৪১৫-১৪১৮) সম্বন্ধে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'রাজা গণেশ বাঙলার ইতিহাসের একজন অবিস্মরণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু যিনি বাঙলার পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্ম ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। রাজা গণেশ খাঁটি বাঙালী ছিলেন, ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।' মুসলমানদের চক্ষে হিন্দু বিধর্মী। একজন বিধর্মীর সিংহাসনে আরোহণ করায় রাজ্যের মুসলমানরা পীর, মোল্লা ও দরবেশদের নেতৃত্বে এক আন্দোলন শুরু করে দেয়। গণেশ কয়েকজন দরবেশ নেতাকে হত্যা করেন। মুসলমানরা তাতে আরও রুষ্ট হয়ে গণেশের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়। এই সুযোগে গণেশের পুত্র রাজনীতিচতুর যদু পিতৃপক্ষ ত্যাগ করে ও মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে সিংহাসনে বসে। এর ফলে সাময়িক হিন্দুপ্রাধান্যের অবসান ও মুসলিম প্রাধান্য আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজা গণেশ সুযোগ বুঝে আত্মর ফিরে আসেন ও নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে বাঙলাদেশে পুনরায় হিন্দুর জয়পতাকা উড়িয়ে দেন। পুনরায় তিনি মোল্লা ও দরবেশদের দমন করতে থাকেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশে হিন্দু আধিপত্যের

পুনরুত্থানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তারপর গণেশের পুত্র যদু জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী সুলতান হয়ে দাঁড়ান। জোর করে তিনি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে থাকেন। অবশ্য বৃহস্পতিমিশ্র লিখিত সমসাময়িক 'স্মৃতি-রত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে রায় রাজ্যধর নামে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু তার সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন।

চার

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত পরিস্থিতির শীঘ্রই এক পরিবর্তন ঘটে। মাহমুদশাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৫-৭৬) নিজে তো পণ্ডিত ছিলেনই, পরন্তু হিন্দু ও মুসলমান অনেক কবি ও পণ্ডিতকে পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। যে সকল হিন্দুপণ্ডিত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বৃহস্পতিমিশ্র। সুলতান তাঁকে 'পণ্ডিত সার্বভৌম' ও 'রায়মুকুট' উপাধি দিয়েছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর রচয়িতা মালাধর বসুও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ চিকিৎসক ছিলেন অনন্ত সেন। তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন বৃহস্পতি রায়ের পুত্র বিশ্বাস রায়। 'পুরাণসর্বস্ব' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গোবর্ধনও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সুলতান তাঁকে 'গুণরাজখান' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর সভাসদ ও উচ্চ কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন কেদার রায়, নারায়ণ দাস, ভান্দসী রায়, জগদানন্দ রায়, ব্রাহ্মণ সুনন্দ, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরণী, সুন্দর, শ্রীবৎস, মুকুন্দ প্রমুখেরা।

রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই হাবশীরা (১৪৮৭-১৪৯৩) বাঙলার সিংহাসন দখল করে বসে। হাবশীদের মধ্যে যারা প্রাধান্য লাভ করেছিল তারা হচ্ছে মালিক আন্দিল (ফিরোজশাহ), সিদি বদর (মুজাফর শাহ), হাবশখান, কাফুর প্রভৃতি। কিন্তু শীঘ্রই হাবশী রাজত্বের অবসান ঘটে। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) সিংহাসনে আরোহণ করে হাবশীদের বাঙলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। তিনিই বাঙলার শেষ বিখ্যাত সুলতান। তাঁরই সময়ে বাঙলায় চৈতন্যদেবের (১৪৮৫-১৫৩৩) আবির্ভাব ঘটে। বাঙলায় বিদেশী বণিক পর্তুগীজদের আগমনও এই সময় ঘটে। যদিও 'ওড়িয়া ও

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে বলা হয়েছে যে হুসেন শাহ ওড়িশা আক্রমণ করে বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ভেঙেছিলেন, তা হলেও আমরা জানি যে রূপ ও সনাতন নামে দুজন ব্রাহ্মণ হিন্দুই তাঁর প্রধান অমাত্য ছিলেন। আরও যেসব হিন্দু হুসেন শাহের আমলে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন বল্লভ (রূপ ও সনাতনের ভাই), শ্রীকান্ত (তাঁদের ভগ্নীপতি), চিরঞ্জীব সেন (গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা), পদকর্তা কবিশেখর, দামোদর ও যশোরাজ, বৈদ্য মুকুন্দ, ছত্রী কেশব খান প্রমুখ। হুসেন শাহ জ্ঞানীগুণী লোকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে বাংলা সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বিপ্রদাস পিপলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রমুখদের প্রাদুর্ভাব তাঁর আমলেই ঘটেছিল।

হুসেন শাহের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাঙলা মুঘল সম্রাটগণের করায়ত্ত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে বাঙলা কিছুকাল সুর ও কররানী বংশীয় আফগান নৃপতিদের অধীন ছিল। সুলেমান কররানীর (১৫৬৫-১৫৭২) সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দুদের দেবমন্দির ও দেবমূর্তিসমূহ ধ্বংসের জন্ত ইতিহাসে বিখ্যাত। যদিও হুমায়ুনের আমলেই (১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দে) গৌড় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, তা হলেও সম্রাট আকবরের সময় পর্যন্ত বিহার ও বাঙলায় আফগান আধিপত্যই ছিল। আকবরই স্বয়ং এক বিশাল মুঘলবাহিনী নিয়ে বিহারে প্রবেশ করেন। তাঁরই অনুজ্ঞায় তোদরমল্ল সেনাধ্যক্ষ খান জাহানকে সঙ্গে নিয়ে বাঙলা আক্রমণ করেন। এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে আফগান নৃপতি দায়ুদের পরাজয় ও নিধনের সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসের আফগান যুগের সমাপ্তি ঘটে। এর পর বাঙলায় মুঘল শাসনের সূচনা হয়।

পাঁচ

পাঠান আমলে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেই আমরা এ অধ্যায় শেষ করব। আমরা আগেই দেখেছি যে সুলতান ইলিয়াস শাহের সময় পর্যন্ত বাঙলার পাঠান সুলতানগণ দিল্লীর সুলতানগণেরই অধীন ছিলেন। সে সময় দেশশাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তা আমরা সঠিক কিছু জানি না। তবে প্রশাসনিক সুবিধার জন্ত সমগ্র রাজ্য যে কতগুলি অঞ্চল বা 'ইক্তা'তে বিভক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাজ্যের আমীরগণই

বিভিন্ন ইক্তার শাসক নিযুক্ত হতেন। ইক্তার শাসককে 'মোক্তা' বলা হত। সুলতানই বিভিন্ন ইক্তার শাসক নিযুক্ত করতেন।

সমগ্র রাজ্যের নাম ছিল 'গৌড়' বা 'লখনৌতি', কিন্তু পূর্ববঙ্গ যখন পাঠান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, তখন পূর্ববঙ্গকে 'অরসহ বঙ্গালহ' বলা হত। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ তুঘলক যখন বাঙলাদেশ সরাসরি নিজ অধিকারে রাখেন, তখন তিনি বাঙলাদেশকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন—লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও। বাঙলা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তখন সমগ্র বাঙলার নাম 'বঙ্গালহ' হয়। সমগ্র রাজ্য তখন কতকগুলি 'ইকলিম'-এ বিভক্ত হয়। ইকলিমের আবার কতকগুলি উপবিভাগ ছিল। সেগুলিকে বলা হত 'অরসহ'। দুর্গহীন শহরকে বলা হত 'কসবাহ' ও দুর্গযুক্ত শহরকে 'খিটটাহ'। সীমান্তরক্ষার ঘাঁটিগুলিকে বলা হত 'থানা'।

রাজধানীতে সুলতানের ছিল এক বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের ভিতর অংশে থাকত 'হারেম' বা অন্তঃপুরবাসিনীদের বাসস্থান। বাইরের অংশে থাকত এক প্রশস্ত দরবার কক্ষ। সুলতান সেখানেই মন্ত্রী, সভাসদ, সচিব ও পদস্থ কর্মচারিগণ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজকার্য সমাধা করতেন। অমাত্য, সভাসদ ও অভিজাতবংশীয় রাজপুরুষদের আমীর, মালিক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত 'খান-ই-জহান'। সচিবদের 'দবীর' বলা হত। প্রধান সচিবকে বলা হত 'দবীর-ই-খাস'। অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নাম ছিল 'খান মজলিস', 'মজলিস-অল্-আলা', 'মজলিস-আজম', 'মজলিস-অল-মুআজ্জম', 'মজলিস-অল-মজালিশ', 'মজলিস-বারবক' ইত্যাদি। এ ছাড়া, প্রাসাদের কর্মচারীদের নানা-রকম নাম ছিল, যথা 'হাজিব', 'সিলাহদার', 'শরাবদার', 'জমাদার', 'দরবান' ইত্যাদি।

রাজকোষে দু'রকমের রাজস্ব জমা পড়ত—'গনীমাহ' বা লুঠের ধন ও 'খরজ' বা খাজনা। লুণ্ঠনলব্ধ অর্থের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা পড়ত, বাকিটা সৈন্যগণের মধ্যে বণ্টিত হত। 'খরজ'-এর জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসংগ্রহের শর্তে ভার দেওয়া হত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপর। রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে বলা হত 'সর-ই-গুমাশতাহ'। নদীপথে যেসব পণ্য আসত, সে সবের ওপর শুল্ক যারা আদায় করত তাদের বলা হত 'কুতঘাট'। এছাড়া, আরও কর ছিল, যথা 'হাটকর', 'ঘাটকর', 'পথকর' ইত্যাদি। যারা মুসলমান নয়

তাদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' কর আদায় করা হত। আর কাজীদের কোন কর দিতে হত না।

রাজ্যের সৈন্যবাহিনী চারভাগে বিভক্ত ছিল, যথা অশ্বারোহীবাহিনী, গজারোহীবাহিনী, পদাতিক (বা পাইক) বাহিনী ও নৌবহর। বিভিন্ন বাহিনীর দলপতিদের নাম ছিল 'সর-ই-খেল'। নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হত 'মীর বহর'। যুদ্ধের অস্ত্র ছিল বর্শা, বল্লম, শূল প্রভৃতি। আর যুদ্ধ প্রধানত তীর-ধনুকের সাহায্যেই করা হত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে কামানের ব্যবহার শুরু হয়। সেনাদলে বিস্তর হিন্দু থাকত। হিন্দু সেনাপতিও ছিল। ইলিয়াসের সেনাপতিদের মধ্যে ছিল শিখাই সান্যাল, সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ি, কেশবরাম ভাদুড়ি প্রভৃতি।

বিচারকদের কাজী বলা হত। ইসলামিক বিধান অনুযায়ী তাঁরা বিচার করতেন। কোন কোন সময় সুলতান নিজেও বিচার করতেন। হিন্দুদেবতার নাম করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। রাজদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

ছয়

পাঠান সুলতানদের আমলে প্রভূত বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছিল, বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে। গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মালদহকে কেন্দ্র করে তাঁরা অনেক রাস্তাঘাট, পুষ্করিণী, বাঁধ, সেতু, পরিখা, প্রাকার, দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন বহু মসজিদ, সমাধি-সৌধ ও তোরণ নির্মাণের জন্য, যদিও এগুলির নির্মাণে বিধ্বস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ-মন্দির-বিহারের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল। গৌড় নগরে তাঁরা যেসব মসজিদ, সৌধ ও তোরণ নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে দখল দরজা বা গৌড় নগরের সিংহদ্বার, লুকোচুরি দরজা বা রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার, বাইশগজী প্রাচীর, কদম রসুল, চিকা মসজিদ, লোটন মসজিদ, ফিরোজশাহ মিনার, চামকাটি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, গুণমন্ত মসজিদ, বড়সোনা মসজিদ, কোতয়ালী দরজা, রাজবিবি মসজিদ, বেগ মহম্মদ মসজিদ, পিঠাওয়ালী মসজিদ, আখি সিরাজের সমাধিসৌধ, ঝনঝনিয়া মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, ফিরোজপুর দরজা, দরসবাড়ী মসজিদ, ফতে ইয়ার খাঁর কবর, ইত্যাদি।

পাণ্ডুয়াতেও তাঁরা অনুরূপ অনেক সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, যথা ছোট দরগা বা জালেশ্বরী, সোনা মসজিদ, সিকন্দর শাহের কবর, সাতাশ ঘরা ইত্যাদি। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ন্যায় তাঁরা মালদহেও অনেক মসজিদ ও সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। পাঠান যুগের মসজিদ স্থাপত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে পাঠানরা ভারতে 'গম্বুজ' ও 'মিনার'-এর কল্পনা প্রবর্তন করেছিলেন। মনে হয় এই মিনারের কল্পনা থেকেই পরবর্তীকালে 'রত্ন' মন্দিরের কল্পনা উদ্ভূত হয়েছিল।

বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙলার মুসলমানদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—১. আগন্তুক মুসলমান। ২. ধর্মান্তরিত মুসলমান, ৩. উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত মুসলমান।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাঙলার মুসলমান শাসকগণ ও পাঠান সুলতানগণ কর্তৃক রাজ্যের উচ্চপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আনীত বিদেশী মুসলমানগণের বংশধরগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বা যাদের বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের বংশধরগণ। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানগণের বংশধরগণ। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

বাঙলায় মুসলমানসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পর। ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি প্রথম বাঙলা জয় করার সময় থেকে শুরু করে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃক দেওয়ানি গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই সার্ধ পাঁচশত বৎসর বাঙলা মুসলমানগণের অধীনে থাকে। আগন্তুক মুসলমানই বলুন, আর ধর্মান্তরিত মুসলমানই বলুন, বা এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানই বলুন, তাদের সকলেরই উদ্ভব হয়েছিল এই সার্ধ পাঁচশ বছরের মধ্যে। তবে এর পর যে কেউ মুসলমান হয়নি, এমন কথাও সত্য নয়। এর পরও হিন্দু মুসলমান হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সেরূপ মুসলমানরা সকলেই দেশজ মুসলমান।

দুই

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত আদমশুমারির সময় মুসলমানরা দাবি করেছিল যে তারা দেশজ-সম্প্রদায় নয়, তারা সকলেই বাঙলায় আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর। তার মানে তারা সকলেই সৈয়দ, মুঘল ও আফগান শাসকমণ্ডলীর বংশধর। সে দাবিটা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তা তৎকালীন আদমশুমারির কমিশনার ই. এ. গেট (E. A. Gait) প্রমাণ করেন। তিনি বলেন যে, যেসকল রাজকীয় মুসলমান কর্মচারীদের এদেশে আনা হয়েছিল তারা

তৎকালীন রাজধানীসমূহ যথা গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরের নিকট এসে বসবাস করেছিল। তারা তৎকালীন সুলতান ও নবাবদের কাছ থেকে বসবাসের জন্ত ভূমিদানও পেয়েছিল। সেই সকল ভূমিদানসংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ওই সকল ভূমিদান তারা গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মুর্শিদাবাদের নিকটেই পেয়েছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলমান জনসংখ্যার বিন্তাস দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে যদিও এরূপ ভূমিদান সংক্রান্ত দলিলাদি উত্তর ও পূর্ববঙ্গে খুবই কম, তথাপি বাঙলার এই দুই অংশেই মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে মুসলমানদের যে জনবিন্তাস ছিল, সেই সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকেও তা বোঝা যায়। যথা—

অঞ্চল	মুসলমান জনসংখ্যা	প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	১,০৮৬,৪২৭	১,৩১৭
মধ্যবঙ্গ	৩,৭৭৩,৩২১	৪,৮৭৫
উত্তরবঙ্গ	৫,৮৭৬,৪০৮	৫,৮৭৩
পূর্ববঙ্গ	১১,২২০,৪২৭	৬,৬১৭

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিটা বুকানন হ্যামিলটনও (Buchanan Hamilton) লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা যে বাঙলায় আগন্তুক মুসলমানগণের বংশধর, এরূপ বিবেচনা করবার সপক্ষে বিশেষ কিছু প্রমাণ নেই। তিনি বলেছিলেন যে, তারা ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমান ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তীকালে একজন মুসলমান লেখকও এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে, উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা মঙ্গোলীয় কোচ জাতির দৈহিক লক্ষণসমূহ বহন করে।' তার মানে তারা ধর্মান্তরিত কোচ (বর্তমানে রাজবংশী) জাতি হতে উদ্ভূত। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও যে ধর্মান্তরিত দেশজ হিন্দুজাতিসমূহ হতে উদ্ভূত, তা ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ড. ওয়াইজ-ও (Dr. Wise) বলেছিলেন।

বস্তুত চতুর্দশ শতাব্দীতে কিছুকালের জন্ত মুসলমান সুলতানরা পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ হতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা পীর, দরবেশ ও মোল্লা নিযুক্ত করে পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পাইকারি হারে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। পঞ্চদশ

শতাব্দীতে সুলতান জালালুদ্দিনের সময় (১৪১৮-১৪৩৩) এই ধর্মান্তরিত করার অভিযান তুঙ্গে উঠেছিল। দুর্বল নিম্নসম্প্রদায় হিন্দুদের কাছে দুটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল—'হয় কোরান গ্রহণ কর, আর তা নয়ত মৃত্যু বরণ কর।' প্রাণভয়ে অনেকেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। যারা অস্বীকৃত হয়েছিল, তারা কামরূপ, আসাম ও কাছাড়ের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ধর্মান্তরিতকরণ সম্বন্ধে বার্নিয়ার (Bernier) তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এক কাহিনীর উল্লেখ করে গিয়েছেন। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিশানা ছিল, ঘরের চালের উপর একটা 'বদনা' বসিয়ে রাখা। একবার এক মৌলবি কিছুদিনের জন্য দেশান্তরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এক ধর্মান্তরিত মুসলমানের ঘরের চালে আর 'বদনা' দেখতে পান না। অনুসন্ধানে জানলেন যে লোকটা আবার হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ জাতিভুক্ত হয়েছে। ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি নবাবের নিকট ফৌজ পাঠাবার আবেদন জানান। নবাব একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ওই সৈন্যদলের সাহায্যে মৌলবি সমগ্র গ্রামের লোকদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

বাঙলার মুসলমানগণ যে আগন্তুক মুসলমান নন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, মুসলমান ইতিহাসকারগণ কেউই লিখে যাননি যে, কোনকালে উত্তর-ভারত থেকে দলবদ্ধভাবে মুসলমানরা এসে বাঙলাদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। বরং আমরা জানতে পারি যে, বাঙলাদেশে যেসকল পাঠান ও আফগান মুসলমান ছিল, তারা সম্রাট আকবর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ওড়িশায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মুঘল যুগে পূর্ববাঙলাকে অস্বাস্থ্যকর জায়গা বলে মনে করা হত, এবং যেসকল রাজকীয় কর্মচারী এখানে আসতেন, তাঁরা আবার দিল্লী কিংবা আগ্রায় ফিরে যেতেন। একমাত্র যেখানে কিছুসংখ্যক বিদেশী মুসলমান ছিল, সে জায়গাটা হচ্ছে চট্টগ্রাম। বাণিজ্য উপলক্ষে আরবদেশীয় যেসকল মুসলমান বণিক চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা হচ্ছে তাদের বংশধর।

তিন

জোরজুলুম করেই যে মুসলমান করা হত, তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হত। এরা অধিকাংশই হিন্দুসমাজের অবহেলিত নিম্নসম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ এদের হীন চক্ষে দেখতেন। এসকল সম্প্রদায় ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

‘খানকা’ দ্বারাও আকৃষ্ট হত। খানকাগুলি ছিল মসজিদ ও দরগার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান, যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া-দাওয়া দুইই পাওয়া যেত। এছাড়া ছিল পদস্খলিতা হিন্দু সধবা ও বিধবা। হিন্দু-সমাজে এদের কোন স্থান ছিল না। যদি হিন্দু রমণী মুসলমানের সহিত বার হত, তা হলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তার মুসলমান উপপতির পরিবারে বিবির স্থান পেত। এ ছাড়া ছিল দেশে দাসদাসীর ব্যবসা। অসময়ে দুঃস্থ জনসাধারণ তাদের ছেলে-মেয়ে বেচে দিত। যখন মুসলমানরা তাদের কিনত, তখন তারা তাদের ধর্মান্তরিত করত।

উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুরা খুব কমই ধর্মান্তরিত হত। তবে যাদের যবনদোষ ঘটত (নিষ্ঠাবান সমাজের পাতি অনুযায়ী মুসলমানের খাদ্য আঘ্রাণ করলেও যবনদোষ ঘটত), নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ তাদের একঘরে করত। তাদের মধ্যে অনেকেই মর্যাদা পাবার জন্য মুসলমান হয়ে যেত। এছাড়া, মুরশিদকুলি খানের আমলে কোন জমিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন, তা হলে তাঁকে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হত।

বাঙলার মুসলমানরা যে হিন্দুসমাজ থেকেই ধর্মান্তরিত, তা তাদের আচার-ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা যায়। এসকল আচার-ব্যবহার বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। প্রথমত, তারা ধর্মান্তরিত হবার পূর্বে হিন্দুসমাজে যেসকল কৌলিক বৃত্তি বা পেশা অনুসরণ করত, মুসলমান হবার পরেও তাই করত। দ্বিতীয়, এদের ভাষা ও সাহিত্য থেকেও তাই প্রকাশ পায়। তৃতীয়, তাদের নামকরণ থেকেও তাই বুঝতে পারা যায়—যেমন কালি শেখ, কালাচাঁদ শেখ, ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডল, হারু শেখ ইত্যাদি। চতুর্থ, ধর্মান্তরিত হবার পরেও তারা হিন্দুর অনেক সংস্কার ও লৌকিক পূজাদি অনুসরণ করত। যেমন দুর্গাপূজার সময় তারা হিন্দুদের মতো নূতন কাপড়-জামা পরে পূজা-বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করতে যেত। ছেলে-মেয়ের বিবাহের সময়ও তারা হিন্দু জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করত। দৈনন্দিন জীবনেও তারা হিন্দুর বিধি-নিষেধ মানত ও হিন্দুর পঞ্জিকা অনুসরণ করত। মহামারীর সময় শীতলা, রক্ষা-কালী প্রভৃতির পূজা করত, ও শিশু ভূমিষ্ঠ হলে ষষ্ঠীপূজা করত। এমনকি, অনেক জায়গায় বিবাহের পর মেয়েরা সিঁদুরও পরত। এসকল আচার-ব্যবহার সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও মোল্লাদের প্ররোচনায় ক্রমশ বর্জিত হয়েছে।

· চার

মোট কথা, বাঙালী মুসলমান মূলত বাঙলাদেশেরই ভূমিসন্তান। আজ স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যে নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, তার পিছনে যথেষ্ট ঐতিহাসিক সত্য আছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের দিক দিয়েও এই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হয়। রিজলি যে পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শিরাকার-সূচক-সংখ্যা ঠিক ওই অঞ্চলের নমঃশূদ্রদের শিরাকার-সূচক-সংখ্যার সহিত একেবারে অভিন্ন। এইসকল মুসলমানদের নাসিকাকার-সূচক-সংখ্যা নমঃশূদ্রের চেয়ে বেশি, কিন্তু পোদদের চেয়ে বেশি তফাৎ নয়। নীচে এই তিন গোষ্ঠীর সূচক-সংখ্যা দেওয়া হল—

জাতি	শিরাকার-সূচক-সংখ্যা	নাসিকাকার-সূচক-সংখ্যা
মুসলমান	৭৭·৯	৭৭·৫
নমঃশূদ্র	৭৮·১	৭৪·২
পোদ	৭৭·৮	৭৬·৪

পূর্ববঙ্গ ছাড়াও, বাঙলার অন্য অঞ্চল হতে যে পরিমাপ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে—

অঞ্চল	শিরাকার-সূচক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
রাঢ়	৭৮·৬	১৬৬৩
বরেন্দ্র	৭৮·৬	১৬৬৪
বঙ্গ	৭৮·৮	১৬৫১
চট্টল	৭৬·৭	১৬৫৫
সমতট	৮০·৩	১৬৫৮
কলিকাতা	৮০·০	১৬৬০
সমষ্টিগত গড়	৭৯·৭	১৬৫৪

এইসকল সূচক-সংখ্যা থেকে পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালী মুসলমান বাঙলার অন্যান্য জাতির ন্যায় বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি। উত্তর ভারতের দীর্ঘশিরস্ক জাতিসমূহের সহিত তাদের সংমিশ্রণ খুব কমই ঘটেছে। এক কথায় বাঙালী মুসলমান, বাঙলাদেশেরই ভূমিসন্তান, তারা আগন্তুক নয়।

বাঙলার মুসলমান সমাজ

এবার আমরা মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলব। ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর, বাঙলায় বেশ সংখ্যা-গরিষ্ঠ এক মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠে। তবে এটা ভাবলে ভুল হবে যে বখ-তিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পূর্বে বাঙলায় মুসলমান ছিল না। আরবদেশীয় বণিকগণ, যারা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য করত, তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটা মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তবে বাঙলায় সমগ্র জনসমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তারা নগণ্য।

বখতিয়ার খিলজি একহাতে কোরান ও অপর হাতে অসি নিয়েই বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। সুতরাং গোড়া থেকেই আগন্তুক মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর মঠ মন্দির ও প্রতিমা ভাঙার ও ধর্মান্তর-করণের এক উন্মাদনা ছিল। সঙ্গে তাদের স্ত্রীলোকও কম ছিল। সেজন্য এদেশের মেয়েদের বিয়ে করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রাহ্মণদের আত্মশ্লাঘা ও হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি অবিচার মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম প্রচারে সাহায্য করেছিল। অনেককে অবশ্য বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অনেকেই ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। অনেকে আবার পীর, ফকির ও মুসলমান সাধুসন্তদের মহিমায় আকৃষ্ট হত। এ ছাড়া ছিল ধর্ষিতা, লুণ্ঠিতা, অপহৃতা ও পদস্খলিতা নারী। হিন্দুসমাজে তাদের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়ে যেত, তা হলে সে মুসলমান সমাজে বিবির আসন পেত। বাঙলার অধিকাংশ মুসলমানই এই তিন শ্রেণীর। বাঙলার জনসমুদ্রে এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর মধ্যে ছিটেফোঁটা হিসাবে ছিল কিছুসংখ্যক বহিরাগত মুসলমান। বস্তুতঃ বাঙলার মুসলমান বাঙালীই, মাত্র ধর্মের তফাত। (লেখকের 'বাঙলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', জিজ্ঞাসা, দ্রষ্টব্য)।

বখতিয়ার খিলজি আসবার দু'শ বছর পর পর্যন্ত বাঙলায় চলেছিল বিপর্যয়ের এক তাণ্ডবলীলা। নিষ্ঠুরভাবে চলেছিল হিন্দুনিপীড়ন, হিন্দুর মঠ-মন্দির ও প্রতিমা ভাঙা ও ধর্মান্তরকরণের ঢেউ। গোড়ায় যে নূতন শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, তাতে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের স্থান ছিল, হিন্দুদের ছিল না। এ ছাড়া, হিন্দু-

দের ওপর নানারকম বৈষম্য ও ঘৃণিত জিজিয়া কর স্থাপন করা হয়েছিল। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে যখন মুসলমান সুলতানরা হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করতে থাকে। (পরে দ্রষ্টব্য)। সেটা প্রথম শুরু হয় সুলতান ইলিয়াস শাহ-এর আমল (খ্রী: ১৩৭২-১৩৫৮) থেকে। তার পর থেকেই পর পর কয়েকজন সুলতান হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে। তাদের আমলে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ক্রমশ হ্রাস পায় ও অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করা হয়। এতে সাধারণ হিন্দুদেরও মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে। সুলতানের পক্ষ নিয়ে হিন্দু সৈন্যরা ওড়িশা অভিযানে যোগ দেয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য অনেক হিন্দু জমিদার নিযুক্ত হয়। অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যশ্রেণীর হিন্দুরা রাজানুগ্রহ লাভ করে। সুলতানদের দরবারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও স্থান হয়। বৃহস্পতি মিশ্র একাধিক মুসলমান সুলতানের মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতান হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ) যশোহর নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত ও মহাকবি সনাতন ও তাঁর ভাই রূপ যথাক্রমে 'দবীর-খাস' ও 'সাকর মল্লিক' ছিলেন। তাঁদের অপর ভাই অনুপ (নামান্তর বল্লভ) 'মুদীর-ই-জবর' ছিলেন। 'দবীর-খাস' মানে গোপন-সচিব, সাকর মল্লিক 'প্রধান অমাত্য', 'মুদীর-ই-জবর' মানে 'মাস্টার অভ্ মিন্ট' ইত্যাদি। হুসেন শাহের দুই যুদ্ধাভিযানের সেনাপতি ছিলেন দুই বাঙালী হিন্দু। তাঁদের মধ্যে একজন গৌর মল্লিক পরিচালনা করেছিলেন ত্রিপুরা অভিযান। আর একজন সেনাপতি রামচন্দ্র খান রাজ্যের দক্ষিণাংশের অধিকর্তা ছিলেন। এছাড়া, রাজ-অন্তঃপুরে হিন্দু বৈদ্যদেরও চিকিৎসা করতে দেওয়া হত। এ সময় সুলতানদের অনুগ্রহে বহু হিন্দু কবি তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের কথা অন্য অধ্যায়ে বলেছি।

সরকারী রাজস্ব বিভাগেরও অনেক হিন্দু নাম অবলুপ্ত করা হত না। আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী তুর্ক-আফগান যুগের শেষপাদে বিদ্যমান ১৯টি সরকারী রাজস্ব বিভাগের মধ্যে ১০টির হিন্দু নাম ও ৯টির মুসলমান নাম ছিল। আবার অনেকসময় হিন্দু নামের সঙ্গে মুসলমান্ শব্দ ও মুসলমান নামের সঙ্গে হিন্দু শব্দ যোগ করে দেওয়া হত। যথা রাজশাহী, মহম্মদপুর, বারবাকপুর ইত্যাদি।

দুই

যেহেতু বাঙলা ছিল গ্রামপ্রধান দেশ ও গ্রামের মুসলমানরা ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান, সেই হেতু তারা ধর্মান্তরিত হবার পর তাদের পূর্বেকার হিন্দুজীবনের সনাতনী সংস্কার ও লোকাচারসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করত। যেমন, জন্মের পর জ্যোতিষীকে দিয়ে পুত্রের কোষ্ঠী তৈরী করানো ও বিবাহের সময় জ্যোতিষীকে দিয়ে শুভদিন বিচার করিয়ে নেওয়া। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই সনাতনী সংস্কারের বেশী বশীভূত ছিল। অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় হিন্দুদের নানাবিধ মামুলী সংস্কার মানত ও শিশু জন্মের পর হিন্দুনারীদের মতো নানাবিধ অনুষ্ঠান পালন করত। এছাড়া, মুসলমানরা শীতলা, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি দেবতার স্থানে পূজা ও হিন্দুদের পূজা ও শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিত। অনেকে ধর্মান্তরিত হবার পরও হিন্দুনাম পরিহার করত না। কালু শেখ, হারু শেখ ইত্যাদি নাম মুসলমানদের মধ্যে সচরাচর দেখতে পাওয়া যেত। মালতী নামে এক মুসলমান মহিলা এক মসজিদ তৈরী করে দিয়েছিলেন। শুকোধন নামে এক মুসলমান তন্তুবায়ের নামও আমরা শুনি। ধর্মান্তরিত হবার পর অনেক মুসলমান তাদের পূর্বেকার কৌলিক বৃত্তি পরিহার করত না।

বস্তুতঃ গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান সদ্ভাবেই বাস করত। পরস্পর পরস্পরকে 'চাচা', 'চাচী' প্রভৃতি সম্ভাষণে সম্বোধন করত। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-তে একটি বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ আছে। চৈতন্য রোষান্বিত হয়ে যখন কাজীর বাড়ি চড়াও হন, তখন কাজী চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন—'গ্রাম সম্পর্কে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা। দেহসম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥ নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥' গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সম্প্রীতি গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। মাত্র বিংশ শতাব্দীতে নানা কারণে এই সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটেছে।

তিন

হিন্দুদের প্রতি বাঙলার সুলতানদের বিদ্বেষভাব হ্রাস পেতে থাকে যখন মুসলমান হিন্দুমেয়ে বিয়ে করতে থাকে। এটা শুরু হয়েছিল সুলতান ইলিয়াস শাহের সময় (খ্রীঃ ১৩৪২-১৩৫৮) থেকে। তিনি বিয়ে করেছিলেন

বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের ফুলমতি নামে এক বামুনের মেয়েকে। তাঁর পরবর্তী সুলতান সিকন্দর শাহ-ও (খ্রীঃ ১৩৫৮-১৩৯০) বিয়ে করেছিলেন এক হিন্দু মেয়েকে। তাঁর হিন্দুপত্নীর গর্ভজাত সন্তান হচ্ছেন পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (খ্রীঃ ১৩৯০-১৪১০)। আবার রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব (খ্রীঃ ১৪১৪-১৪১৫) গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ-এর বিধবা পত্নী ফুলজানিকে বিয়ে করেছিলেন। পরবর্তী সুলতান যদু জয়মল বা সুলতান জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ (খ্রীঃ ১৪১৮-১৪৩৩) গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ-এর কন্যা আশমানতারাকে বিয়ে করেছিলেন। এক কথায় মুসলমান সুলতানরা যেমন হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করতেন, হিন্দুরাও তেমনই মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করতেন, বলে মনে হয়। এই যুগে এরূপ বিবাহ প্রায়ই ঘটত। তাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ মদন তাদুড়ীর পুত্র কন্দর্পদেব সুলতান হুসেন শাহ-এর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ) এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। বোধ হয় মদন তাদুড়ীর একাধিক পুত্রের সঙ্গে মুসলমান কন্যার বিবাহ হয়েছিল। সুলতান হুসেন শাহ-এর এক উজির চতুরঙ্গ খানও এক মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভজাত দুই পুত্র সুবি খান ও সুচি খান খুলনা জেলার সেনের বাজারের কাজী নিযুক্ত হয়েছিল। এই কাজী পরিবার হিন্দু কুলোদ্ভব বলে গর্ব অনুভব করত। এরূপ হিন্দু মুসলমান বিবাহের ফলই পীরালী ব্রাহ্মণ। কথিত আছে যে পনেরো শতকের মাঝখানে এক ব্রাহ্মণ পীরজাহান আলি দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর তাঁর নাম হয় তাহের আলি। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। একজন মুসলমান। অপরজন হিন্দু। হিন্দু স্ত্রীর ছেলেরাই পীরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। আর মুসলমান স্ত্রীর পুত্ররা নিজেদের তাহেরিয়া নামে অভিহিত করে। যে পীরজাহান আলি, তাহের আলিকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, তিনি নিজেও সোনামণি নামে এক হিন্দুমেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। মেয়েটি স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মঘাতী হয়েছিল। পীর ফকিররা অনুরূপভাবে প্রায়ই হিন্দুমেয়েদের বিবাহ করতেন। এরূপ এক ফকির সাত-ক্ষীরার রাজা মুকুটরায়কে নিহত করে রাজকন্যা চম্পাবতীকে বিয়ে করেছিলেন। এরূপ বিবাহের পর হিন্দুমেয়েরা অনেকসময়েই তাঁদের পতিভক্তির জন্য প্রসিদ্ধা হয়ে রয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরমবৈষ্ণব আনন্দময়ীর উল্লেখ করা যেতে পারে। আনন্দময়ী মুর্শিদাবাদের মুর্তজা খানকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর পতিভক্তি অনেক ছড়াগানের মাধ্যমে লোকমানসে এখনও জাগরুক হয়ে রয়েছে।

চার

হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের এক বিরাট পার্থক্য ছিল বিবাহ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধানে। হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান সমাজেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে হিন্দুদের স্ত্রী-গ্রহণের যেমন কোন পার্যন্তিক সীমা ছিল না, মুসলমান সমাজে কিন্তু শরিয়াত অনুযায়ী চার-এর ওপর স্ত্রী-গ্রহণ অবৈধ ছিল। হিন্দুবিবাহের সঙ্গে মুসলমানবিবাহের মূলগত পার্থক্য ছিল এই যে, হিন্দুবিবাহে যেমন বিচ্ছেদ ঘটে না, মুসলমান বিবাহে বিচ্ছেদ বা তালাক ঘটানো যায়। তাছাড়া, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হিন্দুর মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ সম্পর্কিত বিধি, মুসলমানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

মুসলমান সমাজ সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওই সমাজে হিন্দুদের মতো জাতিভেদের কোন অবকাশ ছিল না। তবে বাঙলায় আসবার পর এখানে চার শ্রেণীর মুসলমানের উদ্ভব ঘটেছিল। এই চার শ্রেণী হচ্ছে (১) বহিরাগত আমীর-ওমরাহরা, যাঁরা সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে আসতেন। এরূপ মুসলমানরা সাধারণত রাজধানী ও নগরসমূহের আশপাশে বসতি স্থাপন করতেন, (২) আগন্তুক মুসলমান যাঁরা স্ত্রী আনতেন না, এবং বাঙলায় এসে বিয়ে করতেন, (৩) এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমান, ও (৪) মিশ্র মুসলমান, মানে যাদের মাতাপিতার কেউ হিন্দু হতেন। (এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লেখকের 'বাঙলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৫১-৫৭ দ্রষ্টব্য)।

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন না থাকলেও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তাঁদের ধর্মান্তরিত হব'র পূর্বেকার হিন্দুর সনাতনী আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি পরিহার করতে পারতেন না। অনেক মিশ্র মুসলমান যাদের পিতা-মাতার মধ্যে কেউ হিন্দুব্রাহ্মণ হতেন, সে সকল মুসলমান নিজেদের ব্রাহ্মণ মুসলমান বলে অভিহিত করে গর্ব অনুভব করতেন। এখনও অনেকে করেন। তা ছাড়া ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ধর্মান্তরিত হবার পূর্বেকার কৌলিক বৃত্তি পরিহার করতেন না। মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা মূলতঃ কৌলিক বৃত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেদিক থেকে মুসলমান সমাজে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কৌলিকবৃত্তি পরিহার না করার মধ্যে আমরা মুসলমান সমাজের ওপর হিন্দুসমাজেরই প্রভাব লক্ষ্য করি। পরন্তু, মধ্যযুগের শেষভাগে আমরা হিন্দুসমাজের ওপর মুসলমান পীর, ফকির, সাধু-

সন্ত ও সূফী সম্প্রদায়ের প্রভাবও লক্ষ্য করি। মুসলমান হয়ে গেলেও গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সম্প্রীতিমূলক মনোভাব নিয়েই পাশাপাশি বাস করত। তবে যেসব হিন্দু বেশী মেলামেশা করত বা হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য মুসলমানগৃহে গ্রহণ করত, তাদের 'যবনদোষ' ঘটত এবং হিন্দুরা তাদের একঘরে করে দিত। তবে ভাল মুসলমানরা কখনও ইচ্ছা করে হিন্দুদের যবনদোষ ঘটাত না। কথিত আছে যে যুক্ত বাঙলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের পরিবারের জমিদারীর মধ্য দিয়ে যে সকল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি হিন্দুরা গ্রামান্তরে যেত, তাদের ফজলুল হক-পরিবার কখনও অভুক্ত অবস্থায় যেতে দিতেন না। তাদের স্নানাহারের জন্য ওই পরিবার হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিচালিত অতিথিশালা রক্ষা করতেন। এছাড়া গ্রামে হিন্দুদের জন্য মুসলমানরা পৃথক হুঁকা রাখতেন। এক কথায় উত্তম শ্রেণীর মুসলমানরা কখনও ইচ্ছাপূর্বক হিন্দুর ধর্ম কলুষিত হতে দিতেন না।

নাগরিক মুসলমান সমাজের হিন্দুদের প্রতি অন্য মনোভাব থাকলেও, গ্রামে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল না। গ্রামের মুসলমানরা হিন্দুর বাড়ীর বিয়ে-সাদি, দুর্গাপূজা ইত্যাদি উপলক্ষে হিন্দুদের মতো ভাল জামাকাপড় পরে পূজা বা বিয়েবাড়ীতে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, হিন্দুরাও তেমনই মুসলমানদের মহরম ইত্যাদি পরবে যোগদান করত। আবার বসন্ত, ওলাওঠা ইত্যাদির প্রকোপের সময় মুসলমানরা যেমন শীতলাতলা ও ওলাদেবীর থানে এসে পূজা দিত, হিন্দুরাও তেমনই ছেলেদের নজর লাগলে মুসলমানদের দরগা থেকে জলপড়া এনে ছেলেদের পান করাত। এছাড়া ভূতে পেলে মুসলমান রোজাও ডাকা হত। এছাড়া, মুক্তিসাধনার ক্ষেত্রে সত্যপীর, বনবিবি, গাজী সাহেব, ঘোড়া সাহেব ইত্যাদির পূজা করা বা তাঁদের আস্তানায় অর্ঘ্যদান করা হিন্দুসমাজে ঢুকে গিয়েছিল। এসব ছাড়া, হিন্দুদের সাল গণনা, যা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত, তা সম্রাট আকবরের সময় মুসলমানী বৎসরের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে বলা হয়, যদিও এটা প্রমাণসাপেক্ষ।

বাঙালী সমাজের ওপর মধ্যযুগের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ভাষা ও সাহিত্যের ওপর। বাংলা ভাষা বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছিল মুসলমানী আরবী ও ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশের ফলে। অজ্ঞাতসারে আজকের দিনে আমরা আমাদের কথাবার্তায় যেসব শব্দ ব্যবহার করি, তার মধ্যে অনেক শব্দই এ জাতীয়। যেমন, গোলমাল, জাহাজ, দেওয়ান, জিলা, ইজারা, বনিয়াদ,

বরকন্দাজ, রিয়াজ, মকদ্দমা, হানি, মকুব, মক্কেল, মখমল, মগজ, মসলিন, মজা, মজুত, মজুর, শরবত, শরিক, শর্ত, শহর, শহিদ ইত্যাদি।

মুসলমানী শব্দ যেমন বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল, বাংলা সাহিত্যকে তেমনই শক্তিবান করেছিলেন অনেক মুসলমান কবি। এটা বিশেষভাবে ঘটেছিল চৈতন্যোত্তর যুগে। বৈষ্ণবসাহিত্য বিশেষভাবে মুসলমান সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। ন্যূনপক্ষে ১২১ জন মুসলমান কবির রচিত বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের জানা আছে। মধ্যযুগের এই ধারা আজও বজায় রয়েছে। আজ বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হলেও, বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা (বা মাতৃভাষা) রূপে গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের মনীষীরা আজ বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করছেন। তাঁরা মনে করেন যে বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা একই জাতি ও একই সংস্কৃতির ধারক।

১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি যখন বাঙলা অধিকার করেন, বাঙলায় তখন দুই প্রধান সমাজ ছিল—বৌদ্ধ সমাজ ও হিন্দু সমাজ। মুসলমানদের মঠ-মন্দির-মূর্তি ভাঙার তাণ্ডবলীলার উন্মাদনা দেখে দুই সমাজই বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই তিব্বত ও নেপালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর যারা বাঙলাদেশেই থেকে যাবার পছন্দ করে, তারা প্রথমে গিয়ে আশ্রয় নেয় উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রাজশাহী জেলাতে। কিন্তু সেখানেও নিরাপত্তার অভাব দেখে তারা আসামের দিকে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও তারা মুসলমানদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে দলে দলে কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করে। কেননা, বহুপ্রাচীন কাল থেকেই কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের এক উপনিবেশ ছিল। চট্টগ্রাম সে সময় আরাকান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বৌদ্ধধর্মের বেশ এক প্রাণবন্ত কেন্দ্র ছিল। সে কারণেই বাঙলার পলায়মান বৌদ্ধরা বৌদ্ধ-ঐতিহ্যমণ্ডিত চট্টগ্রামকেই তাদের নিরাপদস্থল গণ্য করে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা প্রাচীন বৌদ্ধ-ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব বিকাশ ঘটায়। চট্টগ্রামের বর্তমান বৌদ্ধরা তাঁদেরই বংশধর।

দুই

বৌদ্ধদের অদৃষ্ট ভাল ছিল বলে, তারা ধর্মদ্বেষী ইসলামিক অভিযানের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু হিন্দুদের অদৃষ্ট ছিল মন্দ। সেজন্য তাদের এদেশেই থেকে যেতে হয়েছিল। তাদেরই মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও ধর্মান্তরকরণের বলি হতে হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় মুসলমানদের ধর্মান্তরকরণের বলি হয়েছিল। কেননা, ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের মধ্যে তারা ছিল অত্যাচারিত ও নিপীড়িত শ্রেণী। আগের এক অধ্যায়েই বলেছি যে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের এই অবহেলিত ও নিপীড়িত নিম্নশ্রেণীর কাছে মুসলমান শাসকরা দুটি প্রস্তাব রেখেছিল—'হয় কোরান গ্রহণ কর, আর তা

নয়তো মৃত্যু বরণ কর।[৮] যেখানে প্রাণের প্রশ্ন ছিল, সেখানে প্রাণভয়ে তারা অনেকেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া, তারা দেখেছিল যে মুসলমান হলে তারা ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে চির-কালের মতো নিষ্কৃতি পাবে। এই পটভূমিকাতেই মধ্যযুগে হিন্দুসমাজের স্রোতো-ধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

তিন

এই সকল কারণে হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন করে আবার একটা জাতি-বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। একটা 'মীথ' (myth) সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার দ্বারা প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছিল যে বাঙলার সকল জাতির মধ্যেই, হয় পিতৃকুলে, আর তা নয়তো মাতৃকুলে, উচ্চবর্ণের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে বাঙলায় কোন দিনই চতুর্বর্ণভিত্তিক জাতিপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার জাতিসমূহের এই সঙ্করত্বকেই ভিত্তি করে, বাঙলায় মুসলমান রাজত্ব শুরু হবার অব্যবহিত পরেই রচিত হয়েছিল 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ প্রথম বাঙলার জাতিসমূহকে বিভক্ত করা হয়েছিল তিন শ্রেণীতে—(১) উত্তম সঙ্কর (২) মধ্যম সঙ্কর, ও (৩) অন্ত্যজ। কোন্ কোন্ জাতিকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল তার একটা তালিকা আমরা আগের এক অধ্যায়ে দিয়েছি। বাঙলার জাতিসমূহ যে সঙ্কর জাতি তা 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাঙলার জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তবে এই সংমিশ্রণ যে কার সঙ্গে কার ঘটেছিল, তার প্রকৃত হদিশ পাওয়া যায় না, কেননা বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে এদের বিভিন্ন রকম উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। কোথাও বা কোন জাতি অনুলোম-বিবাহের ফসল, আবার কোথাও বা তারা প্রতিলোম-বিবাহের ফসল। এটা নীচের তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে—

	জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
১.	অম্বষ্ঠ	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫, ৭, ৯, ১২
		২. ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪
২	আগুরি	করণ	রাজপুত্র	৮

	জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র*
৩.	উগ্র	১. ক্ষত্রিয়	শূদ্র	১, ৫, ১২, ৬
		২. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৯
		৩. বৈশ্য	শূদ্র	৪
৪.	কর্মকার	১. বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
		২. শূদ্র	বৈশ্য	২
		৩. শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
৫.	করণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৬
৬.	চর্মকার	১. শূদ্র	ক্ষত্রিয়	৯
		২. বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৯
		৩. বৈদেহক	নিষাদ	৬
		৪. অয়োগব	ব্রাহ্মণ	৮
		৫. তিবর	চণ্ডাল	৩
		৬. তক্ষণ	বৈশ্য	২
৭.	তিলি	গোপ	বৈশ্য	২
৮.	তেলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
৯.	তাম্বলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
১০.	কংসবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
১১.	চণ্ডাল	শূদ্র	ব্রাহ্মণ	৬
১২.	নাপিত	১. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
		২. ক্ষত্রিয়	শূদ্র	২
		৩. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৯
		৪. ক্ষত্রিয়	নিষাদ	৮
১৩.	বাগ্‌দী	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৬
১৪.	হাড়ি	লেট	চণ্ডাল	৩
১৫.	সুবর্ণবণিক	১. অম্বষ্ঠ	বৈশ্য	২

*১. বৌধায়ন ধর্মসূত্র, ২. বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ৩. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ৪. গৌতম ধর্মসূত্র, ৫. মনুসংহিতা, ৬. মহাভারত, ৭. পরাশর, ৮. সূত সংহিতা, ৯ উশানস সংহিতা, ১০. বিষ্ণু ধর্মসূত্র, ১১. বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র, ১২. যাজ্ঞবল্ক্য, ১৩. জাতিমালা।

জাতি		পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
	২.	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
১৬. গন্ধবণিক	১.	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
	২.	অম্বষ্ঠ	রাজপুত্র	৭
১৭. কায়স্থ		ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৯
১৮. কৈবর্ত	১.	নিষাদ	অয়োগব	৫
	২.	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
	৩.	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
	৪.	নিষাদ	মগধ	৬
১৯. গোপ	১.	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	২
	২.	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৭
২০. ডোম		লেট	চণ্ডাল	৩
২১. তন্তুবায়	১.	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
	২.	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
২২. ধীবর	১.	গোপ	শূদ্র	২
	২.	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	৪
২৩. নিষাদ	১.	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	কৌটিল্য
	২.	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৬
	৩.	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৩
২৪. পোদ	১.	বৈশ্য	শূদ্র	৩
২৫. মালাকার	১.	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
	২.	ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	২
২৬. মাহিষ্য		ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪, ১[illegible]
২৭. মোদক		ক্ষত্রিয়	শূদ্র	২
২৮. রজক	১.	বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৮
	২.	ধীবর	তিবর	৩
	৩.	করণ	বৈশ্য	২
২৯. বারুজীবী	১.	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	২
	২.	গোপ	তন্তুবায়	[illegible]

জাতি	পিতা	মাতা	অধ্যায়
৩০. বৈদ্য	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫
	২. শূদ্র	বৈশ্য	৬
৩১. শুঁড়ি	১. বৈশ্য	তিবর	৩
	২. গোপ	শূদ্র	২

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে বাঙালী জাতি তিন নরগোষ্ঠির (races) যথা আদ্য-অস্ত্রাল (Proto-Australoid), দ্রাবিড় ও আলপীয়র মিশ্রণে উদ্ভূত। বাঙালী সমাজের সব জাতির মধ্যে ওই একই রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং সামাজিক সংস্থা-হিসাবে কোনও জাতিই রক্তের শ্রেষ্ঠতা বা রক্তের বিশুদ্ধতা দাবী করতে পারে না। যদিও বৈদ্য ও চণ্ডাল উভয়ের দেহেই ব্রাহ্মণরক্ত রয়েছে, তথাপি তাদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদের আকাশ-পাতাল তফাৎটা যে ব্রাহ্মণদের উদ্ভাবিত, সেটা আমি অন্যত্র বলেছি। এরূপ পার্থক্য যে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাল্পনিক ধ্যান মাত্র, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এটা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাপার (sociological phenomenon) হতে পারে, কিন্তু আবয়বিক নৃতত্ত্বের (ethnological fact) দিক থেকে সত্য নয়। অনুরূপভাবে পদবীসমূহও কোন জাতি নির্দেশ করে না। একই পদবী, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, কায়স্থ, বৈদ্য, গোপ, মাহিষ্য ও অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ডঃ দেবদত্ত ভাণ্ডারকার বহুপূর্বেই দেখিয়েছিলেন যে গুজরাতের নাগর-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সকল পদবী প্রচলিত ছিল, তা এখন বাঙলার কায়স্থদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত জাতিসমূহের উৎপত্তি-কাহিনী যে একেবারে কল্পনাপ্রসূত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, প্রথমত পরস্পর-বিরোধী মতবাদ, ও দ্বিতীয়ত, উত্তর ভারতের বর্ণবাচক জাতি হিসাবে 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈশ্য' জাতি কোনদিনই বাঙলায় ছিল না। গুপ্তযুগের বহু লিপিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বহু লোকের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই সকল লিপিতে কেহ নিজেকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে দাবী করেনি। তবে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাঙলার জাতিসমূহ যে মাত্র নানাজাতির রক্তের মিশ্রণের ফসল তা নয়, পুনর্মিশ্রণেরও ফল।

পরবর্তীকালে বাঙলার যে সমাজবিন্যাস রচিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১. ব্রাহ্মণ,

২. বৈদ্য, ৩. কায়স্থ, ৪. নবশাখ, ৫. অন্যান্য জাতি। যেসব জাতির হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করে তারাই নবশাখ। তাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তিলি, তাঁতী, মালাকার, সদ্গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও মোদক। অন্যান্য জাতিসমূহ ছিল জল-অনাচরণীয়। সুবর্ণবণিকদের জল-আচরণীয় জাতির তালিকা থেকে বাদ দেবার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, বল্লভানন্দ নামে প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক রাজা বল্লালসেনকে অর্থসরবরাহ করতে অসম্মত হওয়ায় বল্লালসেন তাদের অবনমিত করেন। আর স্বর্ণকারদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তারা পরিবারের সোনা চুরি করে বলেই তাদের অবনমিত করা হয়েছিল।

চার

পুরাণ গ্রন্থ ছাড়া, আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ থেকেও আমরা মধ্যযুগের জাতিসমূহের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাস পাই। এগুলি বাঙলার কুলজী গ্রন্থসমূহ। এগুলি রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

মধ্যযুগের, বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর, সামাজিক জীবনের ওপর এগুলি বিশেষ আলোকপাত করে। মূলত এগুলি বংশের পুরুষানুক্রমিক বিবরণ। এগুলি সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই রচিত। বাঙলার সব জাতিরই কুলপঞ্জী আছে; তবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের কুলপঞ্জীই সবচেয়ে বেশি। এগুলির অধিকাংশই ঘটকগণ কর্তৃক রচিত। কুলপঞ্জীগুলির বিষয়-বস্তুসমূহকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলিতে আছে (১) জাতি ও তাদের শাখাসমূহের উদ্ভব ও বিস্তার, (২) কালক্রমে এই সকল জাতির যে-সকল শাখার সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে পরস্পরের আহার ও বৈবাহিক বিষয় সম্পর্কে যে সকল রীতি নীতি ও স্তর-পর্যায়ের উদ্ভব হয়েছিল তার ইতিহাস, এবং (৩) বিভিন্ন পরিবারের বংশাবলী ও বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির কীর্তিকথা, কুলক্রিয়া ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান কুলজীগ্রন্থের নাম নীচে দেওয়া হল—(১) ব্রাহ্মণ কুলজীগ্রন্থ: ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' ও 'সমীকরণকারিকা', মহেশের 'নির্দোষ কুলপঞ্জিকা', শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের 'কুলসারকৌমুদী', বাচস্পতি মিশ্রের 'কুলরাম', [illegible] 'কুলদীপিকা', এড়ু [illegible], হরিহরবিমিশ্রের 'কারিকা,' 'মেল-

প্রকাশ', মেলচন্দ্রিকা', 'মেলরহস্য', 'বারেন্দ্রকুলপঞ্জী', ইত্যাদি। (২) বৈদ্যকুলপঞ্জিকাসমূহ : ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' ও 'রত্নপ্রভা', রামকান্তের 'কবিকণ্ঠহার' ইত্যাদি। (৩) কায়স্থকুলপঞ্জিকা : মালাধর ঘটকের 'দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা,' দ্বিজ বাচস্পতির 'বঙ্গজকুলজী' ও কাশীরাম দাসের 'বারেন্দ্র কায়স্থ-ঢাকুরি' ইত্যাদি। এছাড়া, অবশ্য আরও অনেক কুলপঞ্জীকার ছিলেন। যেমন দ্বিজ ঘটক চূড়ামণি ও রামনারায়ণ ঘটক। প্রথমজন রচনা করেছিলেন 'উত্তর রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী'। বলা বাহুল্য, কুলপঞ্জিকাসমূহের ঐতিহাসিকতা সন্দেহের অতীত নয়। তাদের অকৃত্রিমতাও সংশয়পূর্ণ ; কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক এগুলির পরিবর্তন করেছে ও এগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়েছে। কিন্তু তাহলেও মধ্যযুগের সমাজে বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে কুলপঞ্জীসমূহই সহায়ক হয়েছিল।

পাঁচ

মধ্যযুগের সমাজে কৌলীন্যপ্রথা এনেছিল এক অসামান্য জটিলতা। এ প্রথা বিশেষ করে প্রচলিত ছিল বাঙলা ও মিথিলাতে। কিংবদন্তি অনুযায়ী বাঙলাদেশে কৌলীন্যপ্রথা সৃষ্টি করেছিলেন সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন, আর মিথিলাতে কর্ণাটবংশীয় শেষ রাজা হরিসিংহ। এ হচ্ছে কুলজীগ্রন্থসমূহের কথা। ইতিহাস কিন্তু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। বস্তুত বল্লালসেন বা হরিসিংহ যে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। বল্লালসেন রচিত 'অদ্ভুতসাগর' ও 'দানসাগর'-এ এর কোনও উল্লেখ নেই। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজসভাতেও অনেক বিশিষ্ট ও সমকালীন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, যথা জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর প্রমুখ। তাঁরাও অনেক গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কোন গ্রন্থেও এর কোন উল্লেখ নেই। অনেকে আবার মনে করেন যে, বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন মাত্র এবং এটা বাঙলাদেশে অনেক আগে থেকেই (অনেকের মতে আদিশূরের সময় থেকে) বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার সপক্ষেও কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। বরং এসম্বন্ধে প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র, তাম্রপট্ট ও শিলালিপিসমূহ সম্পূর্ণ নীরব। প্রাচীন সমাজে অনুলোম-বিবাহ ছাড়া প্রচলিত ছিল প্রতিলোম-বিবাহ। এর প্রচলন বিশেষভাবে ঘটেছিল বৌদ্ধযুগে। তার মানে প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল

অসবর্ণ বিবাহ, যার ফসল ছিল সঙ্কর-জাতিসমূহ। কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে যে মতটা আজ সমীচীন বলে গৃহীত হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালী কুলপঞ্জীকারগণই এটা প্রথমে ব্রাহ্মণসমাজে কায়েম করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এটাকে একটা রীতিমতো স্বীকৃতি দেবার জন্যই তাঁরা এর সঙ্গে বল্লালসেনের নাম জড়িত করেছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজের অনুকরণে এটা পরবর্তী কালে কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ প্রভৃতি সমাজে প্রবর্তিত হয়েছিল। বস্তুত বৈদ্য-সমাজে কৌলীন্যপ্রথা যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ও সদ্‌গোপসমাজে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে।

কৌলীন্যের লক্ষণ সম্বন্ধে একটা বচন আছে। সেটা হচ্ছে—'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।' তার মানে আচরণ, শালীনতা, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থভ্রমণ, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান—কুলীনের এই নয়টি লক্ষণ। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজে যাদের একবার কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তাদের বংশপরম্পরায় কুলীন বলে সম্মানিত করা হত—উপরি-উক্ত নবধা গুণ অনুযায়ী নয়। যেমন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন করা হয়েছিল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়দের। অনুরূপ-ভাবে বঙ্গজ কায়স্থসমাজে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র-বংশকে কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, আর সদ্‌গোপসমাজে শূর (সুর), নিয়োগী ও বিশ্বাসদের।

কৌলীন্যপ্রথা যে কলুষিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে সমাজে উপরি-উক্ত নয়টি গুণের কোনোটারই অস্তিত্ব ছিল না। সমজাতীয় সমাজে বিভিন্ন বংশকে উচ্চ ও নীচ চিহ্নিত করে এই প্রথা যে সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। বরং কুলপঞ্জীকারগণ নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্য নানারূপ বিধিনিষেধ সৃষ্টি করে সমাজকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছিল এবং ফলে নানারকম কুপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রাহ্মণসমাজে এই প্রথাটি ছিল কন্যাগত। তার মানে কুলীনের ছেলে কুলীন বা অকুলীনের মেয়েকে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু কুলীনের মেয়ের বিবাহ কুলীনের ছেলের সঙ্গেই দিতে হত। অকুলীনের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে মেয়ের বাপের কৌলীন্য ভঙ্গ হত। সুতরাং কুলরক্ষার জন্য কুলীনব্রাহ্মণ পিতাকে যেন তেন প্রকারে কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়ে নিজের কুলরক্ষা করতে হত। তার কারণ অনূঢ়া কন্যা ঘরে রাখা বিপদের ব্যাপার ছিল। এক দিকে তো সমাজ

তাকে একঘরে করত, আর অপর দিকে ছিল বিধর্মীর নারী-লোলুপতা। অনেক সময় বিধর্মীরা নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে (এমনকি বিবাহমণ্ডপ থেকেও) নিকা করতে কুণ্ঠা বোধ করত না।

অনেকসময় কুলীন ব্রাহ্মণগণ অগণিত বিবাহ করতেন এবং স্ত্রীকে তার পিত্রালয়েই রেখে দিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে লিখেছিলেন—'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে। যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥ যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই। বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥ বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে। পুনর্বিয়া হবে কিনা বিয়া হবে আগে॥ বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটিঘাটি। জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥ দু'চারি বৎসরে যদি আসে একবার। শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥ সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়। তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥' এরূপ প্রথা-অর্জিত সমাজে কুলীন কন্যাগণ যে সর্বক্ষেত্রেই সতী-সাবিত্রীর জীবন যাপন করতেন সে কথা হলফ করে বলা যায় না। এর ফলে বাঙলার কুলীনসমাজে যে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, নারীর বিধর্মী দ্বারা ধর্ষিতা হবারও সম্ভাবনা ছিল। বিধর্মী-দূষিতা হবার শঙ্কাতেই বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহ, শিশুহত্যা, সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা ক্রমবর্ধমান গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ছয়

কৌলীন্যপ্রথা বাঙালীকে ক্রমশ অবনতির পথেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যে সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত ছিল ও মেয়ের বিবাহ কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে সমাজে মেয়েকে অপসারণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পিতামাতার মনে জেগেছিল। সেজন্য গঙ্গাসাগরের মেলায় গিয়ে মেয়েকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়াটা এদেশে একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজ সরকার আইন প্রণয়ন করে এই প্রথা বন্ধ করে দেয়। অনেকে আবার মেয়েকে সাগরের জলে ভাসিয়ে না দিয়ে, মন্দিরের দেবতার নিকট তাদের দান করতেন। মন্দিরের পুরোহিতরা এই সকল মেয়েদের নৃত্যগীতে পটীয়সী করে তুলতেন। এদের দেবদাসী বলা হত। এটাও আইন দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যদিও স্বামীর সহিত সহমৃতা হবার দু-একটা দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে আছে, তবুও স্বামীর সঙ্গে জলন্ত চিতায় মরতে হবে, এমন কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা প্রাচীন ভারতের জনসমাজে প্রচলিত ছিল না। বরং মনুসংহিতায় বিধবা নারীদের আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশই আছে। পরবর্তী স্মৃতিকারগণও সহমরণের বিরোধী ছিলেন। কেননা, মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে যে এই প্রথা নারী বা আত্মাশক্তির অবমাননাসূচক। সহমরণ ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল মধ্যযুগের বাঙলাদেশে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে আমরা এর বহু উল্লেখ পাই। হিন্দুর মেয়েরা তো অনেকে স্বামীর বুকে সহমৃতা হতেনই, এমনকি ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা কোথাও কোথাও অনুসৃত হত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীন্য-কলুষিত সমাজে এটা প্রায় বাধ্যতামূলক প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। সবক্ষেত্রেই যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অহিফেন সেবন করিয়ে তার প্রভাবে বা বলপূর্বক তাঁকে চিতায় চাপিয়ে পুড়িয়ে মারা হত। নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী সহমৃতা হওয়ায় রাজা রামমোহন রায় এরূপ ব্যথিত হয়েছিলেন যে, নিষ্ঠাবান সমাজের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্ত হয়ে এই প্রথা লোপ করতে বদ্ধপরিকর হন। তাঁরই চেষ্টায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিক ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে আইন প্রণয়ন দ্বারা এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন।

সাত

ময়ূরভট্টের 'ধর্মপুরাণ', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', বিজয়গুপ্ত-রচিত 'মনসামঙ্গল', বৈষ্ণব পদাবলীসমূহ, দয়ারামের 'সারদামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', দেবীবরের 'মেলবন্ধন', বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থসমূহ, মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণসমূহ ও বৈদেশিক পর্যটকগণের ভ্রমণকাহিনীসমূহ থেকে আমরা মধ্যযুগের, বিশেষ করে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুর সমাজজীবনের একটা সঠিক চিত্র পাই।

সুফলার বছরে কৃষকের ঘর ধান, চাল, গম, মুগ, তিল, ছোলা, কার্পাস ও সরিষায় পরিপূর্ণ থাকত। তেলিরা কেউ ঘানি ও কেউ ঘণায় তেল প্রস্তুত করত; কামারেরা কোদালি, কুড়ালি, কাল, টাঙ্গি ও শেল তৈরি করত; তাম্বুলীরা গুবাক ও পানের বীড়া বেঁধে বেচত; কুম্ভকারেরা হাঁড়ি, খুরি,

মৃদঙ্গ, দগড় ও শয্যা প্রস্তুত করত ; বারুইরা নগরের আশেপাশে বরজ তৈরি করে পানের চাষ করত ; নাপিত ক্ষুর, ভাঁড় ও দর্পণ নিয়ে নগরে ঘুরে বেড়াত। মোদকদের চিনির কারখানা ছিল ; তারা নানা প্রকার লাড্ডু ও মিঠাই তৈরী করত। গন্ধবণিকরা বাজারে ধুপধুনা বেচত। শঙ্খবেণে শাঁখার কাজ করত। কাঁসারি নানারকম কাঁসার বাসন-কোসন তৈরী করত। সুবর্ণবণিক সোনারুপার কারবার করত। স্বর্ণকারের হাটে স্বর্ণালঙ্কার বিক্রির দোকান ছিল। গোপেরা দুধ ও দহি বেচত। তাঁতিরা কাপড় বুনতো। মোট কথা, প্রত্তি জাতিই তাদের নিজ নিজ কৌলিক কর্মে ব্যস্ত থাকত।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিবৃত তিনশ বছর আগের যে-সকল জাতির উল্লেখ আছে, সে-সকল জাতি পরের তিনশ বছরেও বিদ্যমান ছিল। তবে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে আমরা জানতে পারি যে, মধ্যযুগের সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য—এই তিন জাতির প্রাধান্যই ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। মুকুন্দরাম তাঁর জন্মস্থান দামুন্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে ওই স্থানের গুণবান লোকেরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য—এই তিন জাতিভুক্ত ছিলেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল-কাব্য থেকেও আমরা জানতে পারি যে একশ বছর আগেও এই তিন জাতিই সমাজে প্রভাবশালী ছিলেন। তবে মুকুন্দরামের কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে এ যুগের ব্রাহ্মণরা সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণী ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও চর্চা করতেন এবং টোল স্থাপন করে ছাত্রদের শাস্ত্র পড়াতেন। আর এক শ্রেণী ছিল 'অশিক্ষিত' ব্রাহ্মণ যারা গ্রামে যজন-যাজন ও পূজা-অর্চনাদি করে জীবিকা অর্জন করত। মনে হয়, এরা ছিল দাক্ষিণাত্যের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং সেই হেতু এদের প্রতি কটাক্ষ করে মুকুন্দরাম তাদের 'অশিক্ষিত' বলে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া, আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল—যাদের মুকুন্দরাম 'বর্ণবিপ্র' বলে অভিহিত করেছেন। এরা জ্যোতিষের চর্চা করত ও পাপগ্রহসমূহের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য শান্তিস্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করত। এ ছাড়া, অগ্রদানী ব্রাহ্মণদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের কাজ ছিল শ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করা।

বর্তমান কালের ন্যায় মধ্যযুগেও বৈদ্যরা সেন, গুপ্ত, দাশ, দত্ত, কর, কুণ্ড প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করতেন। বৈদ্যদের প্রধান পেশা ছিল চিকিৎসা। তবে

তাঁরা অন্য কাজও করতেন এবং শাস্ত্রাদিরও অধ্যাপনা করতেন। বৈদ্যদের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা মজার কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যখন রোগীর ব্যাধি কঠিন দেখতেন, তখন কোনও না কোনও অছিলায় তাঁরা সরে পড়তেন।

কায়স্থদের মধ্যে যাঁদের উপাধি ছিল ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ তাঁরাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ। এ ছাড়া, কায়স্থরা অন্য যে-সকল উপাধি ব্যবহার করতেন, সেগুলির অন্যতম ছিল পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, নাগ, কর, কুণ্ড, সোম, চন্দ্র, গুপ্ত, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ ইত্যাদি। মুকুন্দরাম মাহেশের রথযাত্রার প্রবর্তক 'ঘোষ' উপাধিধারী কায়স্থবংশের উল্লেখ করেছেন। তা থেকে মনে হয় যে, মাহেশ সে সময় কায়স্থসমাজের এক প্রভাবশালী স্থান ছিল। কায়স্থদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ছিল। তাঁরা করণিকের কাজ ছাড়া কৃষিকর্মেও লিপ্ত থাকতেন। রূপরাম তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—'কায়স্থ কায়স্থুন যত করে লেখাপড়া'।

ব্রাহ্মণরা সকল জাতির হাত থেকে জল গ্রহণ করতেন না। মাত্র নয়টি জাতি জল-আচরণীয় বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এদের নবশাখ বলা হত। এরা হচ্ছে তিলি, তাঁতি, মালাকার, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও ময়রা। এখানে উল্লেখনীয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে মেদিনীপুরের জেলা আদালত, কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালত ও বিলাতের প্রিভিকাউনসিল সদ্‌গোপদের 'সদ্‌গোপ-ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। (Moore's India Appeals দ্রঃ)।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' অন্যান্য যে-সকল জাতির উল্লেখ আছে মধ্যযুগের বঙ্গীয় সমাজে তারাও বিদ্যমান ছিল। তারাই ছিল সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়ূরভট্ট তাঁর 'ধর্মপুরাণে' বাঙলাদেশের জাতি-সমূহের এক তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি নিচে উদ্ধৃত করা হল—'সদ্‌গোপ, কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি। উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥ যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার। নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥ হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি। মাজি ও বাগ্দী মেটে নাহি ভেদজাতি॥ স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার। সূত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোদ্দার॥ ক্ষত্রিয় বারুই বেন্ত পোদ শাকমারা। পল্লিজ ভাস্কর বালা কায়স্থ কেওরা॥' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ৮২)। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ হরিরামের 'চণ্ডীকাব্য' ও

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও আমরা এই সকল জাতির উল্লেখ দেখতে পাই। এদের মধ্যে সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিক জাতি ছিল ধনবান গোষ্ঠী। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে বহু অর্থ উপার্জন করে সমাজে বেশ উচ্চস্থান অধিকার করত। মঙ্গলকাব্যসমূহে আমরা এদের বেশ প্রাধান্য লক্ষ্য করি। ইতিপূর্বে আমরা বণিকসম্প্রদায়ের সমুদ্রপথে বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ-যাত্রার কথা উল্লেখ করেছি। মধ্যযুগে যদিও স্মৃতিকার রঘুনন্দন হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও বণিকসম্প্রদায় তাঁদের সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রা পরিহার করেনি। সুতরাং মধ্যযুগের সমাজে আমরা আদর্শমূলক বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করি।

গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিক-সমাজেও আমরা শিক্ষার প্রসার দেখি। বস্তুত শিক্ষার প্রসার ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতির মধ্যেও ছিল। বণিক-সম্প্রদায়ের ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাধর সেন বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। নাপিত মধুসূদনও নল-দময়ন্তী উপাখ্যানের ভিত্তির উপর একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাঝি-কায়েত, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যবন্ত ধুপি প্রভৃতিও লেখক হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া, অনেকে নূতন ধর্মপ্রবর্তক হিসাবেও বরেণ্য হয়েছিলেন। যেমন, সদ্গোপ-বংশীয় রামশরণ পাল কর্তাভজা উপাসকদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আট

মধ্যযুগের সমাজে যবন-দোষের জন্য অনেকে জাত হারাত। যারা যবনদের সংস্পর্শে আসত তাদেরই যবন-দোষ ঘটত। দেবীবরের 'মেলবন্ধনে' কয়েকটি মেল-কে যবন-দোষ-দুষ্ট বলে বর্ণিত করা হয়েছে। তবে এজন্য তাদের জাত গিয়েছে একথা বলা হয়নি। আবার অদ্ভুতাচার্যের 'রামায়ণ' পাঠে আমরা জানতে পারি যে, সমাজের একদল উদার মনোভাবসম্পন্ন লোক এই যবন-দোষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝাণ্ডাও তুলেছিলেন। যবন-দোষ তখনই ঘটত যখন হিন্দু নারী মুসলমান, মগ ও পোর্তুগীজগণ কর্তৃক ধর্ষিতা হত, বা এদের সঙ্গে হিন্দু খাওয়া-দাওয়া করত। মনে হয়, সমাজের বিধানকর্তারা প্রথমে যবন-দোষ-দুষ্ট পরিবার-গণের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এবং সে সকল পরিবারকে জাতিচ্যুত করতেন। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ

উজাড় হয়ে যায়, তখন তাঁরা এ সম্বন্ধে শাস্তিটাকে লঘু করে দিয়েছিলেন। অন্তত দেবীবরের 'মেলবন্ধন' সেই সাক্ষ্যই বহন করে। হিন্দুসমাজের মধ্যে পিরালী, শেরখানী প্রভৃতির সৃষ্টি সেটাকে সমর্থন করে। তবে অনেক জায়গায় রক্ষণশীল সমাজ কঠোরই থেকে গিয়েছিল এবং যবন-দোষের জন্য কোনও কোনও পরিবারকে জাতিচ্যুত করতে দ্বিধা বোধ করত না। রঘুনন্দন (ষোড়শ শতাব্দী) দেখলেন এভাবে যদি হিন্দুসমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তা হলে হিন্দু একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তাঁর সামনে এটা 'চ্যালেঞ্জ'-রূপে দেখা দিল। আগে যেসব বিদেশী আক্রমণকারীরা এসেছিল, তারা হিন্দুই হয়ে গিয়েছিল। তাতে হিন্দুসমাজ প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ কর্তৃক ধর্মান্তরিতকরণের ফলে হিন্দুসমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। কিভাবে এই ক্ষয় নিবারণ করা যেতে পারে, সেটাই ছিল রঘুনন্দনের চিন্তা। সেজন্য রঘুনন্দন বিধান দিলেন যে মাত্র একটা সংক্ষিপ্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এরূপ ধর্মান্তরিত লোকেরা আবার হিন্দু হতে পারে।

॥

মধ্যযুগে শিক্ষাবিস্তারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরিচালিত চতুষ্পাঠীসমূহ। চতুষ্পাঠীসমূহের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। শাস্ত্র অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে আমরা চৈতন্যের সমসাময়িক কালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহাতীর্থ হিসাবে নবদ্বীপের সুনাম বিশেষভাবে অবগত হই। নব্যন্যায় ও স্মৃতির অনুশীলনের জন্য নবদ্বীপ বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। নৈয়ায়িক হিসাবে তখনকার দিনে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতির নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

তবে নবদ্বীপই একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য রামকেলী, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট (হালিসহর), ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া), গোন্দলপাড়া (চন্দননগর), ভদ্রেশ্বর, জয়নগর-মজিলপুর, আন্দুল, বালী, বর্ধমান প্রভৃতিও প্রসিদ্ধ ছিল। দ্রাবিড়, উৎকল, মিথিলা ও বারাণসী থেকে দলে দলে ছাত্র বর্ধমানের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে আসত। এই সকল চতুষ্পাঠীতে যে মাত্র নব্যন্যায় বা স্মৃতিশাস্ত্রেরই অনুশীলন হত তা নয়। জ্যোতিষ, ন্যায়, কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দোসূত্র প্রভৃতি ও দণ্ডি, ভারবি, মাঘ,

কালিদাস প্রভৃতির কাব্যসমূহ এবং মহাভারত, কামন্দকী-নীতিকা, হিতোপদেশ প্রভৃতি পড়ানো হত।

সাধারণ গ্রামবাসীর শিক্ষালাভের জন্য ছিল পাঠশালা। পাঠশালা ও চতুষ্পাঠীর মধ্যে প্রভেদ ছিল এই যে চতুষ্পাঠীসমূহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা (অনেক সময় বিদুষী ব্রাহ্মণ কন্যারা), যেমন—হটী বিদ্যালঙ্কার (?—১৮১০) ও দ্রবময়ী (১৮০৭—) পরিচালনা করতেন, আর পাঠশালাসমূহ যে কোনও জাতির লোকেরা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন। পাঠশালাসমূহে সাধারণত প্রাথমিক লিখন-পঠন, শুভঙ্করী, পত্র ও দলিলাদি লিখন প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠশালার শিক্ষককে গুরুমশাই বলা হত এবং তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি খুব বদান্যতার সঙ্গে বেতের ব্যবহার করতেন। পাঠশালায় ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়ত। মেয়েরা যে লেখাপড়ায় দক্ষতা লাভ করত তার পরিচয় আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে উল্লিখিত লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতী কর্তৃক পত্র-লিখন থেকেও জানতে পারি।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা যে লেখাপড়া শিখে বিদুষী হতেন, তা আমরা সমসাময়িক কালের অন্যান্য রচনা থেকেও জানতে পারি। ভারতচন্দ্রের (১৭১১—১৭৬০) 'অন্নদামঙ্গল'-এর নায়িকা বিদ্যা তো বিদ্যারই প্রতীক ছিলেন। রানী ভবানীও (১৭১৫—১৮০২ ?) বেশ সুশিক্ষিত মহিলা ছিলেন। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০—১৭৮২) ও বর্ধমানের রাজবাড়ির মেয়েরাও লেখাপড়া জানতেন।

অনেক মেয়ে সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চ সোপানে উঠেছিলেন। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন রাঢ়দেশের হটী বিদ্যালঙ্কার ও হটু বিদ্যালঙ্কার, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী (১৭৫২—১৭৭২) ও কোটালিপাড়ার প্রিয়ম্বদা দেবী (১৬-১৭ শতাব্দী) ও বৈজয়ন্তী দেবী (১৭ শতাব্দী)। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন হটী বিদ্যালঙ্কার। তিনি ছিলেন রাঢ়দেশের এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিধবা। সংস্কৃত-ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্যন্যায়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে বারাণসীতে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। পণ্ডিতসমাজ তাঁকে বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বেশ বৃদ্ধবয়সে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান। হটু বিদ্যালঙ্কারের আসল নাম ছিল রূপমঞ্জরী। তিনিও রাঢ়দেশের মেয়ে ছিলেন, তবে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁর পিতা নারায়ণ দাস অল্পবয়সেই

মেয়ের অসাধারণ মেধা দেখে, তার ১৬।১৭ বছর বয়স কালে তাঁকে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অধ্যয়ন করে রূপমঞ্জরী ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। নানা জায়গা থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে ব্যাকরণ, চরকসংহিতা, নিদান ও আয়ুর্বেদের নানা বিভাগের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে আসত। অনেক বড় বড় কবিরাজ তাঁর কাছে চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসতেন। রূপমঞ্জরী শেষপর্যন্ত অবিবাহিতাই ছিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করে মাথায় শিখা রেখে পুরুষের মতো বেশ ধারণ করতেন। ১০০ বৎসর বয়সে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

প্রিয়ম্বদা দেবী সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা শিবরাম সার্বভৌম বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে, মেয়ে-জামাইকে ভূমিদান করে তাঁদের গ্রামে স্থিত করেন। প্রতিভাশালিনী এই মহিলা সংস্কৃত ভাষায় যেমন অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন তেমনই কবিতা রচনা করতে পারতেন। বৈজয়ন্তী দেবী সপ্তদশ শতাব্দীর মেয়ে ছিলেন। সুন্দরী ছিলেন না বলে স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পত্রে তাঁর কবিত্বশক্তি দেখে স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেন। আনন্দময়ী আঠারো শতকের মেয়ে। পয়গ্রামনিবাসী অযোধ্যারামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পিতা অন্যকর্মে ব্যস্ত থাকায়, তিনি মহারাজা রাজবল্লভের অনুরোধে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুল্লতাত জয়নারায়ণকে 'হরিলীলা' কাব্য রচনাতেও তিনি সাহায্য করেছিলেন।

তবে মেয়েদের মধ্যে দু-চারজন এরূপ উচ্চশিক্ষিতা হলেও সাধারণ মেয়েরা অল্পশিক্ষিতাই হত। তাদের বিদ্যার দৌড় পাঠশালায় লব্ধ শিক্ষা পর্যন্ত। এর প্রধান কারণ ছিল মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন। বিবাহের পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যাতে না তারা অজ্ঞানতার তিমিরে অবগুণ্ঠিতা হয়ে বন্দিনী বামার জীবন যাপন না করে, তার মুক্তির জন্য ১৯ শতকে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এ-সম্পর্কে তাঁদের প্রবর্তিত 'অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা' ছিল এক অভিনব অবদান।

দশ

মেয়েদের বিবাহ সাধারণত আট বছর বয়সের আগেই হয়ে যেত। সেরূপ বিবাহকে গৌরীদান বলা হত। গৌরীদানই প্রশস্ত বিবাহ ছিল। অনূঢ়া মেয়ের বয়স দশ পেরিয়ে গেলে সমাজে তার পরিজনকে একঘরে হয়ে থাকতে হত। একঘরে হয়ে থাকা তখনকার দিনে খুব বড় রকমের সামাজিক শাস্তি ছিল। তাদের ধোপা, নাপিত ও পুরোহিত বন্ধ হয়ে যেত। তাদের সঙ্গে কেউ সামাজিক আদান-প্রদান করত না। কোন সামাজিক কাজেও তারা নিমন্ত্রিত হত না।

বিবাহের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি এখনকার মতোই ছিল। বিবাহ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কর্মের সময় দুন্দুভি, পটহ, ঢক্কা, মাদল, বংশী, মৃদঙ্গ ও বীণা বাজানো হত। তবে এখন যেমন মেয়ের বাপকে কন্যাপণ দিতে হয়, তখনকার দিনের প্রথা ছিল ঠিক বিপরীত। বরের বাপই পণ দিত মেয়ের বাপকে। এখনও পর্যন্ত এ প্রথা সমাজের নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

মেয়েরা নানারকম ব্রত করত। শ্বশুরকুল, পিতৃকুল লক্ষ্মীবান হউক, ক্ষেতে ধান হউক, গোয়ালভরা গরু হউক, স্বামী ভালবাসুন, সতীন মরুক, ইত্যাদি প্রার্থনাই ব্রতসমূহের মাধ্যমে করা হত। স্বামী যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে আসুক এরূপ প্রার্থনাও করা হত। কুমারী মেয়েরা ব্রতের মাধ্যমে রামের মতো স্বামী, লক্ষ্মণের মতো দেবর, দশরথের মতো শ্বশুর ইত্যাদি প্রার্থনা করত।

বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার দরুন সমাজে বালবিধবার সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। বালবিধবাদের বেশভূষা, খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি রঘুনন্দনের কঠোর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। যে কোনও বয়সেই সে বিধবা হোক না কেন, তাকে শুদ্ধাচারিণী হয়ে থানকাপড় পরতে হত ও অলংকার পরিহার করতে হত। মাছ, মাংস ও অন্যান্য অনেক খাদ্যসামগ্রী বর্জন করতে হত ও একাদশীর দিন উপবাসী থাকতে হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা রাজবল্লভ বিধবার পুনরায় বিবাহ দেওয়ার রীতির প্রচলন করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য তা করতে সক্ষম হননি।

সধবা মেয়েদের অবগুণ্ঠনবতী হয়ে থাকতে হত। তাঁদের স্বামী, শ্বশুর ও ভাশুরস্থানীয়দের নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁরা ভাশুর ও মামাশ্বশুরদের সংস্পর্শে আসতে পারতেন না। যদি দৈবাৎ কোনও ক্রমে ভাশুর বা মামাশ্বশুরের-

সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেত, তা হলে ধান-সোনা উৎসর্গ করে শুদ্ধ হতে হত। এ প্রথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

[illegible]

শাস্ত্রকারদের কৃপায় মধ্যযুগের সমাজে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বিধান প্রবেশ করেছিল। তবে মধ্যযুগে অনেক নূতন খাদ্যও বিদেশ থেকে এদেশে আনীত হয়েছিল। তাদের অন্যতম হচ্ছে আলু, তামাক, আনারস, পেয়ারা, চীনাবাদাম, আতা, গোলমরিচ প্রভৃতি।

মধ্যযুগের সমাজে বৈষ্ণবরা নিরামিষ ভোজন করতেন। কিন্তু শাক্তরা আমিষভোজী ছিলেন। নানারূপ খাদ্যসামগ্রী দিয়ে নানা ব্যঞ্জন বানানো হত। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে উল্লিখিত আছে যে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে ঘৃতসংযোগে ১১ রকম নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তৈলসংযোগে ১২ রকম মাছের ব্যঞ্জন, ও পাঁচ রকম (ছাগ, মেষ, মৃগ, কবুতর ও কচ্ছপের) মাংস রান্না করা হয়েছিল। এ ছাড়া ছয় রকম মিষ্টান্নেরও উল্লেখ আছে। তবে গরিব লোকদের খাদ্য ছিল ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, অম্বল ও মাছের ঝোল।

[illegible]

অশনের পরেই আসে বসন-ভূষণের কথা। পুরুষরা মাত্র ধুতিই পরিধান করত। চাদর ও চটিজুতাও ব্যবহার করত এবং মাথায় পাগড়ি বাঁধত। মেয়েরা পরত শাড়ি। কখনও কখনও তারা কাঁচুলিও ব্যবহার করত। তবে বিত্তশালী সমাজের পোশাক-আশাক অন্য রকমের ছিল। তারা প্রায়ই রেশমের কাপড় পরিধান করত ও পায়ে ভেলভেটের উপর রূপার জরির কাজ করা জুতা ও কানে কুণ্ডল, দেহের উপর-অংশে আঙরাখা, মাথায় পাগড়ি ও কোমরের নিচে কোমরবন্ধ পরত। পুরুষরা দেহ চন্দনচর্চিত করত, আর মেয়েরা স্নানের সময় হলুদ ও চন্দনচূর্ণ দিয়ে দেহ মার্জিত করত ও মাথার কেশপাশ আমলকির জলে ধৌত করত। অভ্রের চিরুনি দিয়ে তারা মাথা আঁচড়াত ও নানা রকমের খোঁপা বাঁধত। তা ছাড়া তারা যে-সব অলংকার পরত, তা আমরা আগেই বলেছি।

লোকায়ত ধর্ম ও মুক্তসাধনা

বাঙলার গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির অবসান ঘটেছিল মুসলমানগণ কর্তৃক বাঙলা বিজিত (১২০৪) হবার পর। মনে হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুর্কি আক্রমণের ফলে বাঙলাদেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল অনেক লোকায়ত দেবদেবীর। পূর্বে এই সকল দেবদেবী সমাজের নিম্নকোটির লোকগণ কর্তৃক পূজিত হতেন। মুসলমানরাজগণের আমলে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের মধ্যে শৈথিল্য ঘটায় নিম্নশ্রেণী কর্তৃক পূজিত বহু দেবদেবী প্রাধান্য লাভ করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শীতলা, বাশুলী, মনসা, চণ্ডী ইত্যাদি। হিন্দু দেবতামণ্ডলে স্থান দেবার জন্য তাঁদের অধিকাংশকে শিবজায়া উমার সহিত অভিন্ন করা হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ যুগের হিন্দুসমাজে গৃহীত এই সকল দেবদেবী বাঙলাদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই পূজিত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণী কর্তৃক পূজিত এই সকল দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে স্বীকৃতিলাভ করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আর্যসমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিল পুরুষদেবতা, আর আর্যেতর সমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিলেন নারীদেবতা। আর্যদেবতাসমূহ যতই প্রাধান্যলাভ করতে লাগলেন, আর্যেতর এই সকল নারীদেবতাসমূহ ততই পর্বতকন্দরে, ঝোপজঙ্গলে বা গাছতলায় আশ্রয়লাভ করলেন। কিন্তু মধ্যযুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি টলমল করে উঠল, তখন এই সকল নারীদেবতা তাঁদের পর্বতকন্দর, ঝোপজঙ্গল ও গাছতলার আশ্রয় পরিহার করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশলাভ করতে লাগলেন। এই অনুপ্রবেশকে সহজ করবার জন্য তাঁদের পৌরাণিক মাতৃদেবীর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হল।

আর্যেতর এই সমস্ত দেবদেবীকে নিয়ে এক নতুন সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের এই সাহিত্যকে 'মঙ্গল সাহিত্য' বলা হয়। 'মঙ্গল সাহিত্য' সাধারণত চার শ্রেণীতে বিভক্ত—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন। মনসামঙ্গলের আখ্যান-বিষয় ছিল মনসা বা সর্পদেবীর পূজামাহাত্ম্য প্রচার করা। ইনি

যোষিৎগণ কর্তৃক নানা নামে পূজিতা হতেন। মধ্যযুগে তাঁর দুই নাম প্রাধান্ত লাভ করেছিল, যথা—মনসা ও পদ্মা। যোষিৎগণ কর্তৃক পূজিতা এই দেবীকে পুরুষসমাজের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মনসামঙ্গলসমূহের কাহিনীতে সেটাই প্রকাশিত হয়েছে। মনসার কোপে পড়ে চাঁদ সদাগর তার সাতপুত্র ও সাতডিঙিভরা পণ্যসম্ভার হারালেন, কিন্তু তথাপি তিনি মনসার পূজা থেকে বিরত রইলেন। যখন পুত্রবধূ বেহুলা মনসার কৃপালাভ করে নিজ স্বামী ও ছয় ভাশুরের পুনর্জীবন দান করাল ও নিমজ্জিত সাতখানি ডিঙি পণ্যসম্ভার-সমেত ফেরত আনল, তখনও বেহুলা তার শ্বশুরকে মাত্র একবারের জন্যও মনসাদেবীর পূজায় সম্মত করাতে পারল না। ঘৃণার সঙ্গে চাঁদ সদাগর পুত্রবধূকে উত্তর দিলেন, 'আমার সাতপুত্র ও সাতডিঙি ধনদৌলত রসাতলে যাক্, তবুও আমি মনসার পূজা করব না।' যেহেতু চাঁদ শিবোপাসক ছিলেন, সেই হেতু শিবপত্নী চণ্ডীকে তখন হস্তক্ষেপ করতে হল। স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে তিনি চাঁদকে বললেন, চাঁদ, তুমি পদ্মাবতীকে পূজার্ঘ্য দাও, কেননা পদ্মাবতী আমি ছাড়া আর কেউ নয়। এই স্বপ্নাদেশের পরেই চাঁদ সম্মত হয়েছিলেন পদ্মাবতীকে পূজার্ঘ্য দিতে। এইরূপে মনসার পূজা নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। হিন্দুসমাজ তখন মনসাকে পুরাণেও স্থান দিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কাহিনী অনুযায়ী মনসা সর্পগণের দেবী। ব্রহ্মার আদেশে কশ্যপমুনি সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করেন ও তপোবলে মন দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করে তাঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করেন। একজন্যই তাঁর নাম মনসা। কুমারী অবস্থায় মনসা মহাদেবের কাছে যান ও তাঁর কাছ থেকে স্তব, পূজা ও মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করে সিদ্ধা হন ও সর্পদংশন মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পরিগণিত হন। সেই থেকেই দেবতা, মনু, মুনি, নাগ, মানুষ সকলেই মনসাদেবীর পূজা করতে থাকেন।

'মঙ্গল' সাহিত্যসমূহের প্রধানা দেবী ছিলেন মঙ্গলা বা চণ্ডী। তিনি সর্ববিষয়েই সকলের ইষ্টসাধন করেন। মনসার ন্যায় চণ্ডীও পূর্বে নারীগণ কর্তৃক পূজিতা হতেন। দেবীভাগবতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মঙ্গলা নারীগণ কর্তৃক পূজিতা দেবতা—'যোষিতানাম্ ইষ্টদেবতাম্'। বোধ হয় এই কারণেই 'মঙ্গলা'-কে অষ্টযোগিনীর অন্যতমা বলা হয়েছে। ('মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা উল্কা সিদ্ধি সঙ্কটা চ যোগিনী অষ্ট প্রকীর্তিতা')। এখনও পর্যন্ত মেয়েরা মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করে থাকে। অনুরূপভাবে অষ্টযোগিনীর

অন্যতমা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতও মেয়েরা পালন করে। সর্ব বিষয়ে যিনি সকলের ইষ্টসাধন করেন তিনিই 'সর্বমঙ্গলা'। ওড়িশার শাক্ত কবি সারলাদাস তাঁর 'চণ্ডীপুরাণ' ও 'বিলঙ্করামায়ণ'-এ সর্বমঙ্গলাকে কালীর সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন। সেখানে বিবৃত হয়েছে যে দুর্গা যখন মহিষাসুর নিধনে অসমর্থা হন, তখন তাঁর সহচরী মনোরমা তাঁকে কালীর বিবস্ত্রা রূপ ধারণ করতে বলেন। সহচরীর এই উপদেশ অনুযায়ী দুর্গা যখন কালীরূপ ধারণ করেন, তখনই তিনি মহিষাসুরকে বিনাশ করতে সক্ষম হন। মনুষ্যসমাজের মঙ্গলসাধক মনোরমার এই উপদেশ কার্যকরী হওয়ায় দুর্গা মনোরমাকে বলেন, তোমার মঙ্গল হউক। আজ থেকে তুমি 'সর্বমঙ্গলা' নামে অভিহিতা হবে।

চণ্ডিকা পূজার প্রচার সম্বন্ধে বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যসমূহে দুটি আখ্যান বিবৃত হয়েছে। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতু সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টি বণিক ধনপতি সম্পর্কে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হবার অনেক আগে থেকেই যোষিৎগণ কর্তৃক পূজিতা এই সকল নারীদেবতা-সম্পর্কিত কাহিনী বাঙলার অলিখিত জাতীয় সাহিত্যমানসে সজীব ছিল। সেদিক থেকে মনে হয় যে ব্যাধ কালকেতু-সম্পর্কিত কাহিনীটি বণিক ধনপতির কাহিনী অপেক্ষা প্রাচীনতর। এ সকল কাহিনী যে অতি প্রাচীন কালের অলিখিত সাহিত্যের কাহিনী, তা এই উভয় কাহিনীর সারল্যপূর্ণ বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। বণিক ধনপতির দুই বনিতা ছিল—লহনা ও খুল্লনা (নাম দুটি অস্ট্রিক সমাজের বলে মনে হয়)। সপত্নী লহনা খুল্লনাকে ছাগল চরাতে পাঠিয়েছিলেন। একটি ছাগল দলচ্যুত হয়ে হারিয়ে যায়। খুল্লনা দুঃখে ও ভয়ে অভিভূত হন। দলচ্যুত ছাগলটিকে খুঁজতে খুঁজতে তিনি এক জায়গায় এসে দেখেন যে পাঁচটি মেয়ে উলুধ্বনি-সহ এক দেবীর পূজায় রত রয়েছে। তারা খুল্লনাকে বলে যে, সে যদি ওই দেবীর পূজা করে, তা হলে সে তার ছাগল খুঁজে পাবে। তাদের কথামত খুল্লনা ওই দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন এবং অচিরে তাঁর ছাগল খুঁজে পান। গৃহে প্রত্যাগমন করে খুল্লনা ওই দেবীর পূজা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শিবোপাসক ধনপতি দেবীপূজা পছন্দ করেন না। ধনপতি খুল্লনার পূজার ঘট ভেঙে দেন। এর কিছুকাল পরে ধনপতি বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল দ্বীপে যান। সিংহল দ্বীপের রাজা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এরপর ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত যখন চণ্ডিকার পূজা করেন তখনই ধনপতি

কারামুক্ত হন ও দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর থেকে ধনপতিও চণ্ডিকার পূজা করতে শুরু করেন। এর ফলে বাঙলায় বণিকসমাজে চণ্ডিকা পূজার প্রবর্তন হয়।

বণিক ধনপতির কাহিনী অপেক্ষা ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী প্রাচীনতর সমাজের ইঙ্গিত বহন করে। কালকেতু সমাজের নিম্নকোটির লোক ছিল। তীর, ধনুক ও জাল (পাশ) নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে পশু শিকার করে সে তার আহার্য ও জীবিকা সংগ্রহ করত। শিকার করে আনা পশুর মাংস ও চর্ম তার স্ত্রী হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে আসত। একদিন কালকেতুর ফাঁদে এক স্বর্ণগোধিকা ধরা পড়ে। কালকেতু সেটিকে ঘরে নিয়ে আসে। সেই গোধিকা দেবীমূর্তি ধারণ করে। কালকেতু তাঁকে পূজা করতে শুরু করে। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই কালকেতু বিত্তশালী হয়ে ওঠে। তখন সে জঙ্গল পরিষ্কার করে এক নগর স্থাপন করে। উচ্চকোটির লোকেরা প্রথমে সেই নগরে গিয়ে বাস করতে অসম্মত হয়। কিন্তু পরে তার ধন-ঐশ্বর্য ও প্রতাপ নিষ্ঠাবান সমাজকে আকৃষ্ট করে। তারা সেখানে গিয়ে কালকেতু কর্তৃক পূজিতা দেবীর পূজা করতে শুরু করে। কালকেতু কর্তৃক পূজিতা দেবী, চণ্ডিকা ব্যতীত আর কেউই নন। এই আখ্যানে গোধিকার উল্লেখ দেখে মনে হয় যে, কালকেতু কর্তৃক পূজিতা দেবী প্রথমে আর্যেতর জাতি কর্তৃক পূজিতা কোন দেবী ছিলেন, যিনি পরে নিষ্ঠাবান সমাজে চণ্ডিকারূপে গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গঠিত কয়েকটি দেবীমূর্তি বাঙলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে ; তাদের পাদমূলে গোধিকামূর্তি দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূর্তি-নির্মাণ-সম্পর্কিত কতকগুলি গ্রন্থে আমরা গোধিকা-বাহিনী দেবীমূর্তির উল্লেখ পাই—'গোধাসনে ভবেদ্ গৌরী লীলয়া হংসবাহনা' ও 'অক্ষসূত্রং তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা। গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়া সদা॥' লক্ষণীয় যে এখানেও তাঁকে যোষিৎগণ কর্তৃক পূজিতা দেবী বলা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি কাহিনীতে দেবীকে 'কমলে কামিনী' বা 'পদ্মাসনা দেবী' বলা হয়েছে। এর দ্বারা লক্ষ্মীর সঙ্গে চণ্ডিকার সম্পর্ক সূচিত হয়।

দুই

আর্যেতর সমাজে যে কেবল নারীদেবতাই ছিলেন, তা নয়। পুরুষদেবতাও ছিলেন। তবে নারীদেবতার তুলনায় তাঁরা সংখ্যায় অল্প। শিব ও ধর্মঠাকুর তাঁদের অন্যতম। তাঁদের আশ্রয় করেও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলিকে ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন আখ্যা দেওয়া হয়। ধর্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু হচ্ছে ধর্মরাজার পূজা। তিনি আসলে কে ? শিব, না বুদ্ধ ? না অনার্যসমাজের অপর কোন দেবতা ? সে সম্বন্ধে কোন মতৈক্য নেই। তবে তিনি যে আর্যেতর সমাজের দেবতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, ধর্মঠাকুরের পূজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে কেবল ডোমজাতীয় লোকরাই এঁর পুরোহিতের কাজ করে। হিন্দু সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজা-প্রবর্তন প্রসঙ্গে রাজা কর্ণসেনের পত্নী রঞ্জাবতী ও তাঁর পুত্র ময়নাগড়ের লাউসেনের নাম জড়িত। পালসম্রাট মহীপাল (৯৭৭-১০২৭ খ্রীস্টাব্দ) তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তা থেকে প্রমাণ হয় যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ধর্মঠাকুরের পূজা হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু-সমাজে গৃহীত হবার পর ক্রমশ ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাও ধর্মঠাকুরের পূজায় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। তা ধর্মের গাজন-উৎসবের অনুষ্ঠান ও আচার-পদ্ধতি থেকেও বুঝতে পারা যায়। ধর্মঠাকুর হচ্ছেন নিরাকার, তবে বীরভূমের কয়েক স্থানে তাঁকে জামরায় প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য এ সকল নাম পরবর্তী কালের নিষ্ঠাবান সমাজ কর্তৃক আরোপিত হয়েছিল।

শিবের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের নৈকট্য সূচিত হয় শিবের গাজন-উৎসবের মাধ্যমে। ধর্মঠাকুরের গাজন,. শিবের গাজন, আদ্যের গম্ভীরা প্রভৃতি উৎসবের আচার-অনুষ্ঠান প্রায়ই এক। বস্তুত মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে শিবই ছিলেন প্রধান উপাস্য দেবতা। বাঙলায় শিবমন্দিরসমূহের প্রাচুর্য থেকেও তাই প্রমাণ হয়। শিবকে অবলম্বন করে যে কাব্য রচিত হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল শিবায়ন। এই সকল কাব্যে শিবঠাকুরকে আমরা সাধারণ বাঙালী গৃহস্থরূপে দেখি। গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের মতো তিনিও মাঠে চাষ করেন এবং গৌরীর সঙ্গে গৃহস্থজীবন যাপন করেন। বস্তুত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গৌরীর বিবাহের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ বাঙালী মেয়েরই বিবাহ। পতি হিসাবে শিবের মতো পতিই বাঙালী মেয়ের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ হয়ে উঠেছিল। এর প্রকাশ পাই কুমারীগণ কর্তৃক বৈশাখ মাসে পালিত শিবপূজায়।

তিন

মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে এসে এবং তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে হিন্দু সমাজে আরও অনেক দেবদেবী আবির্ভূত হন। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সত্যপীর, গাজীসাহেব, বনবিবি প্রভৃতি। এর মধ্যে সত্যপীরের পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। সত্যপীরের পূজা-কথায় বলা হয়েছে যে, সত্যপীর ও নারায়ণ অভিন্ন। সেজন্য সত্যপীর বর্তমানে সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হন।

বলা বাহুল্য, মধ্যযুগে এই সকল যুক্তসাধনামূলক গণতান্ত্রিক দেবদেবীর পূজার উদ্ভবের ফলে, হিন্দুসমাজ মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তর-করণের ফলে যে ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছিল, তা থেকে রেহাই পায়।

ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে আর এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। এ সম্প্রদায় হচ্ছে বাউল (সংস্কৃত 'বাতুল' ; তুলনীয় হিন্দী 'বাউরা') সম্প্রদায়। এরা সন্ত ও ফকিররূপে বিচরণ করত। মনে হয়, বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে সুফীদের যোগাযোগের ফলে এদের উদ্ভব ঘটেছিল। বাউলদের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে 'মনের মানুষ' লাভ করা। 'মনের মানুষ' অনন্ত পরম সত্য, আবার ব্যক্তিগত প্রেমের আধার। বাউলদের 'মনের মানুষ' আছে দেহসীমার মধ্যে। এক কথায় তারা সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করতে চায়। তারা 'মনের মানুষ'-এর সঙ্গে সমন্বিত হতে চায় প্রেমের দ্বারা। সেজন্যই 'প্রেম-ব্যাকুলতায় বাউলেরা উন্মত্ত'। বাউল সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হচ্ছে বাউল গান। বাউলেরা এই গানের মাধ্যমেই নিজেদের সাধন-ভজনের গূঢ়তত্ত্ব নানারূপ রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের অনুরাগী ছিলেন। অনেকে বলেন বাউলদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জয়দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে কেন্দুলিতে যে মেলা হয়, সেখানে সকল স্থানের বাউলরা একত্রিত হয়।

মধ্যযুগের ধর্মীয় যুক্তসাধনার ক্ষেত্রে সুফীবাদের অবদানও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সুফীবাদ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিল। সুফীগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান দিতেন ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগলাভের পথনির্দেশ করতেন। তাঁরা পবিত্র জীবনযাপন করতেন ও অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেন। তা ছাড়া, তাঁরা বহু লোকহিতকর কার্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন। নানা জনহিতকর কাজের জন্য তাঁরা সাধারণ লোকের প্রশংসা হয়ে-

ছিলেন, এবং তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের দরগাগুলি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের কাছেই পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত হত, যদিও অধিকাংশ দরগাগুলি হিন্দুদের পবিত্র স্থানগুলির ওপর নির্মিত হত। যেমন বগুড়া জেলার মহাস্থানে সৈয়দ সুলতান শাহী সওয়ারের দরগা এক শিব মন্দিরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সত্যপীরের স্থান এক বৌদ্ধ মঠের ওপর নির্মিত।

হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনায় পীরপূজা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। পীর বলতে শাহ, শেখ, মুরশিদ, ওস্তাদ, সুফী প্রমুখ সাধুসন্তদের বুঝাত। মুসলমান সেনাপতিগণও যুদ্ধে নিহত হলে গাজী-পীর রূপে পূজিত হতেন। মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে বহু পীরের বন্দনা আছে। পীরের দরগাসমূহের প্রতি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমানভাবে তাদের শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য নিবেদন করত। পীর পূজাকে অবলম্বন করে হিন্দুসমাজে অনেক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছিল। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সত্যপীর, গাজীসাহেব, বনবিবি ইত্যাদি। এর মধ্যে সত্যপীরের পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। সত্যপীরের পূজা-কথায় বলা হয়েছে যে সত্যপীর ও নারায়ণ অভিন্ন। সত্যপীরকে অবলম্বন করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই অনেক পাঁচালী রচনা করেন। ফৈজুল্লার পাঁচালীতে আছে —'তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ। শুন গাজী আপনি আসরে দেহ মন।' সত্যপীর বর্তমানে সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ফরাসী লেখকের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে হিন্দুরা যেমন মুসলমান পীর ও সাধুসন্তদের প্রতি ভক্তি দেখাতেন, মুসলমান পীর ও সন্তদের-মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগামী ছিলেন। এক কথায় মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যুক্তসাধনার একটা ধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

বাঙলার স্মার্ত পণ্ডিতগণ

মধ্যযুগের কয়েকজন প্রখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতের কথা এখানে বলব। তাঁদের মধ্যে ভবদেব ভট্ট ছিলেন দশম-একাদশ শতাব্দীর লোক। হলায়ুধ ও জীমূত-বাহন সেন রাজাদের আমলের লোক। বৃহস্পতি মিশ্র ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মুসলমানদের শাসনকালে প্রাদুর্ভূত হন। হলায়ুধ প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে। তিনি ছিলেন তৃতীয় সেনরাজা লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণসমাজের জন্য তিনি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন যথা 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'মীমাংসাসর্বস্ব', বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব', ও 'পণ্ডিতসর্বস্ব'। সে যুগের স্মৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে তিনিই অগ্রগণ্য। তাঁর আর দুই ভাই ঈশান ও পশুপতিও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঈশান রচনা করেছিলেন 'আহ্নিকপদ্ধতি' সম্বন্ধে, ও পশুপতি 'শ্রাদ্ধপদ্ধতি' সম্বন্ধে। এখানে উল্লেখনীয় যে হলায়ুধ নামে আর একজন পণ্ডিতের খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি 'অভিধান রত্ন-মালা', 'কাব্যরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শেষের খানা ব্যাকরণের বই।

জীমূতবাহন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। তিনি তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ তিনখানির নাম 'কালবিবেক', 'ব্যবহারমাতৃকা' ও 'দায়ভাগ'। শেষোক্ত বিধানগ্রন্থটির জন্যই তিনি বিখ্যাত। 'কালবিবেক' গ্রন্থে তিনি হিন্দুর পূজানুষ্ঠান, শুভকর্ম, আচার ও ধর্মোৎসব প্রভৃতির কাল নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থে 'হোলাকা' বা হোলি উৎসবের উল্লেখ আছে। 'ব্যবহারমাতৃকা' গ্রন্থে হিন্দু বিচারপদ্ধতির আলোচনা আছে। তৃতীয় গ্রন্থটি উত্তরাধিকার সম্পর্কে উত্তরভারতে প্রচলিত 'মিতাক্ষরা' বিধানের বিপক্ষে লেখা। এতে উত্তরাধিকার, সম্পত্তিবিভাগ, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত। বইখানি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের যুক্তি ও মতামতের ভিত্তিতে লেখা ও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। জীমূতবাহন পিণ্ডদানের সহিত উত্তরাধিকার যুক্ত করেন ও সম্পাদিত কর্ম নিয়মমত না হলেও তাহা সিদ্ধ বলে গ্রহণ করার রীতির বিধান দেন। 'দায়ভাগ' বাঙলাদেশে উত্তরাধিকার বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানের নিয়ামক।

বাঙলায় 'দায়ভাগ'-এর বিধানই প্রচলিত।

ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ ও জীমূতবাহনের কিছু আগেকার লোক। তিনি খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা গোবর্ধন পণ্ডিতলোক ছিলেন। পিতামহ আদিদেব বর্মণবংশীয় রাজার মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেব নিজেও বর্মণবংশীয় রাজা হরিবর্মদেব ও তাঁর এক অজ্ঞাতনামা পুত্রের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরই মন্ত্রণাপ্রভাবে বর্মণরা বহুদিন রাজত্ব করতে সক্ষম হন। তিনি উত্তররাঢ়ের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। 'ছোটরাজা' নামে তিনি পরিচিত। প্রজাগণের মঙ্গলার্থে তিনি রাঢ় দেশের বহু জায়গায় জলাভাব দূরীকরণের জন্য পুষ্করিণী খনন করে দিয়েছিলেন। সিদ্ধলপুরে তিনি নারায়ণের এক মন্দির নির্মাণ ও তৎসংলগ্ন এক জলাশয় খনন করে দিয়েছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিতশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। বৌদ্ধদের মতামত খণ্ডন করে তিনি বহু বৌদ্ধকে হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। হিন্দুর আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যথা 'দশকর্ম-পদ্ধতি', 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ', 'ব্যবহার তিলক' ও মীমাংসাদর্শনের ওপর এক টীকা। পরবর্তীকালে রঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁর মতামত উদ্ধৃত করেছেন। সমাজের তিনি বহু সংস্কার করে গিয়েছেন। তিনি বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণদের মাছ খাবার বিধান দেন। পরে জীমূতবাহনও সেই বিধান দিয়েছিলেন এবং সেই সময় থেকেই বাঙালী ব্রাহ্মণরা মাছ খাওয়া শুরু করেন। তাঁর অব্যবহিত পরেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা বাঙলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন।

বৃহস্পতি মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। পিতা গোবিন্দ ছিলেন 'মাহিন্ত্য' শ্রেণীভুক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ও বহু টীকা গ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থ লিখে গিয়েছেন। যে সকল টীকাগ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন তার অন্যতম হচ্ছে 'সুকেশ' নামে কুমারসম্ভবের টীকা, 'রঘুবংশ-বিবেক' নামে রঘুবংশের টীকা, 'নির্ণয় বৃহস্পতি' নামে শিশুপালবধের টীকা, 'পদচন্দ্রিকা' নামে অমরকোষের টীকা ও 'বোধবতী' নামে মেঘদূতের টীকা। তাঁর রচিত স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে 'রায়মুকুটপদ্ধতি' ও 'স্মৃতিরত্নহার' বিশেষ প্রসিদ্ধ। রঘুনন্দন এ দুখানা স্মৃতিগ্রন্থের প্রামাণ্য উদ্ধৃত করে গিয়েছেন। গৌড়ের সুলতান

জালালুদ্দিন ও বারবক শাহের অধীনে উচ্চরাজকর্মে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে সুলতান তাঁকে 'রায়মুকুট' উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর গুরু শ্রীধর মিশ্রের কাছ থেকে তিনি 'মিশ্র' উপাধি পেয়েছিলেন।

রঘুনন্দনই মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় স্মার্ত পণ্ডিত। তিনি রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। নবদ্বীপের হরিহর ভট্টাচার্য তাঁর পিতা। নবদ্বীপের তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কচূড়ামণির নিকট স্মৃতি ও মীমাংসা অধ্যয়ন করেন। এই উভয় শাস্ত্রেই রঘুনন্দনের ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের ন্যায় তিনিও হিন্দু সমাজকে সুলতান হুসেন শাহের সময়কার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। তিনিই বিধান দেন যে মুসলমানগণ কর্তৃক অপহৃতা হিন্দুনারীকে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা চলবে। তিনি 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব স্মৃতিগ্রন্থ', 'প্রয়োগগ্রন্থ', দায়তত্ত্ব এবং জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ'-এর ওপর টীকা লেখেন। তিনি আরও বিধান দেন যে বাঙালী ব্রাহ্মণরা মসুর ডাল খেতে পারেন। হিন্দু সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বিধানসমূহ এখনও হিন্দুসমাজে গ্রাহ্য।

আগেই বলেছি (বাঙলার মনীষা ও সাহিত্যসাধনা অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে চর্যাগানসমূহ। তারপর মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পূর্বে বাঙলায় নাথধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। নাথধর্মকে অবলম্বন করে বাঙলায় এক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যাকে আমরা 'নাথসাহিত্য' বলি। এই সাহিত্যের উপজীব্য হচ্ছে দুটি কাহিনী। একটি গুরু মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথকে নিয়ে। অপরটি রাজা মানিকচন্দ্র, তাঁর স্ত্রী ময়নামতী ও পুত্র গোপীচাঁদকে নিয়ে। নাথসম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন মহাদেব। যোগের সাহায্যে জীবন্মুক্তি, অসাধ্য সাধন ও মৃত্যুর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করা ইত্যাদি ওঁদের লক্ষ্য বলে নাথ সম্প্রদায় শৈব-যোগী সম্প্রদায়রূপে আখ্যাত। এই ধর্মটি একসময় অখিল ভারতীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল এবং কেবল বাংলা ভাষাতে নয়, নাথধর্মের উপাখ্যানগুলি নিয়ে হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী, সিংহলী প্রভৃতি নানা ভাষায় নানা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। চর্যাগীতের মতো এঁদের সাহিত্যেও গূঢ় সাধনতত্ত্ব হেঁয়ালি ভাষায় রচিত। যথা, গোপীচন্দ্র সন্দিগ্ধ-মনা হয়ে মাতা ময়নামতীকে জিজ্ঞাসা করছেন—'কোন্ বিরিখির বোঁটা আমি মা কোন্ বিরিখের ফল।' মা, উত্তর দিতেছেন—'মন বিরিখের বোঁটা তুই তন্ বিরিখের ফল॥ গাছের নাম মহুহর, ফলের নাম রসিয়া। গাছের ফল গাছে থাকে, বোঁটা পড়ে খসিয়া॥ কাটিলে বাঁচে গাছ, না কাটিলে মরে। দুই বিরিখের একটি ফল জানর্নি সে ধরে॥' এটা 'ময়নামতীর গান' থেকে উদ্ধৃত। দ্বিতীয় কাহিনীটি 'ময়নামতীর গান' ছাড়া, 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', 'গোপীচন্দ্র রাজার গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস' ইত্যাদি নানা নামে মৌখিক ও লিখিতরূপে পাওয়া গিয়েছে। কাহিনীটি প্রথম একখানি প্রাচীন পুঁথি থেকে সংকলন করে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় 'মীনচেতন' নামে প্রকাশ করেন। তারপর একাধিক পুঁথি তুলনা করে মুন্সী আবদুল করিম 'গোরক্ষবিজয়' নামে প্রকাশ করেন। আরও অধিকসংখ্যক পুঁথির সাহায্যে বিশ্বভারতী থেকে পঞ্চানন মণ্ডল 'গোর্খবিজয়' নামে প্রকাশ করেন। পুঁথিগুলিতে নানারকম ভণিতা আছে, যথা, ভীমদাস বা ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন, ভবানীদাস, কবীন্দ্র ও সুকুর মামুদ।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি কোন সময় নাথধর্মের উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে কাহিনীগুলি প্রথমে মৌখিক আকারে ছিল, পরে লিখিতরূপ ধারণ করেছিল, কেননা যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সবই তিনশো বছরের অধিক পুরানো নয়। এখানে উল্লেখনীয় যে বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপের এক নিদর্শন রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থের এক প্রেমগীতিতে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই প্রেমগীতিটি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। 'শেখ শুভোদয়া'র বিবৃত হয়েছে রামপালের মৃত্যু ও বিজয়সেনের রাজ্যপ্রাপ্তি।

দুই

বাঙলার আদি কবি চণ্ডীদাস (১৪১৭-৭৭)। পদাবলী সাহিত্যের তিনিই প্রবর্তক। রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের মাধ্যমে 'সহজ' সাধনার উদ্বোধন করাই পদাবলী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল। 'পদাবলী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে (১।৩) যদিও পদাবলী বলতে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলাবিষয়ক গীত বুঝায়। দাক্ষিণাত্যে ও মিথিলায় শিবকে নিয়ে ও বাঙলায় উমাকে নিয়েও কিছু পদ রচিত হয়েছিল। এ সাহিত্যের ভাষা অতি সরল। যেমন, চণ্ডীদাসের এক পদগীত আরম্ভ হচ্ছে— 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।' আর একজন পদকর্তার রচনায় পাই—'ওপার হতে বাজাও বাঁশী এপার হতে শুনি। অভাগিয়া নারী আমি সাঁতার নাহি জানি।'

নিজের মন-মন্দিরে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের যে শাশ্বত প্রেমলীলা অনুভব করেছিলেন, তাই গভীর ভাবানুভূতির সঙ্গে অভিব্যক্ত করেছেন তাঁর রচিত পদসমূহে। চণ্ডীদাসের এই গভীর অনুভূতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ঠাকুর ঠাকুর কর তুমি, ঠাকুর কোথা পাবে। দিলদরিয়ার কপাট খোল ঠাকুর দেখতে পাবে।' বস্তুত চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী রাধার হৃদয়-আর্তির সকরুণ কাহিনী।

আগেই বলেছি যে চণ্ডীদাস ছিলেন সহজ-সাধনার কবি। কথিত আছে তিনি রামী নামে এক রজকিনীর সঙ্গে এই সহজ-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন।

'রজকিনী' শব্দটা 'ধোবানী' অর্থেই সকলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এর অর্থ অন্য। সহজ-সাধনা যে তান্ত্রিক সাধনারই একটা বিশেষরূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রামী ছিল 'যোগিনীপ্যারা'। সেজন্য আমার মনে হয় যে 'রজকিনী' শব্দটা তান্ত্রিক সাধকদের অর্থে গ্রহণ করা অন্যায় হবে না। রেবতীতন্ত্রে 'চণ্ডালী', 'যবনী', 'বৌদ্ধা', 'রজকী' প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার কুলস্ত্রীর বিবরণ আছে। নিরুত্তরতন্ত্রকার বলেন, ওই সকল চণ্ডালী, রজকী প্রভৃতি শব্দ বর্ণ বা বর্ণসঙ্করবোধক নয়, কার্য বা গুণের বিজ্ঞাপক। বিশেষ বিশেষ কার্যের অনুষ্ঠান করলে সকল বর্ণোদ্ভবা কন্যাই ওই সমস্ত আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যেমন, 'পূজাদ্রব্যং সমালোক্য রজোঽবস্থাং প্রকাশয়েত। সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্তিতা।' মানে পূজাদ্রব্য দেখে যে-কোন বর্ণোদ্ভবা কন্যা রজোঽবস্থা প্রকাশ করে, তাকে রজকী বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চণ্ডীদাস বাশুলীদেবীর সেবক ছিলেন। বাশুলী বা বিশালাক্ষী চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতমা। রামী সম্বন্ধে আমি যে প্রশ্ন এখানে তুলেছি, আমার মনে হয় বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁদের এটা গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

বস্তুত চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমাদের কাছে অনেক কিছু অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। তার কারণ, চণ্ডীদাসকে আমরা বিশেষভাবে জেনেছি মাত্র একশো বছরের কিছু আগে। চণ্ডীদাসের কথা আমাদের প্রথম শোনান রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ একটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে। তারপর জগবন্ধু ভদ্র বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশ করে চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদাবলীগুলি আমাদের নজরে আনেন। এর কিছু পরে অক্ষয়চন্দ্র সরকার চণ্ডীদাসের সঙ্গে বাঙালী পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস পদাবলী'র একটা সংস্করণ বের করে। বটতলার প্রকাশন সংস্থাসমূহ থেকেও 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পদাবলী'র এক সংস্করণ বেরোয়।

চণ্ডীদাসের নামে যে সকল পদাবলী পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে নানা রকম ভণিতা দেখতে পাওয়া যায়। যথা 'চণ্ডীদাস', 'বড়ু চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস' প্রভৃতি। সুতরাং স্বভাবতই মনে হয় যে একাধিক চণ্ডীদাস ছিলেন। তার মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস (চতুর্দশ শতাব্দী) রচিত একখানা গ্রন্থের পুঁথি বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বাঁকুড়া থেকে আবিষ্কার করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম

দিয়ে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এর প্রকাশক হচ্ছে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। কিন্তু এই বড়ু চণ্ডীদাস কে? এ সমস্যা আজও মীমাংসিত হয়নি। কেননা, এর পুঁথিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা ছাড়া, বার পাঁচেক 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতাও আছে। তবে পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের ভাষার সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় প্রভেদ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার নমুনা—'মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়াই শিষের সিঁদুর। বাহুর বলায় মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥ কাহ্ন বিনা সবখন পোড়এ পরানী। বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।' বিদ্যাপতি (১৩৫০-১৪৮০) মূলতঃ মৈথিলী কবি ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলি মৈথিলী ভাষাতেই রচিত। তবে দু-একটি পদ বাংলা থেকে তফাত নয়। যেমন, 'বালা রমণী রমণে নাহি সুখ। মদন দ্বিগুণ দেয় দুখ॥'

চৈতন্য-পূর্বযুগের পদাবলীর মধ্যে আমরা সাধারণত দুটি ধারা দেখতে পাই। একটি বিদ্যাপতির, অপরটি চণ্ডীদাসের। বিদ্যাপতির পদ অলংকারসমৃদ্ধ, আর চণ্ডীদাসের সহজ ও সরল এবং অলংকারবর্জিত। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বৃহত্তম সংকলন হচ্ছে গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু'। চৈতন্যের সমসাময়িক পদকর্তা হিসাবে নাম করে ছিলেন নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, মুরারি গুপ্ত বলরাম দাস, বংশীবদন, গোবিন্দমাধব, বাসুদেব ঘোষ ও রামানন্দ বসু। চৈতন্য-উত্তর যুগে পদকর্তা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন জ্ঞানদাস, রায়শেখর, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস কবিরাজ, নরোত্তম ঠাকুর ও বলরাম দাস। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবর্তে শাক্ত পদাবলীরই প্রাধান্য দেখি।

বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষভাবে পুষ্ট হয় চৈতন্যোত্তর যুগে। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) নিজে কোন সাহিত্য রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর তিরোভাবের পর তাঁর মহিমান্বিত জীবন অবলম্বনে এক জীবনী-সাহিত্য রচিত হয়। মহাপ্রভুর দৈবী মহিমা এই সকল জীবনী-কাব্যে বিবৃত হয়েছে। এই জীবনী-কাব্যের মধ্যে প্রাধান্য হচ্ছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' বা 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের (১৫৩০-১৬১৫) 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এ দুটি রচিত হয়েছিল খ্রীস্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে। এ ছাড়া, আর একখানা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে গোবিন্দদাসের 'কড়চা'। আরও যাঁরা বৈষ্ণব সাহিত্য রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুরারি গুপ্ত, পরমানন্দ সেন, লোচনদাস, জয়ানন্দ মিশ্র, হরিচরণ

দাস, ঈশান নাগর প্রমুখ। এ ছাড়া বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচনায় যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁদের নাম আগেই দিয়েছি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচুর্য থাকলেও (এ সময় অনেক মুসলমান পদকর্তারও প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল) মনে হয় চৈতন্যের ভাবপ্রেরণা কিছু হ্রাস পেয়েছিল, কেননা, সুফী ধর্মের সহিত সহজিয়া ধর্মের কিছু মিল থাকায় লৌকিক স্তরে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-সাধনায় কতকটা সমন্বয় হয়েছিল ও তা সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছিল বাউল সম্প্রদায়ের গানে।

তিন

মুসলমানগণ কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর, বাঙলাদেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চা বিপর্যস্ত হয়। অন্তত উচ্চকোটি সমাজে আমরা এ সম্বন্ধে এক শূন্যময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এর কোন ছেদ পড়েনি। গ্রামে যে সকল লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব ছিল, তাঁদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পালাগান গাইবার জন্য মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল। এই পালাগান সমূহকে 'পাঁচালী' বা পাঞ্চালিকা বলা হত, এবং সেগুলি রাতের পর রাত নাচ ও বাজনার সঙ্গে গাওয়া হত।

মঙ্গলকাব্যসমূহ বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে, যখন বাঙলাদেশে স্বাধীন সুলতানদের আমলে দেশে আবার শান্তিসমৃদ্ধি ফিরে আসে। তখন হিন্দু জায়গিরদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলাদেশে আবার কাব্য-চর্চার সূত্রপাত হয় ও মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হতে থাকে, যথা—মনসামঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি। মনসামঙ্গলের উদ্দেশ্য ছিল মনসা বা সর্পদেবীর পূজা-মাহাত্ম্য প্রচার করা। কাহিনীর নায়ক-নায়িকা ছিল চাঁদ সদাগর ও তাঁর পুত্র লখীন্দর ও পুত্রবধূ বেহুলা। শতাধিক কবি মনসামঙ্গল রচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন প্রাক্-চৈতন্যযুগে হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত (১৪৮৩-৮৪), বিপ্রদাস (১৪৯৭-৯৫) ও নারায়ণদেব এবং চৈতন্যোত্তর যুগে কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, জীবন মৈত্র প্রভৃতি। মনসামঙ্গলের ভাষা খুব সরল, যথা—'জাগ ওহে বেহুলা সায় বেনের ঝি। তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি॥'

মনসামঙ্গলে যেমন একটি কাহিনী আছে, চণ্ডীমঙ্গলে আছে দুটি কাহিনী।

একটি ব্যাধ কালকেতু-লহনা-খুল্লনা ও আর একটি ধনপতি সদাগর-শ্রীমন্ত সদাগর সম্পর্কিত।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরামের ভাষার নমুনা—'সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙা পিতল। ঘসিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জল॥'

মুকুন্দরামকেই অনুসরণ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় রচনা করেছিলেন তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। শ্রুতিমধুর শব্দের জন্ম এখানা ছিল শব্দের 'তাজমহল'। ওই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের সভাকবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচনা করেছিলেন তাঁর 'শিবায়ন' কাব্য। শিবায়ন কাব্যে শিবকে সাধারণ কৃষক ও শিবজায়াকে কৃষকপত্নী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের প্রতিবেশীর নিকট ঋণ করে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু ঋণের কি মর্মান্তিক বেদনা, তা কবি বর্ণনা করে বলেছেন—'গতে ঋণে বিষমে কুকুর রতিবশে। প্রবেশে পরম সুখ প্রাণ যায় শেষে।'

মঙ্গলকাব্যসমূহের একটা বড় শাখা হচ্ছে ধর্মমঙ্গল। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বন করে এগুলি রচিত। কিন্তু এর কাহিনীর একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ডোম জাতীয় নরনারীর বীরত্ব কীর্তিত হয়েছে। ময়ূরভট্টকেই ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বলা হয়। অবশ্য তাঁর পূর্বে রামাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছিলেন। ময়ূরভট্টের ভাষার নমুনা—'স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা। চিতানলে দুয় বধূ হৈল অনুমৃতা॥ পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল। সর্বশোকে কর্ণসেন হইল পাগল॥' আর যাঁরা ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলে তাঁদের মধ্যে ছিলেন সহদেব চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী।

লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্ম আরও যেসব মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, কপিলামঙ্গল প্রভৃতি। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করেই ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। অন্নদা ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের গৃহদেবতা।

চার

মঙ্গলকাব্য ছাড়া, মধ্যযুগে পুরাণ ও মহাকাব্যসমূহকে অবলম্বন করেও কাব্য রচনা করা হয়েছিল। এই যুগেই রচিত হয়েছিল অনন্ত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। সুলতান হুসেন শাহের অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর আদেশে পরমেশ্বর দাস কর্তৃক রচিত হয়েছিল 'পাণ্ডববিজয়' নামে মহাভারতের একটি কাব্যানুবাদ। পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব'। বস্তুতঃ এ যুগের অনেক মুসলমান শাসনকর্তাই উৎসাহিত করেছিলেন অনুবাদ-কাব্য রচনায়, বহু বাঙালী কবিকে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ ও ভূমিদান ও রাজকীয় উপাধি দিয়ে। বলা বাহুল্য এই সকল অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের সংস্কৃতি ও আদর্শ আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। সেটা প্রকাশ পায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদপ্রাচুর্য থেকে। অনন্তই প্রথম রামায়ণ অনুবাদ করেন। তারপর করেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামায়ণ রচনা করেছিলেন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। ইনি, 'মনসার ভাসান' রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। তাঁর বংশ-পরিচয়ে তিনি বলেছেন—'বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়। পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়। সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা। যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা।' চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্যের গানগুলি আজও মৈমনসিংহ জেলায় মেয়েরা বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে গেয়ে থাকে। পরবর্তী রামায়ণকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রঘুনন্দন গোস্বামী, কৈলাস বসু, রামশঙ্কর দত্ত, ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, শঙ্কর চক্রবর্তী, দ্বিজ ভবানীনাথ, রামানন্দ ঘোষ, রামপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কবিগণ।

কাশীরামের সুবিখ্যাত 'মহাভারত' রচিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। কথিত আছে যে কাশীরাম কাব্যখানিকে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি এবং এটাকে সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম ঘোষ। আরও যাঁরা এ-সময় মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, ষষ্ঠীধর সেন, নিত্যানন্দ ঘোষ, গঙ্গাদাস ও রামেশ্বরদাস। এছাড়া, শ্রীমদ্‌ভাগবত, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ, কাশীখণ্ড, হরিবংশ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেরই বাংলায় অনুবাদ হয়েছিল।

পাঁচ

বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট শাখা হচ্ছে শাক্ত পদাবলী। এর উদ্ভব ও বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয়েছিল। শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছে রামপ্রসাদ সেন। তাঁর সঙ্গীতের অনেক জায়গায় তিনি পরিবেশক রূপক ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'মাগো তারা ও শংকরী, কোন্ বিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রীজারী। এক আসামী ছয়টা প্যাদা বল্ মা কিসে সামাই করি, আমার ইচ্ছে করে ওই ছয়টাকে বিষ খাইয়ে প্রাণে মারি। পলাইতে স্থান নাই মাগো বল মা কিসে উপায় করি। ছিল স্থানের মধ্যে অভয়চরণ তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি।' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যে-সকল শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তা আজও অমর হয়ে আছে। আর যেসব শাক্ত কবির উদ্ভব ঘটেছিল তাঁরা হচ্ছেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, পাঁচালীকার দাশু রায় ও কবিওয়ালা রাম বসু, মিরজা হুসেন, এন্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা প্রমুখ। এন্টনি ফিরিঙ্গির এক বিখ্যাত গান—'আমি ভজন-সাধন জানিনে মা, নিজে তো ফিরিঙ্গি। যদি দয়া করে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী।'

বাঙালীর স্বভাবের কমনীয়তা, রস ও সৌন্দর্যবোধ ও মাধুর্য বাঙালীকে কাব্যের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেজন্য উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী গদ্য সাহিত্য রচনা করেনি। গদ্যের ব্যবহার মাত্র চিঠিপত্র ও দলিলাদি সম্পাদনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। গদ্যসাহিত্যের অভ্যুত্থান ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর দু-একখানা গদ্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। তখন থেকেই গদ্য বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

আগেই বলেছি যে মধ্যযুগের বাংলা পদ্য-সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল মঙ্গলকাব্যসমূহ। মঙ্গলকাব্যসমূহ এক একটা কাহিনী অবলম্বনে রচিত—কেবল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি আখ্যান ছিল। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলির নায়ক-নায়িকারা হচ্ছে ইছাই ঘোষ ও লাউসেন, রানী ময়নামতী ও তাঁর ছেলে রাজা গোবিন্দচন্দ্র, ব্যাধ কালকেতু ও তাঁর স্ত্রী ফুল্লরা, চাঁদ সদাগর ও তার পুত্র লখীন্দর ও পুত্রবধূ বেহুলা, ধনপতি সদাগর ও তার পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর। এ কাহিনীগুলি

নিয়ে যমপুরী রওনা হলে, রানী ময়নামতী তার পশ্চাদ্ধাবন করে যমপুরীতে প্রবেশ করে সকলকে ত্রস্ত করে তোলে। অবশেষে গুরু গোরখনাথের মধ্যস্থতায় স্থির হয় মৃত রাজার প্রাণ আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না ; তবে ময়নামতী একটি পুত্র লাভ করবেন। মানিকচন্দ্রকে দাহ করবার সময়, রানী ময়নামতী সহমরণে যান। কিন্তু আগুনে তাঁর দেহ দগ্ধ হল না। রানী গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ নামে এক পুত্র লাভ করেন। গোপীচাঁদ বড় হয়ে হরিশ্চন্দ্র রাজার মেয়ে অদুনাকে বিয়ে করে তার অনুজা পদুনাকে যৌতুকস্বরূপ পান। ময়নামতী দিব্যজ্ঞানে জানলেন যে হাড়ি-সিদ্ধার শিষ্য হয়ে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে ১৮ বছর বয়সে গোপীচাঁদের মৃত্যু হবে। রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন ; যুবতী রানীরাও বাধা দিল। পরে গোপীচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১২ বছর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি সুখে জীবনযাপন করতে থাকেন।

মনসামঙ্গলের কাহিনী হচ্ছে চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দর ও তার পত্নী বেহুলাকে নিয়ে রচিত। মনসার কোপে বিয়ের রাত্রে সর্পদংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হয়। পতিপ্রাণা বেহুলা একটি কলার ভেলায় করে লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে দেবপুরের উদ্দেশ্যে অপরিচিত পথে যাত্রা করেন। অনেক বাধাবিঘ্ন বিপদ-আপদ অতিক্রম করে দেবপুরের ধোবানী নেতার সহায়তায় গন্তব্যস্থানে পৌছান।

সেখানে নৃত্যগীতে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে, তিনি লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভ করেন। কৌশলে বেহুলা মনসার কোপে নিহত চাঁদ সদাগরের আরও ছয় মৃত-পুত্রের জীবন ও নৌকাডুবিতে সমুদ্রতলশায়ী ধনরত্ন সব উদ্ধার করে চাঁদ সদাগরের কাছে ফিরে আসেন। শিবভক্ত চাঁদ মনসার পূজা করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু অনেক অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বেহুলা চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করান।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যসমূহে দুটি আখ্যান বিবৃত হয়েছে। একটি বণিক ধনপতি সম্পর্কে ও অপরটি কালকেতু সম্পর্কে। এই দুটি কাহিনীই আমরা আগের এক অধ্যায়ে দিয়েছি। সুতরাং এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করব না।

যোষিৎগণ কর্তৃক পূজিত এই সকল নারীদেবতা-সম্পর্কিত কাহিনী বাঙলার অলিখিত জাতীয় সাহিত্যমানসে সজীব ছিল। এগুলিকেই অবলম্বন করে মধ্য-যুগের বাঙলায় এক বিরাট পদ্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

সাত

মধ্যযুগে অনেক মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সকল মুসলমান কবিরা হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণের পদাবলী, নরনারীর প্রণয়কাহিনী ও নীতিমূলক অনেক বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের কাব্যসমূহ রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজীই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রাণী'। এই কাব্যে তিনি দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের পরিবর্তে বাস্তব জগতের নরনারীর প্রণয়কথা ও সুখদুঃখের চিত্র অঙ্কিত করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করেছিলেন। মিয়া সাধন নামক হিন্দী কবি রচিত 'ময়নাকো সত' নামক কাব্যের কাহিনী অনুসরণে রচিত হলেও দৌলত কাজী তাঁর কাব্যে অসাধারণ কবিত্বপ্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আরাকান রাজ্যের অপর কবি সৈয়দ আলাওলও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমাল', 'হপ্তপয়কর', 'তোহফা' ইসলামধর্মী গ্রন্থ। কিন্তু যে কাব্যটির জন্য তিনি বাঙালী হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, সেটি হচ্ছে 'পদ্মাবতী'। এটি ইতিহাস আশ্রিত এক রোমান্টিক প্রেমকাহিনী। মধ্যযুগের সাহিত্যে কাব্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'সতী ময়নামতী' ও 'পদ্মাবতী'—এই দুই কাব্যে মানুষের প্রেম, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের মহিমা বর্ণিত হয়েছে অপূর্ব ছন্দ ও ভাষায়। দৌলত কাজী কোন কোন জায়গায় ব্রজবুলিরও সার্থক ব্যবহার করেছেন। যথা 'শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর। / তবু মোর না জুরলে এ তাপ শরীর। / মদন অধিক জিনি বিজুরীর রেহা। / থরকএ যামিনী কম্পায় মোর দেহা।' দৌলত কাজী ও আলাওল দুজনেই ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। আগেই বলেছি যে পদাবলী সাহিত্য রচনাতেও মুসলমান কবিরা অসাধারণ অনুভূতি ও নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। ন্যূনপক্ষে ১২১ জন মুসলমান পদকর্তার নাম আমরা জানি।

বাঙলার অলিখিত সাহিত্য

বাঙলার অলিখিত বা মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম হচ্ছে 'খনার বচন'। বাঙলার ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সকলেই এখনও 'খনার বচন' আবৃত্তি করে। যেমন তারা বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে বলে—'শনির সাত মঙ্গলের তিন। আর সব দিনের দিন।' আবার যাত্রা প্রসঙ্গে বলে—'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা।' আবার মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি পড়লে বলে—'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। যদি বর্ষে মাঘের শেষ।' এগুলি সবই খনার বচন। ভাষা দেখলে মনে হবে এগুলি সবই আজকের। কিন্তু আসলে তা নয়। যুগে যুগে লোকমুখে আগে-কার ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে পরবর্তী কালের চলিত ভাষায়। কেননা খনার বচনের মধ্যে এমন অনেক বচন আছে, যা প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত এবং আজকের লোকের কাছে দুর্বোধ্য। বস্তুতঃ খনা ছিলেন আমাদের দেশের এক-জন প্রাচীন বিদুষী জ্যোতিষী। খনার বচনের মাধ্যমেই আমরা তার পরিচয় পাই। যথা, একটা বচনে তিনি বলেছেন—'কিসের তিথি কিসের বার। জন্ম মৃত্যু কর সার॥ কি কর শ্বশুর মতিহীন। পলকে জীবন কর দিন। নক্ষ গজা বিশে শয়। তার অর্ধেক বাঁচে নয়। বাইশ বলদা তের ছাগল। তার অর্ধেক বরা পাগলা।' আর একটা বচনে তিনি বলেছেন—'ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুনহে পতির পিতা। ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥' এই সকল বচন থেকে আমরা জানতে পারি যে খনার শ্বশুর ছিলেন বরাহ ও স্বামী ছিলেন মিহির। ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে বরাহ গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদিত্য নামধেয় নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভা অলংকৃত করতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ছিল খ্রীষ্টীয় ৩৭৬ থেকে ৪১৫ অব্দ পর্যন্ত। তা থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে খনা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর এক বিদুষী বাঙালী মহিলা জ্যোতিষী ছিলেন। বস্তুতঃ খনাই সবচেয়ে প্রাচীন বাঙালী বিদুষী যাঁর সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আছে।

দুই

আগেই বলেছি যে মুসলমান শাসনের প্রতিঘাতে মধ্যযুগে বহু মেয়েলী দেবতার আবির্ভাব ঘটেছিল। এসব অধিকাংশ দেবতাকেই মেয়েরা 'ব্রত'-এর মাধ্যমে

আরাধনা করত। এই সকল ব্রত পালন সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না ওই ব্রত বা পূজা-সম্পর্কিত কোন ছড়া বা কাহিনী বলা হয়। ছড়া বা কাহিনীগুলো সবই অলিখিত। যদিও আজকাল ছাপাখানার দৌলতে এগুলোর কিছু কিছু ছাপা হয়েছে, তা হলেও মূলগতভাবে এগুলো অলিখিত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই অলিখিত সাহিত্য পুরুষ-পরম্পরায় চলে এসেছে। আজও চলছে। শেষ কাহিনী সন্তোষীমায়ের, যার ব্রত শুরু হয়েছে মাত্র এই সত্তরের দশকে।

যত দেবতা তত কাহিনী। সব দেবতার কাহিনী এখানে বিবৃত করা সম্ভবপর নয়। মাত্র প্রধান প্রধান কয়েকটা দেবতার 'কথা'ই এখানে বিবৃত করছি।

প্রথমেই ধরুন লক্ষ্মীর 'কথা'। একদিন নারায়ণের ইচ্ছা হল পৃথিবীর লোকেরা কিভাবে আছে, তা নিজের চোখে দেখতে যাবেন। লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁকে ধরে বললেন যে তিনিও সঙ্গে যাবেন। তাঁকে সঙ্গে নিতে নারায়ণ এক শর্তে রাজী হলেন। শর্তটা হচ্ছে এই যে, ধরাধামে অবতরণের পর লক্ষ্মীঠাকরুণ উত্তর-দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। কিন্তু পৃথিবীতে আসবার পর লক্ষ্মীঠাকরুণের কৌতূহল হল, নারায়ণ তাঁকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করলেন কেন, ওদিকে কি আছে তা তিনি দেখবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তরদিকে তাকালেন, এবং তাঁর চোখে পড়ল এক তিল-ক্ষেত। তিলের ফুল তাঁর মনকে হরণ করল, এবং তিনি রথ থেকে নেমে গিয়ে কয়েকটা ফুল তুলে আনলেন। নারায়ণ যখন ফিরে এসে লক্ষ্মীর এই কাণ্ড দেখলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীকে বললেন—'এজন্যই আমি তোমাকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করেছিলাম; তুমি কি জান না যে, ক্ষেত্র-স্বামীর বিনা অনুমতিতে তাঁর ক্ষেত্র থেকে ফুল তোলা পাপ? এখন তোমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তিন বছর ওর গৃহে থেকে দাসীবৃত্তি করে।' তারপর নারায়ণ ও লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে, ক্ষেত্রপতির গৃহে এসে বললেন—'দেখ, এই স্ত্রীলোক তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার ক্ষেত থেকে তিল ফুল তুলেছে, এজন্য ওকে তিন বছর তোমার গৃহে দাসীবৃত্তি করতে হবে, তবে ওকে কখনও উচ্ছিষ্ট খাদ্য দেবে না, ঘর ঝাঁট দিতে দেবে না এবং অপরের পরা ময়লা কাপড় কাচতে দেবে না।' এই কথা বলে নারায়ণ চলে গেলেন। ক্ষেত্রস্বামী নিজেও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে অত্যন্ত দরিদ্র। স্ত্রী ছাড়া, তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে ও এক পুত্রবধূ ছিল। তাঁদের নিজেদেরই খাওয়া জোটে না, তারপর আর একজনকে খাওয়াতে হবে এই ভেবে ব্রাহ্মণগৃহিণী খুব চিন্তিত

হলেন। তিনি লক্ষ্মীকে বললেন—'মা, আমরা খুবই গরীব, আমাদের ঘরে চাল, ডাল কিছুই নেই, তিন ছেলে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, যদি কিছু জোগাড় করে আনতে পারে, তবেই আজ আমাদের খাওয়া হবে।' লক্ষ্মী দেখলেন ব্রাহ্মণগৃহিণী শতচ্ছিন্ন এক মলিন কাপড় পরে আছেন। তাই দেখে লক্ষ্মীঠাকরুণের দয়া হল। তিনি ব্রাহ্মণীকে বললেন—'চল তো মা, গিয়ে দেখি কেমন তোমার ঘরে কিছু নেই।' যখন ব্রাহ্মণগৃহিণী লক্ষ্মীঠাকরুণকে ঘরের ভিতর নিয়ে এলেন, তখন তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে ঘর ভরতি রয়েছে চাল-ডাল, নুন, তেল, ঘি ইত্যাদি, এবং আলনায় ঝুলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়। এই দেখে বাড়ির সকলেই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং ভাবল এই স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই কোন দেবী হবে। লক্ষ্মীকে কিছু না বলে, তারা মনে মনে তাঁকে প্রণাম করল।

সেদিন থেকেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঐশ্বর্য বাড়তে লাগল, এবং তারা লক্ষ্মীর প্রতি বিশেষ যত্নবান হল।

তিন বছরের শেষে একদিন গঙ্গায় পুণ্যস্নানের দিন এল। ব্রাহ্মণ-পরিবার গঙ্গাস্নানে যাবেন। তাঁরা লক্ষ্মীকে তাঁদের সঙ্গে যেতে বললেন। লক্ষ্মী বললেন—'আমি যাব না, তবে আমি এই কড়ি পাঁচটা দিচ্ছি, তোমরা আমার নাম করে এই কড়ি পাঁচটা গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।' গঙ্গাস্নান সারবার পর ব্রাহ্মণগৃহিণীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লক্ষ্মী তাঁকে পাঁচটা কড়ি দিয়েছিলেন গঙ্গার জলে ফেলে দেবার জন্য। তিনি কড়ি পাঁচটা আঁচল থেকে খুলে যেমনি গঙ্গায় ফেলে দিলেন, দেখলেন যে, মা গঙ্গা নিজে মকরে চেপে এসে কড়ি পাঁচটা নিয়ে গেলেন। এই দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বাড়িতে ফিরে এসে দেখলেন যে, দুয়ারে একখানা রথ দাঁড়িয়ে আছে। রথের ভিতর একজন ব্রাহ্মণ বসেছেন, আর লক্ষ্মী এক পা রথে ও এক পা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই দেখে ব্রাহ্মণী লক্ষ্মীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—'মা, তোমাকে আমরা চিনতে পারিনি, আমাদের যা কিছু দোষত্রুটি হয়েছে আমাদের মাপ কর, আমাদের ছেড়ে তুমি যেও না।' লক্ষ্মী বললেন, 'মা, আমার তো আর থাকবার উপায় নেই, তোমাদের বাড়ির দাসী হিসাবে থাকবার আমার তিন বছরের মেয়াদ ছিল, আজ তিন বছর উত্তীর্ণ হয়েছে, নারায়ণ এসেছেন আমাকে গোলোকে নিয়ে যাবার জন্য।' তিনি আরও বললেন—'তোমরা মনে ব্যথা পেও না, বাড়ির পিছনে বেলগাছের তলায় গিয়ে খনন কর, তোমাদের

দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যাবে ; আর ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীর পূজা করবে ; এর ফলে তোমরা সুখী ও ঐশ্বর্যশালী হবে।' বেলগাছের তলা খুঁড়ে তারা যে ধনরত্ন পেল, তা দিয়ে তারা বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করল ও দাসদাসী পরিবৃত হয়ে ছেলেমেয়ে, জামাই ও পুত্রবধূ নিয়ে সুখে দিন কাটালো। এভাবে ধরাধামে লক্ষ্মীপূজার প্রবর্তন হল।

তিন

এবার জয়মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রবর্তনের কাহিনীটি বলি। কোন এক দেশে দুই বণিক ছিল। একজনের সাতটি মেয়ে ; আর অপরজনের সাতটি ছেলে। একবার মঙ্গলচণ্ডী ভিখারিণী ব্রাহ্মণীর বেশে প্রথম বণিকের বাড়ি ভিক্ষার জন্য আসেন। বণিক-বনিতা ভিক্ষা দিতে এলে, মঙ্গলচণ্ডী বললেন—'মা, তুমি অপুত্রক, তোমার হাতে ভিক্ষা নেব না।' ভিখারিণী ভিক্ষা না নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে বণিকপত্নী তার দুটো পা জড়িয়ে ধরে। মঙ্গলচণ্ডী তাকে একটা শুকনো ফুল দিয়ে বললেন, এই ফুল জলে গুলে প্রত্যহ তুমি খাবে, তা হলে তোমার ছেলে হবে এবং ছেলের নাম রাখবে জয়দেব। তারপর মঙ্গলচণ্ডী দ্বিতীয় বণিকের বাড়ি গেলেন এবং বণিকপত্নীর মেয়ে সন্তান নেই বলে তার হাত থেকে ভিক্ষা নিলেন না। বণিকপত্নী তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে, তাকেও মঙ্গলচণ্ডী একটা শুকনো ফুল দিলেন এবং বললেন, 'মেয়ে হলে তার নাম রাখবে জয়াবতী।' এর ফলে দুই বণিকপত্নীরই যথাক্রমে ছেলে ও মেয়ে হল।

জয়দেব একটা পায়রা নিয়ে খেলা করত, আর জয়াবতী ফুল তুলে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করত। একদিন জয়দেবের পায়রাটা উড়ে গিয়ে জয়াবতীর কোলে বসল। জয়দেব পিছনে পিছনে এসে জয়াবতীর কাছ থেকে পায়রাটা ফেরত চাইল। জয়াবতী দিতে অস্বীকার করল। জয়দেব বলল, 'আমি তোমার পূজার সমস্ত সামগ্রী ভেঙে দেব।' জয়াবতী বলল, 'আজ আমি মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করছি, আর তুমি আমার পূজার উপকরণ নষ্ট করতে চাও?' জয়দেব জিজ্ঞাসা করল—'মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করলে কি হয়?' জয়াবতী বলল—'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করলে আগুনে কিছু পোড়ে না, জলে কিছু ডোবে না, নষ্ট জিনিস উদ্ধার হয়, কেউ তাকে তরোয়াল দিয়ে কাটতে পারে না, মরে গেলে সে আবার জীবন ফিরে পায়।'

কিছুকাল পরে স্বপ্নে মঙ্গলচণ্ডীর আদেশে জয়দেবের সঙ্গে জয়াবতীর বিয়ে হল। জয়দেব যখন জয়াবতীকে বিয়ে করে নৌকা করে ফিরছিল, জয়াবতীর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেটা জয়মঙ্গলবার। জয়াবতী তাড়াতাড়ি মঙ্গলচণ্ডীর একটা শুকনো ফুল গিলে ফেলল এবং দেবীর কাছে প্রার্থনা করল তার ত্রুটি যেন তিনি মার্জনা করেন। জয়দেবের পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল, মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জয়াবতী তাকে যা বলেছিল। পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে বলল, 'এখানে বড় দস্যুর ভয়, তুমি তোমার অলঙ্কারগুলো খুলে ফেলে, একটা পোঁটলা করে আমাকে দাও।' জয়াবতী এরূপ করলে, জয়দেব পোঁটলাটা জলে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বোয়াল মাছ এসে সেটা গিলে ফেলল।

বরকনে বাড়ি এলে, অত বড় ধনীর মেয়েকে নিরাভরণা দেখে সকলেই নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। জয়াবতী চুপ করে রইল। বউভাতের দিন একটা বড় বোয়াল মাছ আনা হল। জেলে মাছটা কাটতে পারল না। পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে মাছটা কাটতে বলল। জয়াবতী রাজী হল, তবে বলল, যে সে পরদার আড়ালে বসে মাছটা কাটবে। পরদার আড়ালে গিয়ে জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করল। মঙ্গলচণ্ডী আবির্ভূতা হয়ে মাছটা কেটে ফেললেন, এবং মাছটার পেট থেকে তার অলঙ্কারের পোঁটলাটা বের করে তার হাতে দিলেন। জয়াবতী যখন অলঙ্কার পরে পরদার ভিতর থেকে বেরুল, তখন সকলে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর অত মাছ কেউ রাঁধতে পারল না। তাও জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীর সাহায্যে রাঁধল।

তারপর জয়াবতীর এক সন্তান হল। জয়দেব আবার পরীক্ষা করবার জন্য ছেলেটাকে কুমোরদের ভাটির মধ্যে রেখে এল। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী এসে জয়াবতীর কোলে তার সন্তানকে দিয়ে গেলেন। তারপর একদিন জয়দেব ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে দিল। আবার মঙ্গলচণ্ডী ছেলেটাকে এনে জয়াবতীর কোলে দিয়ে গেলেন, এবং বললেন ভবিষ্যতে যেন সে ছেলের সম্বন্ধে সাবধান হয়। একদিন জয়দেব ছেলেটাকে কেটে ফেলতে যাচ্ছে, এমন সময় জয়াবতী দেখতে পেয়ে, জয়দেবকে বলল—'তুমি এখনও মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় বিশ্বাস করছ না?' জয়দেব বলল—'হ্যাঁ, এখন আমি বিশ্বাস করি।' এইভাবে জয়মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজার প্রবর্তন হল।

চার

অরণ্যষষ্ঠীর পূজার প্রবর্তন সম্বন্ধে যে কাহিনীটা আছে, তা হচ্ছে—এক ব্রাহ্মণের তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ ছিল। ছোট বৌটা খুব পেটুক ছিল, এবং খাদ্যসামগ্রী লুকিয়ে খেয়ে বিড়ালের নামে দোষ দিত। বিড়াল হচ্ছে মা ষষ্ঠীর বাহন। মিছামিছি তার নামে দোষ দেয় বলে সে মা ষষ্ঠীর কাছে গিয়ে ছোট বৌয়ের নামে নালিশ করল।

কালক্রমে ছোটবৌ অন্তঃসত্ত্বা হল, এবং যথাসময়ে এক পুত্রসন্তান প্রসব করল। কিন্তু পরের দিন সকালবেলা কেউ আর ছেলেটাকে তার কাছে দেখতে পেল না। এইভাবে তার সাতটা সন্তান হল, কিন্তু রাত্রিকালে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কেউ আর ছেলের সন্ধান পেল না।

মনের দুঃখে ছোটবৌ বনে গিয়ে কাঁদতে লাগল। সেখানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ষষ্ঠীঠাকরুণ আবির্ভূতা হয়ে ছোটবৌকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি বনে এসে কাঁদছ কেন মা?' ছোটবৌ তাঁকে তার সব দুঃখের কথা বলল। তখন ষষ্ঠীঠাকরুণ রোষকণ্ঠে তাকে বললেন—'তুই জানিস না, চুরি করে খাস্, আর ষষ্ঠীর বাহন বিড়ালের নামে দোষ দিস্?' তখন ছোটবৌ বুঝতে পারল ওই ব্রাহ্মণী কে, এবং তাঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ষষ্ঠী দেবীর দয়া হল। তিনি বললেন—'যাপ্, ওখানে একটা মরা বিড়াল পড়ে আছে, এক ভাঁড় দই এনে ওর গায়ে ঢেলে দে, এবং চেটে তা ভাঁড়ে তোল।' ছোটবৌ ষষ্ঠীর আদেশমতো ওইরূপ করলে, ষষ্ঠীঠাকরুণ তাকে তার সাত ছেলে ফিরিয়ে দিলেন ও তাদের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিতে বললেন। তিনি আরও বললেন, 'কখনও চুরি করে কিছু খাস্ না। আর বিড়ালকে কখনও লাথি মারবি না, এবং বাঁ হাত দিয়ে কখনও ছেলেকে মারবি না, বা 'মরে যা' বলে কখনও ছেলেকে গাল দিবি না।' অরণ্যষষ্ঠীর দিন কিভাবে ষষ্ঠীপূজা করতে হয়, সে সম্বন্ধেও তিনি উপদেশ দিলেন। আরও বললেন—'অরণ্যষষ্ঠীর দিন ফলার করবি, কখনও ভাত খাবি না।' তারপর ষষ্ঠীদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছোটবৌ সাত ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল, এবং সব কথা নিজের জায়েদের বলল। সকলেই সেই থেকে অরণ্যষষ্ঠীর পূজা আরম্ভ করল।

ইতু

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার মেয়েরা ইতুপূজা করে। ইতুপূজার কথা তাদের যা বলে তা হচ্ছে—কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুই মেয়ে ছিল, নাম উমনো ও ঝুমনো। ব্রাহ্মণ একদিন ভিক্ষা করে কিছু চাল এনে ব্রাহ্মণীকে বললেন তাকে পিঠে তৈরি করে দিতে। এক-একটা পিঠে তৈরি হচ্ছে আর ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসে একগাছা দড়িতে একটা করে গেরো দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণকে যখন পিঠে দেওয়া হল, তখন তিনি দুখানা পিঠে কম দেখলেন। গৃহিণী বললেন, দুখানা পিঠে দুই মেয়েকে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে, দুই মেয়েকে পরদিন মাসির বাড়ি নিয়ে যাবার ছল করে তাদের বনবাস দিয়ে এলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে তারা কতকগুলি মেয়েকে ইতুপূজা করতে দেখল। তাদের কাছ থেকে তারা জানল যে ইতুপূজা করলে বাপ-মায়ের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। এই কথা শুনে তারা বাড়ি গিয়ে ইতুপূজা করতে লাগল। ব্রাহ্মণ তাদের দেখে প্রথমে খুব চটে গেল, কিন্তু যখন ইতুপূজার মাহাত্ম্যের কথা শুনল, তখন কিছু নরম হল।

এর কিছুদিন পরে ওই দেশের রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে তাদের বাড়ি এসে জল চাইল। উমনো-ঝুমনো জল এনে দিল। তাদের দেখে রাজা ও মন্ত্রী তাদের বিয়ে করতে চাইলেন।

বিয়ের পর স্বামিগৃহে যাবার দিন উমনো ভাত-তরকারি খেল। সেদিন ইতুপূজা, সেজন্য ঝুমনো শুধু ইতুর প্রসাদ খেল। উমনো রাজপ্রাসাদে আসা মাত্র নানারকম অঘটন ঘটতে লাগল। রাজা তাকে বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ঝুমনো উমনোকে বলল—'বোন, তুই ইতুপূজার দিন ভাত খেয়েছিলি, সেজন্য ইতুর কোপে পড়েছিস, তুই ইতুপূজা করে ইতুকে প্রসন্ন কর।' উমনো তাই করল। রাজার আবার সমৃদ্ধি ফিরে এল। রাজা উমনোকে নিয়ে গেলেন। উমনো রাজাকে সব কথা বলল। সেই থেকে ইতুপূজার প্রচলন হল।

হর

একদিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কিসে সবচেয়ে বেশি তুষ্ট হও।' শিব বললেন, 'শিবরাত্রির দিন যদি কেউ উপবাস করে আমার মাথায় জল দেয় তো আমি খুব তুষ্ট হই।' তখন মহাদেব পার্বতীকে একটা কাহিনী বললেন : বারাণসীতে এক ব্যাধ ছিল। একদিন সে অনেক পশু শিকার করে

এবং তার ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়। বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে সে এক গাছের উপর আশ্রয় নেয়। ওই গাছের তলাতেই এক শিবলিঙ্গ ছিল। রাত্রিতে ব্যাধ যখন ঘুমোচ্ছিল তখন তার এক ফোঁটা ঘাম (মতান্তরে নীহারকণা) মহাদেবের মাথায় পড়ে। সেদিন শিবরাত্রির দিন ছিল এবং ব্যাধও সারাদিন উপবাসী ছিল। মহাদেব তার ওই এক ফোঁটা ঘামেই তুষ্ট হন।···যথাসময়ে যখন ব্যাধের মৃত্যু হয়, যমদূত এসে তাকে নরকে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু শিবদূত বাধা দিয়ে তাকে শিবলোকে নিয়ে গেল। এইভাবে শিবরাত্রি ব্রতের প্রচলন হল।

সাত

শীতলা পূজা প্রচলিত হয়েছিল এইভাবে : রাজা নহুষ একবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়ে শীতল হলে, তা থেকে এক পরমা সুন্দরী রমণী আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা তার নাম দেন শীতলা, এবং বলেন যে, 'তুমি পৃথিবীতে গিয়ে বসন্তের কলাই ছড়াও, এরূপ করলে লোকে তোমার পূজা করবে।' শীতলা বললেন, 'আমি একা পৃথিবীতে গেলে, লোকে আমার পূজা করবে না, আপনি আমার একজন সঙ্গী দিন। ব্রহ্মা তাঁকে কৈলাসে শিবের কাছে যেতে বললেন। শীতলা কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেন। মহাদেব চিন্তিত হয়ে ঘামতে লাগলেন। তাঁর ঘাম থেকে জ্বরাসুর নামে এক ভীষণকায় অসুর সৃষ্টি হল। জ্বরাসুর শীতলার সঙ্গী হলেন। শীতলা বললেন, 'দেবতারা যদি আমার পূজা না করেন, তা হলে পৃথিবীর লোক করবে কেন?' তখন শিব তাঁকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ইন্দ্রপুরীতে যেতে বললেন। ইন্দ্রপুরীর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় জ্বরাসুরের মাথা থেকে বসন্তের কলাইয়ের ধামাটা রাস্তায় পড়ে গেল। সে-সময় ইন্দ্রের ছেলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শীতলা তাকে ধামাটা জ্বরাসুরের মাথায় তুলে দিতে বললেন। ইন্দ্রের ছেলে এটা তার পক্ষে মর্যাদা-হানিকর মনে করে, ব্রাহ্মণীকে ঠেলে ফেলে দিল। শীতলার আদেশে জ্বরাসুর ইন্দ্রের ছেলেকে আক্রমণ করল। এর ফলে ইন্দ্রের ছেলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হল। তারপর শীতলা দেবসভায় গিয়ে ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করলেন। ইন্দ্র তো চটে লাল। ভাবলেন সমস্ত জগতের লোক তাঁকে পূজা করে, আর এ কোথাকার এক বুড়ি এসে তাঁকে আশীর্বাদ করছে। এর আস্পর্ধা তো কম নয়! ইন্দ্র তাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর ইন্দ্র নিজেও বসন্তরোগে আক্রান্ত হলেন।

অন্যান্য দেবতারাও হলেন। মহামায়ার দয়া হল। তিনি গিয়ে শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিব বললেন, 'দেবতারা সকলে শীতলার পূজা করুক, তা হলে রোগ-মুক্ত হবে।' তখন দেবতারা ঘটা করে শীতলার পূজা করলেন। এইভাবে শীতলা দেবলোকে স্বীকৃতি পেলেন।

তারপর শীতলা জ্বরাসুরকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন। প্রথমে তিনি বিরাট-রাজার রাজ্যে এলেন। স্বপ্নে তিনি বিরাটকে শীতলার পূজা করতে বললেন। বিরাট বলল, 'আমার বংশে কেউ কখনও নারীদেবতার পূজা করেনি, আমি নারীদেবতার পূজা করব না।' বিরাটরাজ্যে মহামারীরূপে বসন্ত দেখা দিল। প্রজারা সব মরতে লাগল। বিরাটের তিন ছেলে মারা গেল। তবুও বিরাট অনড়, অটল। নারীদেবতার সে পূজা করবে না। বিরাটের এক পুত্রবধূ তখন পিত্রালয়ে ছিল। শীতলা সেখানে গিয়ে তাকে বললেন, 'তুমি যদি শীতলার পূজা কর, তা হলে তোমার স্বামী ও তার ভাইয়েরা বেঁচে উঠবে।' পুত্রবধূ দ্রুত বিরাটরাজ্যে ফিরে এসে শীতলার পূজা করলেন। তার স্বামী ও তার ভাইয়েরা সব বেঁচে উঠল। শীতলা যে বসন্তের দেবতা তা বিরাটরাজার প্রত্যয় হল। সেই থেকে পৃথিবীতে শীতলা পূজার প্রচলন হল।

আট

অঞ্চলভেদে এসব কাহিনীর পার্থক্য আছে। তা ছাড়া, পরবর্তীকালে রচিত নূতন কাহিনী আদিম কাহিনীকে চাপা দিয়েছে। যেমন, ওপরে লক্ষ্মীর যে কাহিনী দেওয়া হয়েছে, সেটাই হচ্ছে আদি কাহিনী। এখন প্রতি বৃহস্পতিবার মেয়েরা লক্ষ্মীর পূজা করে, ছাপা বই দেখে পাঁচালী পাঠ করে, তার কাহিনী অন্যরূপ। আবার অরণ্যষষ্ঠীর যে কাহিনী দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আর একটা কাহিনী আছে। সে কাহিনীতে ছোট বউয়ের কথা নেই। তার পরিবর্তে আছে অভিশপ্ত এক বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কাহিনী। এ সকল অলিখিত সাহিত্যের উপাখ্যানসমূহের রূপভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি গন্ধেশ্বরী পূজার কাহিনী-সমূহে। গন্ধেশ্বরী হচ্ছে গন্ধবণিক জাতির দেবতা। গন্ধেশ্বরী তাদের শত্রু গন্ধাসুরকে বধ করেছিল বলেই গন্ধবণিক সমাজ তার পূজা করে। কিন্তু গন্ধেশ্বরী পূজার উদ্ভব সম্বন্ধে অন্য কাহিনীও প্রচলিত আছে।

অলিখিত এইসব উপাখ্যানের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উপাখ্যানের মধ্যে

অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ। হিন্দু এসব কাহিনীর অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করত। সেই কারণেই হিন্দুর নৈতিক মান খুব উচ্চস্তরে ছিল। আজ হিন্দু সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে পাপপুণ্যের বিশ্বাসও লোপ পেয়েছে। সেজন্যই হিন্দুর নৈতিক মান আজ নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা

আর্থিক ঋদ্ধির জন্য বাঙলাকে 'সোনার বাঙলা' বলা হত। মধ্যযুগের বৈদেশিক পর্যটকরা বাঙলাদেশকে স্বর্গ বলে অভিহিত করে গেছেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য থেকেও আমরা বাঙলার বিপুল ঐশ্বর্যের কথা জানতে পারি। বাঙলার আর্থিক সম্পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল তার কৃষি ও শিল্পের ওপর। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি উৎপন্ন করত প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য। এই সকল কৃষিজাত পণ্য বাঙলার নিজস্ব চাহিদা মিটিয়েও বিক্রীত হত দেশদেশান্তরের হাটে। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল চাউল। অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ছিল তুলা, ইক্ষু, তৈল-বীজ, সুপারি, আদা, লঙ্কা ও নানাবিধ ফল। পরে পাট ও নীলের চাষও প্রভূত পরিমাণে হত। উৎপন্ন পণ্যের পাঁচ শতাংশ রাজস্ব হিসাবে রাজকোষে জমা দিতে হত। শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকত। কৃষিকে হীনকর্ম বলে কেউ মনে করত না। এমনকি ব্রাহ্মণরাও কৃষিকর্ম করতে লজ্জাবোধ করত না। চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখে গিয়েছেন যে, তাঁর সাত-পুরুষ কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল কার্পাস ও রেশমজাত বস্ত্র। সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য বাঙলার প্রসিদ্ধি ছিল যুগ যুগ ধরে। দেশ-বিদেশে বাঙলার 'মসলিনে'র চাহিদা ছিল। এই জাতীয় বস্ত্র এত সূক্ষ্ম হত যে একটি ছোট নস্যাধারের মধ্যে বিশ গজ কাপড় ভরতি করা যেত। বাঙলার শর্করার প্রসিদ্ধিও সর্বত্র ছিল। এ ছাড়া বাঙলায় প্রস্তুত হত শঙ্খজাত নানারূপ পদার্থ, লৌহ, কাগজ, লাক্ষা, বারুদ ও বরফ। বীরভূমের নানা স্থানে ছিল লৌহপিণ্ডের আকর। তা থেকে লৌহ ও ইস্পাত তৈরি হত। বীরভূমের যে সকল স্থানে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ছিল, সেগুলি হচ্ছে দামরা, ময়সারা, দেওচা ও মহম্মদনগর। এই সকল লোহা দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত কলকাতা ও কাশিম-বাজারে কামান তৈরি হত। বলা বাহুল্য, এই লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য বীরভূমের কারিকরগণ নিজস্ব প্রণালী অবলম্বন করত। বরফ তৈরির জন্যও বাঙলার নিজস্ব প্রণালী ছিল। শীতকালে মাটিতে গর্ত করে, তার মধ্যে গরম জল ভরতি করে সমস্ত রাত্রি রাখা হত। প্রভাতে তা বরফে পরিণত হত।

এ ছাড়া চিনি তৈরির জন্যও বাঙলার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে চিনি তৈরি হত তা ধবধবে সাদা হত। এই চিনি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হত। (এই পদ্ধতি সম্বন্ধে যারা সম্যক অবগত হতে চান, তাঁরা বর্তমান লেখকের ‘ফোক্ এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি লাইফ’ পুস্তক দেখুন)।

বাঙলার লোকদের বিশেষরূপে পারদর্শিতা ছিল নৌকা নির্মাণে। বাঙলার নানাস্থানে নৌকা-নির্মাণের কেন্দ্র ছিল, বিশেষ করে ঢাকায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে বলেছেন যে কখনও কখনও নৌকাগুলি ৩০০ গজ লম্বা ও ২০০ গজ চওড়া হত। বিজয় বংশীদাস তাঁর মনসামঙ্গলে ১০০০ গজ লম্বা নৌকার কথাও বলেছেন, তবে সেটা অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়। বাঙলার নিজস্ব তৈরি এরূপ বৃহদাকার নৌকা করেই মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যদ্বয়ের নায়করা, যথা— চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর দূরদূরান্তরে বাণিজ্য করতে যেতেন। মনে রাখতে হবে যে, সে যুগের নাবিকদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ছিল না। বংশীদাসের মনসামঙ্গল-কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে যুগের নাবিকরা মাত্র সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থান লক্ষ্য করেই সাতসমুদ্র তের নদী পাড়ি দিত। তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাদের যে অনেক ঝুঁকি নিতে হত, সেটা বলা বাহুল্য মাত্র। তারা প্রায়ই দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হত। বিশেষ করে আরবদস্যু দ্বারা আক্রমণের ফলেই তারা পশ্চিমের দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য বর্জন করে সিংহল, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এই পটভূমিকাও ষোড়শ শতাব্দী থেকে পরিবর্তিত হয় পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণের ফলে। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে বাঙালী বণিকরা আর বাণিজ্য করতে বিদেশ যেতেন না। মোট কথা, বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে তাঁরা ক্রমশ হটে গিয়েছিলেন। হটে যাবার প্রধান কারণ ছিল মগ ও পর্তুগীজ দস্যু দ্বারা বন্দুক ও কামানের ব্যবহার। বাঙালী বণিকদের তা ছিল না। সুতরাং বাঙালীরা আর এই সকল বৈদেশিক দস্যুদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। তাঁরা বিদেশ-যাত্রার ঝুঁকি পরিহার করে বাণিজ্যক্ষেত্রে মধ্যগের কাজ করা শুরু করে দিলেন। নবাগত বিদেশী বণিকদেরই তাঁরা মাল বেচতেন। এর ফলে দেশের মধ্যে গড়ে উঠল কতকগুলি নতুন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্র। সেসব কথা বিশদভাবে আমরা পরে বলব।

[illegible]

বস্তুত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য—এই তিনটির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল বাঙালীর সমৃদ্ধি। বিশেষ করে লক্ষণীয় ছিল বণিকসমাজের ধনাঢ্যতা। তাদের ধনাঢ্যতার পরিচয় আমরা পাই মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যসমূহে। তাদের স্থান ছিল সমাজের শীর্ষদেশে। তাদের আবাস-কেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে। পরে আমরা দেখব যে এই বণিকসমাজই উত্তরকালে কলকাতা নগরীর পত্তন করেছিল। সপ্তগ্রাম ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে আরও অনেক বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তাদের অন্যতম হচ্ছে গৌড়, সোনারগাঁ, হুগলী ও চট্টগ্রাম। এ সকল বাণিজ্যিক কেন্দ্রের নাম আমরা সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটকদের লেখনী মারফত জানতে পারি। ষোড়শ শতাব্দীর পর্যটক বারথেমা, 'বেঙ্গল' নামে এক নগরী ও বন্দরের উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন পর্যটক যোয়াও ড ব্যারোস গৌড়কে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখে গিয়েছেন যে গৌড় নগর নয় মাইল লম্বা ও বিশ লক্ষ লোক দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, গৌড়ের পণ্যসমৃদ্ধির জন্য সেখানে এত লোকের সমাগম হত যে ভিড় ঠেলে নগরের রাস্তা দিয়ে হাঁটা দুষ্কর ছিল। এ ছাড়া তিনি সোনারগাঁ, হুগলী, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম, প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রেরও উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পর্যটক সীজার ফ্রেডরিক সপ্তগ্রামকেই সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধিশালী বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন। এর বিশ বছর পরে র‍্যালফ্ ফীচ সপ্তগ্রাম এবং চট্টগ্রাম উভয়কেই বাঙলাদেশের বড় বন্দর (Porte Grande) বলে অভিহিত করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পর্যটক হ্যামিলটন হুগলী ও চট্টগ্রামকেই প্রধান বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সপ্তগ্রামের কোনও উল্লেখ করেননি। অধিকন্তু তিনি ঢাকার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ঢাকা সূতা ও সূতিবস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

এককালে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙলার যে অসাধারণ প্রতাপ ছিল, তা হারাবার পর বাঙলা অভ্যন্তরীণ হাটে পরিণত হয়েছিল। কেবল নবাগত বিদেশীরাই যে বাঙলার হাটে মাল কিনত, তা নয়। ভারতের নানাস্থান থেকে ব্যবসায়ীরা বাঙলার হাটে মাল কিনতে আসত। যারা বাঙলার হাটে কেনাবেচা করতে আসত, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাশ্মীরী, মুলতানী, আফগান, পাঠান, শেখ, পসেরা (যাদের নাম থেকে বড়বাজারের পগেয়াপটির

নাম হয়েছে), ভুটিয়া ও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা যে কারা, তা আমরা সঠিক জানি না। মনে হয় তারা হিমালয়ের সানুদেশ থেকে চন্দনকাঠ, মালার গুটি (beads) ও ভেষজ-গাছগাছড়া বাঙলায় বেচতে আসত। তার বিনিময়ে তারা বাঙলা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যেত। হলওয়েলের এক বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, দিল্লী ও আগরা থেকে পগেয়ারা বর্ধমানে এসে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্র, সীসা, তামা, টিন ও লঙ্কা কিনে নিয়ে যেত। আর তার পরিবর্তে তারা বাঙলাদেশে বেচে যেত আফিম, ঘোড়া ও সোরা। অনুরূপভাবে কাশ্মীরের লোকরা বাঙলা থেকে কিনে নিয়ে যেত লবণ, চামড়া, নীল, তামাক, চিনি, মালদার সাটিন কাপড় ও বহুমূল্য রত্নসমূহ। এগুলি তারা বেচত নেপাল ও তিব্বতের লোকদের কাছে।

বাঙলার বাহিরের ব্যবসায়ীরা যেমন বাঙলায় আসত, বাঙলার ব্যবসায়ীরাও তেমনই বাঙলার বাহিরে যেত। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে জয়নারায়ণ কর্তৃক রচিত 'হরিলীলা' নামক এক বাংলা বই থেকে আমরা জানতে পারি যে বাঙলার একজন বণিক ব্যবসা উপলক্ষে হস্তিনাপুর, কর্ণাট, কলিঙ্গ, গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, ভোজ, পঞ্চাল, কম্বোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, কাম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন ও কামরূপ প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন।

যারা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত, তারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে বড়লোক হত। বস্তুত তাদের ধনদৌলত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। তার পরিচয় আমরা পাই বাংলা সাহিত্যে ও বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণীতে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে একদল চৈনিক দূত বাঙলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের বিবরণী থেকে আমরা তৎকালীন বাঙলাদেশের ধনাঢ্যতার এক বিশেষ পরিচয় পাই। খুব জাঁকজমক করে তাঁদের এক বিশেষ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার্যের ভোজে আপ্যায়িত করা হয়েছিল। ভোজান্তে তাঁদের প্রত্যেককে উপহার দেওয়া হয়েছিল এক একটি স্বর্ণনির্মিত বাটি, পিকদানী, সুরাপাত্র ও কটিবন্ধ। তাঁদের সহচরদের দেওয়া হয়েছিল রৌপ্যনির্মিত উক্ত সামগ্রীসমূহ এবং ওঁদের সঙ্গে যে সকল সৈন্যসামন্ত এসেছিল, তাদের দেওয়া হয়েছিল বহু রৌপ্যমুদ্রা। তাঁরা লিখে গেছেন যে বাঙলা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ। আর্থিক সম্পদের এই ত্রিমূল উৎস থেকে বাঙলা প্রচুর অর্থ অর্জন করত। লোকদের

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার দেখে তাঁরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। গৌড় ও পূর্ব বাংলার ধনীলোকদের ঐশ্বর্যের কথা 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা' ও 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'-এও উল্লেখিত হয়েছে। এই দুই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে গৌড় ও পূর্ব-বাংলার ধনী লোকরা সোনার থালা বাটিতে আহার করত। ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড় যখন লুণ্ঠিত হয়েছিল, তখন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ লুণ্ঠনকারীদের কাছ থেকে ১৩০০ সোনার থালা ও প্রচুর অর্থ ও অলংকার উদ্ধার করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিরিস্তাও মন্তব্য করেছেন যে কোনও বড়লোকের ঘরে কত সংখ্যক সোনার থালা-বাসন আছে সেটাই ছিল তার ধনাঢ্যতার মাপকাঠি। সমাজে তার মর্যাদা নির্ণয় করত তার ওপর।

তিন

মধ্যযুগে বাঙলাদেশের লোকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী যে সচ্ছল ছিল, তা সে যুগের জিনিষপত্রের দাম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে। চতুর্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকা-দেশ থেকে ইবন বতুতা নামে একজন পর্যটক বাঙলাদেশে এসেছিলেন। তিনি তখনকার পণ্যমূল্যের যে তালিকা দিয়ে গিয়েছেন তা হচ্ছে (বর্তমানের নয়াপয়সার দাম)—চাউল এক মণ ১২ পয়সা, ঘি এক মণ ১৪৫ পয়সা, চিনি এক মণ ১৪৫ পয়সা, তিল তৈল এক মণ ৭৩ পয়সা, সূক্ষ্ম কাপড় ১৫ গজ ২০০ পয়সা, দুগ্ধবতী গাভী একটি ৩০০ পয়সা, হৃষ্টপুষ্ট মুরগী ১২টি ২০ পয়সা, ও ভেড়া একটি ২৫ পয়সা।

ইবন বতুতা একজন বাঙালী মুসলমানের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে, তার সংসারের (নিজের, স্ত্রীর ও একজন ভৃত্যের) বাৎসরিক খাই-খরচ ছিল মাত্র সাত টাকা।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও জিনিসপত্রের অনুরূপ সুলভতার কথা উল্লেখিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্নিয়ারও বলেছেন যে বাঙলাদেশের চাউল, ঘি, তরিতরকারি ইত্যাদির দাম নামমাত্র। ১৭২৯ খ্রীস্টাব্দের এক মূল্যতালিকায় আমরা মুর্শিদাবাদে প্রচলিত যে দাম পাই, তা থেকে জানতে পারি যে প্রতি টাকায় মুর্শিদাবাদে পাওয়া যেত সরু চাউল ১ মণ ১০ সের থেকে ১ মণ ৩৫ সের পর্যন্ত, দেশী চাউল ৫ মণ পঁচিশ সের থেকে ৭ মণ ২০ সের, গম ৩ মণ থেকে ৩ মণ ৩০ সের, তেল ২১ সের থেকে ২৪ সের, ঘি ১০ সের ৮

ছটাক থেকে ১১ সের ৩ ছটাক ও তুলা ২ মণ থেকে ২ মণ ৩০ সের। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে সাহেবদের খাদ্যসামগ্রীর দাম ছিল একটা গোটা ভেড়া দু'টাকা, একটা বাচ্চা ভেড়া এক টাকা, ছয়টা ভাল মুরগী বা হাঁস এক টাকা, এক পাউণ্ড মাখন আট আনা, ১২ পাউণ্ড রুটি এক টাকা, ১২ বোতল ক্লারেট মদ ৬০ টাকা ইত্যাদি।

চার

কিন্তু এই প্রতুলতার মধ্যেও ছিল নিম্নকোটির লোকদের দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণ ছিল সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার ও জুলুম। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর রচয়িতা মুকুন্দরাম বলেছেন যে যদিও ছয় সাত পুরুষ ধরে তাঁরা দামুন্যা গ্রামে বাস করে এসেছিলেন, তথাপি ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে তাঁরা ভিটাচ্যুত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনুরূপ দুর্দশার বর্ণনা ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসও দিয়ে গিয়েছেন। একজন সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটক (মানরিক) লিখে গিয়েছেন যে, রাজস্ব দিতে না পারলে, যে কোনও হিন্দুর স্ত্রী ও ছেলেপুলেদের নীলাম করে বেচা হত। এ ছাড়া, সরকারী কর্মচারীরা যখন-তখন কৃষক রমণীদের ধর্ষণ করত। এর কোনও প্রতিকার ছিল না। তার ওপর ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় সৈন্যগণের অত্যাচার ও বাঙলার দক্ষিণ অংশের উপকূলভাগে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের উপদ্রব। তারা যে মাত্র লুটপাট করত ও গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিত তা নয়, মেয়েদের ধর্ষণ করত ও অসংখ্য নরনারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশের দাসদাসীর হাটে বেচে দিত। এ ছাড়া, দুঃসময়ে ও দুর্ভিক্ষের সময় তারা তাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা হাটে বেচে দিত।

পাঁচ

দাসদাসী-কেনাবেচা মধ্যযুগে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সোনার থালা-বাসনের মতো দাসদাসীর সংখ্যাও ছিল সামাজিক মর্যাদার একটা মাপকাঠি। এসব দাসদাসীর ওপর গৃহপতিরই মালিকানা স্বত্ব থাকত। গৃহপতির অধীনে থেকে তারা গৃহপতির ভূমিকর্ষণ ও গৃহস্থালির কাজকর্ম করত। কখনও কখনও মালিকরা তাদের দাসীগণকে উপপত্নী হিসাবেও ব্যবহার করত। নবাব, সুলতান ও বাদশাহদের হারেমে এরকম হাজার হাজার দাসী থাকত। সাধারণত এ সকল

দাসীদের হাট থেকে কেনা হত। অনেক সময় দামদস্তুর করে মুখের কথাতেই তাদের কেনা হত, তবে ক্ষেত্রবিশেষে দলিলপত্রও তৈরি করে নেওয়া হত। এরূপ দলিলপত্রকে গৌড়ীয়-শাতিকা-পত্র, বহীখাতা, অক্রয়ার পত্র ইত্যাদি বলা হত।

দাসদাসী রাখা বেদের আমল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। তবে মধ্য-যুগে এই প্রথা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। হিন্দুসমাজে দাসদাসী কেনা ও রাখা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, তা নয়। চাষাভূষার ঘরেও দাসদাসী থাকত। সাধারণত লোক দাসীদের সঙ্গে মেয়ের মতো আচরণ করত। অনেকে আবার নিজের ছেলের সঙ্গেও কোন দাসীর বিয়ে দিয়ে তাকে পুত্রবধূ করে নিত। তখন সে দাসত্ব থেকে মুক্ত হত। অনেকে আবার যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য দাসীদের ব্যবহার করত। এরূপ দাসীদের গর্ভজাত সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্মৃতিতেও নির্দেশ আছে।

সমসাময়িক দলিলপত্র থেকে আমরা দাসদাসীর মূল্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। বিদ্যাপতির সময় ৪৪ বৎসর বয়স্ক এক কৈবর্ত পুরুষ দাসের দাম ছিল ৬ টাকা, গৌরবর্ণ ৩০ বৎসর বয়স্কা দাসীর দাম ছিল ৪ টাকা, ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকের দাম ছিল ৩ টাকা এবং ৫ বৎসর বয়স্কা শ্যামাঙ্গী মেয়ের দাম ছিল মাত্র এক টাকা। পরবর্তী কালে দামের কিছু হেরফের দেখা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর আফ্রিকাদেশের পর্যটক ইবন বটুটা বলেছেন যে, তিনি মাত্র ১৫ টাকায় এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীকে কিনেছিলেন ও তাকে বাঙলাদেশ থেকে নিজ দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। দাসদাসীর ব্যবসাটা বিশেষভাবে চলত দুর্ভিক্ষের সময়।

ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে পর্তুগীজ দস্যুরা দক্ষিণ বাঙলা থেকে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের বিদেশের হাটে বিক্রী করত। আবার মেয়ে চুরি করে এদেশের লোকরাও অপর অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে তাদের বিয়ের পাত্রী হিসাবে বিক্রী করত। এরূপ মেয়েদের 'ভরার মেয়ে' বলা হত। অনেক সময় অজানা মুসলমানী 'ভরার মেয়ে'র সঙ্গে হিন্দুর ছেলের বিয়েও দেওয়া হত।

ইংরেজরা যখন এদেশে আসে, তখন তারাও দাসদাসী কিনত ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের বেচত।

চৈতন্য ও তাঁর ধর্ম

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসের এক অতি সঙ্কটময় কালে। তিনশো বছর মুসলমান আধিকার ও শাসনের অত্যাচারে হিন্দুরা তখন প্রপীড়িত। বলপূর্বক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। হিন্দুর দেবদেউল ভাঙা হচ্ছে। হিন্দু তার ধর্মকৃত্য করলে তাকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে বা শূলে চাপানো হচ্ছে। হিন্দুরমণীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। তাদের অপহরণ করা হচ্ছে। এটাই ছিল ধর্মান্তরিতকরণের এক সোজা রাস্তা। কেননা, ধর্ষিতা বা অপহৃতা রমণীর হিন্দুসমাজে কোন স্থান ছিল না। ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান সমাজে সে বিবির আসন পেত। হিন্দুসমাজকে এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দন (১৬শ শতাব্দী)। তিনি বিধান দেন যে ধর্মান্তরিত, ধর্ষিতা, অপহৃতা বা পদস্খলিতা নারীকে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনরায় হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করা চলবে। কিন্তু দেশ যখন মুসলমানদের অধিকারে, তখন কোন্ হিন্দু সাহস করবে ধর্মান্তরিতা নারীকে পুনরায় হিন্দুসমাজে স্থান দিয়ে রাজরোষ অর্জন করতে ? সুতরাং মুসলমানের অত্যাচার পূর্ণমাত্রাতেই চলছিল। এটা তুঙ্গে উঠেছিল সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) আমলে। এই হুসেন শাহের আমলেই নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে এক ফাল্গুনী গ্রহণ-পূর্ণিমার দিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫৩৩), হিন্দুর মনে সাহস সঞ্চার করে মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ছিল হিন্দুসমাজের এক বৈপ্লবিক ঘটনা। সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুসমাজকে অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুসমাজের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক অবজ্ঞেয়, উপেক্ষিত ও অবহেলিত নিম্নসম্প্রদায়, যা মুসলমানদের সাহায্য করেছিল তাদের সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মে এই নিম্ন-সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণে। তাছাড়া, চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন যে এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের কোন বিভেদ নেই। চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের ফলে ধর্মান্তরিতকরণের স্রোত বিপরীতগামী হয়ে মুসলমানকেও চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

দুই

চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল শ্রীহট্টে। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রই প্রথম নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে এসে বাস শুরু করেন। তখন অধ্যাপনা ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রের চর্চায় অদ্বিতীয় ছিলেন শান্তিপুরের মহাপণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য। তিনিই জগন্নাথকে আশ্রয় দেন ও তাঁর অভিভাবক হন। জগন্নাথ বিবাহ করেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর মেয়ে শচীদেবীকে। তাঁদের প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। চৈতন্য হচ্ছেন দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর জন্মের পর তাঁর রূপ-লাবণ্য দেখে তাঁকে ডাইনীদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্য অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী নবজাতকের নাম রাখেন নিমাই অর্থাৎ নিমের মতো তিক্ত। আবার মতান্তরে তিনি নিমগাছের তলায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম ছিল নিমাই। পিতা নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর অত্যন্ত গৌরবর্ণ ছিলেন বলে লোকে তাঁকে গৌর, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি প্রভৃতি নামে অভিহিত করত।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে বিশ্বম্ভর হয়ে উঠেছিলেন একজন মহাপণ্ডিত। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য, অলংকার প্রভৃতি অধ্যয়ন করে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তিনি এক চতুষ্পাঠী খুলে 'কলাপ ব্যাকরণ' পড়াতে শুরু করেন। সেকালের পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যা বিতরণ করা একটা প্রথা ছিল। সেজন্য বিদ্যা বিতরণ করবার জন্য বিশ্বম্ভর পূর্ববঙ্গে ও শ্রীহট্টে যান।

তিন

ঈশ্বর সাধনায় তাঁর একনিষ্ঠতা প্রকাশ পায় তাঁর পিতার মৃত্যুর পর। পিতা গত হবার পূর্বেই বিশ্বম্ভরের বিবাহ দিয়েছিলেন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃকৃত্য করবার জন্য গয়ায় যান। সেখানে তিনি পরম ভাগবত একান্ত ঈশ্বরপ্রেমী মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই দীক্ষা গ্রহণের পরই তাঁর ভাবান্তর ঘটে। নবদ্বীপে ফিরে এসে তিনি শোনেন যে সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু ঘটেছে। মা শচীদেবী রাজপণ্ডিত সনাতনের সুন্দরী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ছেলের আবার বিবাহ দেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের মন তখন ঈশ্বর প্রেমের

উন্মাদনায় পরিপূর্ণ। নবদ্বীপে তিনি এক ঈশ্বরপ্রেমী বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন অদ্বৈত আচার্য, ইসলাম ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁর তিন ভাই, সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, সদাশিব পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রমুখ। বিশ্বম্ভর অধ্যাপনা ছাড়লেন। নবদ্বীপের পথে ঘাটে শিষ্যদের নিয়ে তিনি হরি সংকীর্তন করতে লাগলেন। সংকীর্তনের পদ—'হরি হরয়ে নমঃ / গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।'

এই সময় অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে মিলিত হন। অদ্বৈতও সপরিবারে নবদ্বীপে চলে আসেন। এক অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব পরিষৎ গঠিত হয়। ভক্তরা বিশ্বম্ভরকে দেবত্বে অভিষিক্ত করে পূজা করতে থাকে।

নবদ্বীপের আকাশ বাতাস এই নূতন বৈষ্ণব গোষ্ঠীর নাম-সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে। একদিন দুরাচার মত্তপ নগর-কোতোয়াল জগাই-মাধাই দুই ভাইয়ের হাতে তাঁরা লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হন। লাঞ্ছনা ও প্রহার সত্ত্বেও তারা হরিনাম ছাড়ল না দেখে বিস্মিত হল জগাই-মাধাই। তাদের চরিত্র সম্পূর্ণ পালটে গেল। বিশ্বম্ভরের প্রতিষ্ঠা আরও বেড়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা নগরে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে হরিনাম করতে লাগল। মুসলমানরা সন্ত্রস্ত হয়ে কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করল। কাজী নগরে সংকীর্তন নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কেউই মানল না। কাজী ভয় পেয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেন। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ এক বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ আছে। চৈতন্য রোষান্বিত হয়ে যখন কাজীর বাড়ি চড়াও হলেন, তখন কাজী চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দোহাই দিয়ে চৈতন্যের রোষ প্রশমিত করবার চেষ্টা করে। ('বাঙলার মুসলমান সমাজ' অধ্যায় দেখুন।)

চার

এবার এল সন্ন্যাস গ্রহণের পালা। মিষ্ট কথা ও ছলনার দ্বারা মাকে ভুলিয়ে, কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর। গুরু কেশব ভারতী তাঁর নূতন নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। চৈতন্য বৃন্দাবনে গিয়ে থাকবার সংকল্প করলেন। কিন্তু মা শচীদেবী ও ভক্তদের ইচ্ছা তিনি নিকটে থাকেন শ্রীক্ষেত্রে। শ্রীক্ষেত্রের পথে তিনি যাত্রা করলেন। শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে জগন্নাথ দেবের মূর্তি দেখে তিনি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

সেটা ফাল্গুন মাস ১৫১০ সালে তিনি দক্ষিণ দেশে তীর্থ করতে বেরুলেন। পথে অনেককেই তিনি বৈষ্ণব করলেন। কৃষ্ণনাম প্রবর্তন করলেন। বাসুদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে তিনি কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে মুক্ত করলেন। সর্বত্রই তাঁর আগমন বার্তায় হৈ হৈ পড়ে গেল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ লিখেছেন—'পূর্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ। সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন। প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে। দিক বিদিক জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে। পূর্ববৎ বৈষ্ণব করি সব লোক সনে। গোদাবরী তীরে চলি আইলা কতদিনে।'

তারপর গোদাবরী পার হয়ে রাজমহেন্দ্রীতে উপস্থিত হলেন। ওড়িশার রাজার প্রাদেশিক প্রতিনিধি পরমবৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। গোদাবরীতে স্নানার্থে এসেছিলেন রামানন্দ রায়। তিনিই যে রামানন্দ রায়, মহাপ্রভু তা জেনেও 'তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ। তিঁহো কহে সেই হঙ দাসশূদ্র মন্দ॥ তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥ স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা। দোঁহে আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥' (চৈতন্যচরিতামৃত)। রামানন্দ বললেন—'কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥ মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়। মোরে দরশন তোমা বেদে নিষেধয়॥' (চৈতন্যচরিতামৃত)।

এই দেখে রামানন্দের সঙ্গে যে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ এসেছিলেন, তাদের সকলেরই মন দ্রবীভূত হয়ে গেল এবং তারা পুলকিত হয়ে কৃষ্ণ হরিনাম করতে লাগল। দশদিন রামানন্দের সহিত কৃষ্ণনাম আলাপে যাপন করে মহাপ্রভু পুনরায় তাঁর তীর্থযাত্রার পথে অগ্রসর হলেন। এক এক করে তিনি মল্লিকার্জুন তীর্থ, অহোবল, নৃসিংহক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গম, ঋষভপর্বত, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কেরল দেশের তীর্থসমূহ, মহারাষ্ট্রের কোলাহপুর, পাণ্ডুপুর, নাসিক প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন শেষ করে গোদাবরী ধরে পুনরায় পুরীতে ফিরে এলেন। তীর্থপর্যটনের সময় প্রতি তীর্থে তিনি বহু লোককে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রও তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। প্রতাপরুদ্র প্রথমে বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসেই তিনি বৈষ্ণবধর্মের অনুরক্ত হন। এই ঘটনার পরই ওড়িশা থেকে বৌদ্ধধর্ম তিরোহিত হয়। চৈতন্য সমগ্র ওড়িশা দেশকে নামসংকীর্তনে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তারপর দুই রথযাত্রা উৎসব

কাটিয়ে চৈতন্য মথুরা-বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গৌড়ে ফিরে আসেন। ফেরবার পথে তিনি পানিহাটি, কুমারহট্ট, কুলিয়া প্রভৃতি স্থানে যাবেন। যখন শান্তিপুর আসেন, শচীদেবী পুত্রকে দেখতে আসেন।

তারপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে যান। সেখানে রাজমন্ত্রী রূপ ও সনাতন তাঁর পদধূলি নেন। রামকেলী থেকে শান্তিপুরে এসে তিনি অদ্বৈতের বাড়িতে দিন দশেক কাটান। মায়ের কাছ থেকে বৃন্দাবন যাবার অনুমতি নিয়ে তিনি নীলাচলে ফিরে যান। নীলাচলে বর্ষার কয়েক মাস কাটিয়ে তিনি বনপথে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে তিনি হরিনাম প্রচার করতে করতে অগ্রসর হন। ঝাড়খণ্ডের বহু আদিবাসী ও যমুনার তীরে এক সম্রান্ত মুসলমান পরিবারকে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। এদিকে রূপ ও সনাতন দুই ভাই সংসার পরিত্যাগ করে প্রয়াগে এসে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। ছয় বৎসর তীর্থযাত্রায় কাটিয়ে মহাপ্রভু আবার নীলাচলে ফিরে আসেন। শেষের আঠারো বৎসর তিনি নীলাচল ছেড়ে আর কোথাও যাননি। সেখানেই তিনি অপ্রকট হন। তাঁর অপ্রকট হওয়া সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা নেই, যা আছে তা পরবর্তীকালের চরিতকাব্য জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এ, কিন্তু সে বিবরণ প্রমাতীত নয়। ১৪৫৫ শকাব্দে তিনি অপ্রকট হয়েছিলেন। কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি নীলাচলে নীলসমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। তবে অপর এক কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি পুরীর মন্দির মধ্যে পাণ্ডাগণ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

পাঁচ

চৈতন্যের জীবদ্দশায় তাঁর ধর্ম প্রচারে সহায়ক ছিলেন তাঁর প্রধান সহকারী ও ভক্তবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে প্রধান সহকারী ছিলেন নিত্যানন্দ। বীরভূমের একচক্রা নগরীতে তাঁর জন্ম। বিশ বছর বয়সে তিনি চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন নবদ্বীপে। 'নিত্যানন্দ অক্রোধ ও পরমানন্দ পুরুষ ছিলেন; জ্ঞানের অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতেন।' চৈতন্য তাঁকে এবং ভক্ত হরিদাসকে নবদ্বীপবাসিগণের নিকট বৈষ্ণবধর্ম প্রচারার্থ নিযুক্ত করেন। ধর্মপ্রচারার্থ নিত্যানন্দ রাজার রাখাল বেশ ধারণ করে ভ্রমণ করতেন। অপর যাঁরা চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন অদ্বৈতাচার্য, রঘুনাথ দাস, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, হরি হোড়, গৌরদাস পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, পুণ্ডরীক

বিদ্যানিধি, লোকনাথ গোস্বামী, গদাধর মিশ্র, উদ্ধারণ দত্ত, জগদীশ পণ্ডিত, অভিরাম গোস্বামী, মুরারী গুপ্ত, শ্রীনিবাস চক্রবর্তী, নরোত্তম দত্ত, শ্যামানন্দ মণ্ডল, বীরভদ্র গোস্বামী, জীব গোস্বামী ও অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ।

ছয়

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুসমাজে তন্ত্রধর্ম বিকৃতি লাভ করে বহু অনাচারমূলক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজের কঠোরতাও চরম শীর্ষে পৌঁছেছিল। ধর্মে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমপ্রীতির লেশমাত্র ছিল না। পরস্পরের প্রতি প্রেম স্থাপন করাই চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল। এই ধর্মে এক জাতির প্রতি অপর জাতির বিদ্বেষ ও অবিচার এবং এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিভেদের কোন স্থানই ছিল না। চৈতন্য বিশ্বাস করতেন যে প্রেম ও ভক্তিমূলক নৃত্যগীতের মাধ্যমে মানুষ এমন এক আনন্দময় স্তরে পৌঁছতে পারে যেখানে সে ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে। কৃষ্ণের আরাধনা দ্বারা মানুষ মায়ার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কৃষ্ণপদ লাভ করতে পারে। প্রকৃত বৈষ্ণব জাতিভেদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে। মনে হয়, বৌদ্ধদের সহজিয়া ধর্ম, চণ্ডীদাস প্রমুখ মধ্যযুগের বৈষ্ণবদের মনকে যা প্রভাবান্বিত করেছিল, তা চৈতন্যের ধর্মপ্রচারে সহায়ক হয়েছিল। চৈতন্য তাঁর ধর্ম-সমাজের জাতি-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর ধর্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি ও সেই ভক্তি উদ্দীপনের জন্য নাম-সংকীর্তন—এরই ওপর ছিল চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণকে এ ধর্ম বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিল। মুসলিম সাহিত্যক্ষেত্রেও চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্মেই বাঙালী জাতির প্রথম জাগরণ। বাঙালীর চিন্তাধারাকে চৈতন্যের ধর্মই প্রথম আধুনিকতার দিকে প্রবাহিত করেছিল। যদিও চৈতন্য-উত্তর কালে চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম বিকৃত হয়েছিল সহজযানের পূতি-গন্ধময় প্রণালী দ্বারা এবং বৈষ্ণবী শক্তির উদ্বোধন যা মহাপ্রভুর চরম লক্ষ্য ছিল, তা বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাধুর্য-আস্বাদনে। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, "বৈষ্ণবী শক্তিতত্ত্ব পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে ঠেকল এসে মাধুর্য-আস্বাদনে, সে মাধুর্যের আধার হল নারী, তাও স্বকীয়া নয়, পরকীয়া।"

বাঙালীর নিজস্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

চৈতন্যোত্তর যুগে বাঙলায় উদ্ভূত হয়েছিল বাঙলার এক স্বকীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। যাঁরা চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেক বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোক ছিলেন। চৈতন্যের তিরোভাবের পর তাঁরা অনেকেই বাঙলার নানা স্থানে রাধাকৃষ্ণ ও গৌর-নিতাই-এর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। অধিকাংশ স্থলেই এই সকল মন্দির নির্মাণে এক নূতন স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছিল।

বাঙলার মন্দিরসমূহকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারা যায়—(১) চালা, (২) রত্ন ও (৩) দালান-রীতিতে গঠিত মন্দির। এগুলি ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্বীকৃত রেখ, ভদ্র ইত্যাদি শৈলীরীতিতে নির্মিত মন্দিরসমূহ থেকে ভিন্ন। তার মানে বাঙলার মন্দিরসমূহ বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। প্রথমে ধরা যাক্ 'চালা' মন্দির। এগুলি বাঙলার কুঁড়েঘরের অনুকরণে গঠিত। এ থেকে মনে হয় যে বাঙলার দেবালয়গুলি অতীতে সহজলভ্য উপকরণ, যেমন—বাঁশ, খড়, কাঠ ইত্যাদি দ্বারাই নির্মিত হত। পরে সেগুলি পোড়া ইটের তৈরি হতে থাকে। চালা-মন্দিরসমূহকে দোচালা, জোড়-বাংলা, চারচালা, আটচালা ও বারোচালা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। দোচালা মন্দিরকে এক-বাংলা মন্দিরও বলা হত, তবে পশ্চিমবঙ্গে দোচালা মন্দির খুব বিরল। দুটি-দোচালা মন্দিরকে পাশাপাশি স্থাপন করে যখন মন্দির তৈরি করা হত, তখন তাকে জোড়বাংলা মন্দির বলা হত। জোড়বাংলা মন্দিরের সুন্দর নিদর্শন হচ্ছে হুগলী জেলার সেনেটের বিশালাক্ষীর মন্দির। গ্রাম-বাঙলার সর্বত্র খড়ের যে চারচালার কুটির দেখতে পাওয়া যায়, তার অনুকরণে যে সকল মন্দির তৈরি হত, সেগুলিকে চারচালা মন্দির বলা হত। একটি চারচালা মন্দিরের মাথার ওপর আর-একটি ছোট চারচালা মন্দির নির্মাণ করে, আটচালা মন্দির গঠন করা হত। আটচালা মন্দিরের নিদর্শনই বাঙলার সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণত এগুলি শিবমন্দির হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

বাঙলার শিখরযুক্ত মন্দিরগুলিকে 'রত্ন' মন্দির বলা হয়। 'রত্ন' শব্দটি 'শিখর' বা 'চূড়া' শব্দের সমার্থবোধক শব্দ। যখন মাত্র একটি শিখর থাকে, তখন তাকে

'একরত্ন' মন্দির বলা হয়। যখন কেন্দ্রীয় শিখর ব্যতীত ছাদের চারকোণে আরও চারটি ক্ষুদ্র শিখর থাকে তখন তাকে 'পঞ্চরত্ন' মন্দির বলা হয়। আবার যখন পঞ্চরত্ন মন্দিরের মাঝের চূড়াটির স্থানে একটি দোতলা কুঠরি তৈরি করে তার ছাদের চারকোণে চারটি ছোট চূড়া ও মাঝখানে একটি বড় চূড়া তৈরি করা হয়, তখন তাকে 'নবরত্ন' মন্দির বলা হয়। অনুরূপভাবে যখন আরও একতলা তৈরি করে, তার মাঝখানে একটি বড় শিখর ও চারকোণে চারটি ছোট শিখর বসানো হয়, তখন তাকে 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দির বলা হয়। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দির হচ্ছে পঞ্চরত্ন মন্দিরের নিদর্শন। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির হচ্ছে নবরত্ন মন্দিরের নিদর্শন ও বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির হচ্ছে ত্রয়োদশরত্ন মন্দিরের নিদর্শন। কুমিল্লায় সতেরো-রত্ন মন্দিরও আছে। 'দালান' রীতিতে গঠিত মন্দিরের কোন শিখর নেই। তার মানে, মন্দিরের ছাদটি হচ্ছে সমতল। 'দালান' রীতিতে গঠিত অনেকগুলি মন্দির বীরভূমের নানা স্থানে আছে, যথা—উচকরণ, কনকপুর, নানুর ও লাভপুরে অবস্থিত মন্দিরসমূহ।

বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতিতে গঠিত এইসকল মন্দির ছাড়া, ভারতীয় 'রেখ' রীতিতে গঠিত মন্দিরও বাঙলার কয়েক স্থানে আছে। 'রেখ' রীতিতে গঠিত প্রাচীন মন্দিরগুলি প্রস্তরনির্মিত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রীতিতে গঠিত মন্দিরগুলি ইষ্টকনির্মিত হয়েছিল। 'রেখ' মন্দিরের গঠনশৈলী বাঙলায় অনুপ্রবেশ করেছিল ওড়িশা থেকে, যদিও ওড়িশা-শৈলীর আদিবৈশিষ্ট্য বাঙলায় অনুসৃত হয়নি। ওড়িশা থেকে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে এই রীতিতে গঠিত মন্দিরের সংখ্যাধিক্য আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই মেদিনীপুর জেলায়। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলাতেও এই শৈলীর মন্দির দৃষ্ট হয়। ২৪-পরগনার জটার দেউল এই রীতিতে গঠিত মন্দিরের জীর্ণ নিদর্শন।

৬২

বাঙলাদেশের বহু ইটের মন্দিরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হচ্ছে 'টেরাকোটা' বা পোড়ামাটির অলঙ্করণ। পোড়ামাটির অলঙ্করণ ভারতে খুব প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এর নিদর্শন আমরা পাই ভিটা, অহিচ্ছত্র, রাজগীর, ভিতরগাঁও প্রভৃতি স্থানে। বাঙলাদেশেও পাল যুগে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধবিহারের গায়েও আমরা পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখতে পাই। খ্রীষ্টীয়

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়ার বহুলাড়া ও সোনাতোপলের মন্দিরে, বীরভূম ও হুগলী জেলার বহু মন্দিরে এবং মালদহ জেলার গৌড়, আদিনা ও পাণ্ডুয়ার মসজিদগুলির গায়ে আমরা পোড়ামাটির অলংকরণ দেখতে পাই। এগুলি সাধারণত তৈরি করা হত চালির আকারে ছাঁচে ফেলে, বা কাঁচামাটির ওপর উৎকীর্ণ করে 'পোন' বা ভাটিতে পুড়িয়ে। পোড়ামাটির ইটে সাধারণত ৩০।৪০ বছরের মধ্যেই নোনা ধরে যায়। কিন্তু বাঙলার মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির অলংকারসমূহ তিন-চারশ বছরেও অক্ষত অবস্থায় আছে। সেজন্য অনুমান করা হয়েছে যে এগুলির নির্মাণে বিশেষ ধরনের মাটি ও খুব উঁচু দরের দক্ষতা ও নৈপুণ্য ব্যবহৃত হত। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, এগুলির নির্মাণের জন্য সমাজে এক বিশেষ শ্রেণীর শিল্পী ছিল। তিনি বলেছেন 'কোথায় এসব শিল্পীদের ঘাঁটি ছিল এবং কি ভাবেই বা তাঁরা মন্দির তৈরি করে বেড়াতেন সে বিষয়ে বিস্তৃত সমীক্ষার প্রয়োজন। আমার অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান থেকে বলতে পারি, মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-দাসপুর, হাওড়া জেলার থলিয়া-রসপুর, হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর, রাজহাটি, সেনহাটি, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, পলাশ ও বর্ধমান জেলার গুসকরা ও কেতুগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এসব শিল্পী প্রধানত কেন্দ্রীভূত ছিলেন। এই মূল ঘাঁটিগুলির কাছাকাছি বহু ছোট বড় গ্রামে তাঁদের বসতি ছিল। আমার-দেখা অনেক মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে তাদের 'সূত্রধর', 'রাজ' বা 'মিস্ত্রি' বলা হয়েছে ও তাদের পদবি পাল, শীল, চন্দ্র, দত্ত, কুণ্ডু, দে, মাইতি, রক্ষিত, পাত্র প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে।'

পোড়ামাটির অলংকরণের বিষয়বস্তু হচ্ছে—রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বৃত্তান্ত, সমকালীন সমাজচিত্র, বন্যপশুর অনায়াস বিচরণ-ভঙ্গী ও সাবলীল গতিবেগ এবং ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি। রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে হরধনুভঙ্গ, রামসীতার বনগমন, সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, মারীচবধ, রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ, জটায়ুবধ, অশোকবনে সীতা প্রভৃতি এবং মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, শকুনির পাশাখেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধদৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি। পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে বিষ্ণুর দশ অবতার, দশ দিক্‌পাল, দশ মহাবিদ্যা ও অন্যান্য মাতৃকা-দেবীসমূহ এবং অন্যান্য জনপ্রিয়

পৌরাণিক উপাখ্যান, যথা—শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুরমর্দিনী ইত্যাদি। সামাজিক দৃশ্যসমূহের মধ্যে আছে বারাঙ্গনা-বিলাস ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, বেদে-বেদেনীর কসরৎ, মোহান্ত-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও নানারূপ ঘরোয়া দৃশ্য। এই প্রসঙ্গে 'বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিদেশী বণিক ও বাঙালী সমাজ

বিদেশী বণিকরা বাঙলাদেশে এসে বাঙালী সমাজের ওপর গভীর প্রতিঘাত হেনেছিল। এ সকল বিদেশী বণিক প্রথম আসতে শুরু করেছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। যারা সবচেয়ে আগে এসেছিল, তারা হচ্ছে পর্তুগীজ। এরা সকলেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

পর্তুগীজরাই সমুদ্রপথে ভারতে আসবার পথের সন্ধান পেয়েছিল। পর্তুগালের রাজা প্রথম ম্যানুয়েলের রাজত্বকালে ভাসকো-ডা-গামা নামে এক নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এসে পৌছান। কিন্তু ভারতে আসবার পথ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। দৈবক্রমে ওই সময় তাঁর সঙ্গে এক গুজরাটি মুসলমান নাবিকের সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয়। ওই গুজরাটি মুসলমান নাবিকই তাঁকে ভারতের পথ দেখিয়ে, ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে কপ্পাট নামক গ্রামে তাঁকে পৌছে দেয় (১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দ)। ওই গ্রামের পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরেই ছিল মালাবারের রাজধানী কালিকট। কালিকটের রাজা ছিলেন মুসলমান। তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করেন।

মালাবার উপকূলে নিজেদের শক্তি সুদৃঢ় করে পর্তুগীজরা গোয়ায় তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। বাঙালী বণিকরা গোয়ার হাটে তাদের মাল বেচতে যেত। সেজন্য পর্তুগীজরা বাঙলার পণ্যদ্রব্য ও তার প্রচুরতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

সরাসরি বাঙলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে তারা বাঙলায় দু একজন নাবিক পাঠিয়ে দেয়। প্রথম এসে চট্টগ্রামে উপস্থিত হয় যোয়াও কোয়েলহো (Joao Coelho) নামে একজন নাবিক। চট্টগ্রামই তখন ছিল বাঙলাদেশের বড় বন্দর। কেননা এখান থেকে মেঘনা নদীর জলপথে বাঙলার রাজধানী গৌড়ে পৌছান যেত।

যোয়াও কোয়েলহো নিজে কোন জাহাজ আনেননি। তিনি মালাক্কা থেকে এক মুসলমানী জাহাজে চেপে এসেছিলেন। পর্তুগীজ জাহাজ নিয়ে বাঙলায় প্রথম আসেন যোয়াও ডি সিলভেরা (Joao de Silveira) ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে। তিনি বাঙলার সুলতান মামুদ শাহের কাছে প্রার্থনা জানান যে, পর্তুগীজরা যেন

তাঁর রাজ্যে বাণিজ্য করতে পারে, এবং চট্টগ্রামে যেন তাদের একটা কুঠি নির্মাণ করতে দেওয়া হয়। মামুদ শাহ পর্তুগীজদের এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।

পর্তুগীজরা কিন্তু দমবার পাত্র ছিল না। প্রতি বৎসরই তারা বাঙলাদেশে বাণিজ্য অভিযান পাঠাতে থাকে। এই কারণে মামুদ শাহের সঙ্গে তাদের বিরোধ ঘটে।

দুই

সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্তুগীজদের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় বাঙলাদেশ শেরশাহ (১৫৩৯-৪০) ও হুমায়ুনের (১৫৩৮-৩৯) মধ্যে যুদ্ধের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। পর্তুগীজরা এই যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা ১৫৩৫-৩৭ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপার। ঠিক এই সময় পশ্চিম বাঙলার শ্রেষ্ঠ ও অতি প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামে দিওগো বিবেলো নামে এক পর্তুগীজ বণিক এসে হাজির হয়। শেরশাহ বাঙলাদেশ আক্রমণ করবার উপক্রম করছে দেখে সুলতান মামুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮) পর্তুগীজদের প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন। তিনি দেশরক্ষার জন্য পর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তার পরিবর্তে তিনি পর্তুগীজদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম এই উভয় জায়গাতেই কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করতে দেবেন। যদিও শেরশাহের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সুলতান মামুদ শাহ জয়ী হলেন না, তথাপি তিনি পর্তুগীজদের সাহায্য স্বীকার করে নিলেন। তিনি সপ্তগ্রামে ও চটগ্রামে পর্তুগীজদের কুঠি নির্মাণ ও শুল্কশাল (customs house) স্থাপন করতে দিলেন, কিন্তু দুর্গ নির্মাণ করবার অনুমতি সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করলেন। সুলতান মামুদ শাহ পর্তুগীজদের সপ্তগ্রাম ও চটগ্রামে শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে দিলেন দেখে দেশবাসীরা অবাক হয়ে গেল। এইভাবে ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাঙলাদেশের লোক পর্তুগীজদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল। বাঙলাদেশের লোকরা তাদের ফিরিঙ্গি (frank শব্দের অপভ্রংশ) বা হারমাদ (armada শব্দের অপভ্রংশ) বলে অভিহিত করতে লাগল।

ইতিমধ্যে পাঠান মোগলে সংঘর্ষ চলতে লাগল। ১৫৪০ থেকে ১৫৫৩-র মধ্যে খিজ্র খান (১৫৪০-১৫৫১), কাজী ফজীলৎ (১৫৫১ ?) ও মুহম্মদ খান (?-১৫৫৩) প্রমুখ শেরশাহ ও ইসলাম শাহের অধীন শাসনকর্তারা বাঙলাদেশ

শাসন করতে লাগলেন। ১৫৫৩ থেকে ১৫৭৬ পর্যন্ত মুহম্মদ শাহী বংশের সুলতানগণ ও তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য শাসকগণ এবং কররানী বংশের শাসকগণ বাঙলার সিংহাসন দখল করে রইল। কররানী বংশের শেষ শাসক দাউদ কররানীকে মুঘল সম্রাট আকবর পরাজিত করেন ও বাঙলা মুঘলগণ কর্তৃক নিযুক্ত সুবেদারদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। কিন্তু প্রথম চল্লিশ বৎসর কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসন প্রণালী ছিল না। এই সুযোগে 'বারভূইঞা' নামে পরিচিত বাঙলার জমিদারগণ (যথা ঢাকা ও মৈমনসিংহের ইশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, ইশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ, বাকলার রামচন্দ্র, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভ ওয়ালের বাহাদুর গাজী, সরাইলের সোনা গাজী, চাতমোহরের মির্জা মমিন, খলসীর মধু রায়, চাঁদ প্রতাপের বিনোদ রায়, ফরিদপুর ফতেয়াবাদের মজলিস কুতুব, মাতঙ্গার পালওয়ান, ভূষণার শত্রুজিৎ, সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ ও ভুলুয়ার অনন্দমাণিক্য) স্বেচ্ছামত নিজেদের রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু মুঘলগণ এঁদের বিদ্রোহ দমন করে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা পর্তুগীজদের আধিপত্য বিস্তারের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

তিন

সপ্তগ্রামেই পর্তুগীজরা বাঙলার সঙ্গে তাদের বাণিজ্যের মূল ঘাটি স্থাপন করল। অত্যাপ্রবীণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সপ্তগ্রামের ছিল খুব সুনাম। সাতখানা গ্রামের সমষ্টি নিয়ে 'সপ্তগ্রাম' নামের উৎপত্তি। এই সাতখানা গ্রাম যথাক্রমে বংশবাটি (বা বাঁশবেড়িয়া), কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বোকাথা ও বলদঘাটি। এই সাত গ্রামের বণিকদের মিলনস্থান ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম ছিল সরস্বতী নদীর ওপর অবস্থিত। সরস্বতীই এককালে ভাগীরথীর প্রধান খাত ছিল। সেজন্য সপ্তগ্রাম পূর্বভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ও নগর হিসাবে পরিগণিত হত। উত্তর ভারতের নানাস্থান থেকে ব্যবসায়ীরা সপ্তগ্রামের হাটে মাল কেনাবেচা করতে আসত। পর্তুগীজরা যে সময় সপ্তগ্রামে আসে, তার অব্যবহিত পরেই শেরশাহ সপ্তগ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। (এটাই পরবর্তীকালের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড)। এর ফলে, উত্তর ভারতের ব্যবসায়ীদের সপ্তগ্রামের হাটে আসার পথ আরও সুগম হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে, পর্তুগীজদের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য সপ্তগ্রামের বাজারে আরও

অনেক ব্যাপারীর সমাগম হয়। সমসাময়িক সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সপ্তগ্রামের বাজার সব সময়েই অগণিত জনগণের কলরবে মুখরিত থাকত।

পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে আসবার পর তাদের সঙ্গে ব্যবসা করবার জন্য আরও এগিয়ে এসেছিল বাঙালী বণিকের দল। এর ফলে, উভয় পক্ষই রাতারাতি বড়-লোক হয়ে গেল। সপ্তগ্রামের বণিকদের ধনাঢ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যলীলায় লিখিত আছে —"হিরণ্য গোবর্ধন নামে দুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বারো লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।" সপ্তগ্রামের আরও দুই বণিকের নাম আমরা সমসাময়িক মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পাই। এরা হচ্ছে শ্রীধর হাজরা ও রাম দাঁ। অন্যান্য স্থানের যে সকল বণিকের নাম আমরা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পাই, তারা হচ্ছে— বর্ধমানের ধুস দত্ত, চম্পাইনগরের চাঁদ সদাগর ও লক্ষ্মী সদাগর, কজনার নীলাম্বর ও তার সাত সহোদর, গণেশপুরের সনাতন চন্দ্র ও তার দুই সহোদর গোপাল ও গোবিন্দ, দশঘরার স তুলা, সাঁকোরের বিষ্ণুদত্ত ও তার সাত সহোদর, সাঁকোরের শঙ্খ দত্ত, কর্যোতির যাদবেন্দ্র দত্ত, কাড়গ্রামের রঘু দত্ত, তেথরার গোপাল দত্ত, ত্রিবেণীর রাম রায় ও তার দশ সহোদর, নাউগাঁয়ের রাম দত্ত, পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, বিষ্ণুপুরের ভগবত খাঁ, খণ্ডঘোষের বাসু দত্ত, ও গোতনের মধু দত্ত ও তাঁর পাঁচ সহোদর। বলা বাহুল্য যে, এরা সকলেই ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। আর পর্তুগীজদের ধনাঢ্যতা সম্বন্ধে হ্যামিল্টন লিখে গিয়েছেন যে পর্তুগীজ বণিকরা যে ঘোড়ায় চেপে বাঙলার হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াত, সেই সকল ঘোড়ার লাগাম ছিল সোনার চুমকি বসানো ও এদেশের রেশম দিয়ে তৈরি। আর চাবুক ছিল নানা রঙের মিনে করা রূপার পাতের। আর তাদের পরনে থাকত বহুমূল্য বনাঢ্য পোশাক।

পরবর্তীকালের অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকরা দালাল মারফত আগে থাকতে দাদন দিয়ে নমুনা অনুযায়ী মাল সংগ্রহ করত। পর্তুগীজরা কিন্তু তা করত না। তারা বাজার থেকে নগদ দামে সরাসরি মাল কিনে নিত। এজন্য প্রথম প্রথম (১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) তাদের স্থায়িভাবে থাকবার কোন প্রয়োজন হত না। প্রতি বছর তারা নূতন করে আসত, এবং সপ্তগ্রামের কাছাকাছি জায়গায় চালাঘর তৈরি করে বাস করত। তারপর কেনাবেচা শেষ হয়ে গেলে চালাঘর-গুলো পুড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরে যেত।

চার

পরবর্তী ৪০ বৎসরের রাজনৈতিক চঞ্চলতা ও নদীপ্রবাহের পরিবর্তন পর্তুগীজদের বাণিজ্যপ্রসারকে বিব্রত করে তোলে। তারা বিশেষ করে মুশকিলে পড়ে সরস্বতী নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সরস্বতী নদী শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে দিওগো রিবেরো যখন সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখনও বড় জাহাজ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত এসে হাজির হত। তারপর জল ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পর্তুগীজদের পক্ষে বড় জাহাজ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসা সম্ভবপর হত না। তখন তারা বড় জাহাজ শিবপুরের (কলকাতার অপর পারে) নিকট বেতোড়ে নোঙর করত ও ছোট নৌকায় সপ্তগ্রাম যেত। সরস্বতীর নাব্যতা যখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, তখন তারা ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে আগরায় গিয়ে সম্রাট আকবরকে বহু উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করে তার কাছ থেকে সপ্তগ্রামের নিকট হুগলীতে কুঠি নির্মাণ করবার নিমিত্ত একখানা ফারমান সংগ্রহ করে। এরপর তারা হুগলীতে একটা স্থায়ী নগর স্থাপন করবার জন্য আগরায় ক্যাপটেন ট্যাভারেজকে পাঠায়। আকবর তাদের প্রতি সদয় হয়ে অনুমতি দেন যে, তারা হুগলীর নিকট এক স্থায়ী নগর স্থাপন করতে পারবে, এবং সেখানে গীর্জা তৈরি করে খ্রীস্টের সুসমাচার প্রচার করতেও পারবে। হুগলী তখন একটা নগণ্য স্থান ছিল। মাত্র দশ-বারো খানা মেটে বাড়ি ছাড়া, আর কিছুই ছিল না। কিন্তু পর্তুগীজরা সেখানে রীতিমত চিরস্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে সেটাকে নগরে পরিণত করে। ব্যবসার সুবিধার জন্য সপ্তগ্রামের বণিকরা হুগলীতে উঠে আসে। এইভাবে সম্রাট আকবরের আনুকূল্যে পর্তুগীজরা হুগলীকে বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করে। আবদুল হামিদ লাহোরী তাঁর 'বাদশাহনামা'য় লিখে গিয়েছেন যে, পর্তুগীজরা হুগলীতে এক সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করে ও সেখানে তারা কামান প্রভৃতি দিয়ে সেখানে সুরক্ষিত করে। নদীর দিক ছাড়া, বাকী তিনদিক তারা পরিখা খনন করে জায়গাটাকে সুরক্ষিত করে। মোট কথা, এখন থেকে পর্তুগীজরা প্রতি বৎসর আর যাওয়া আসা না করে, বাঙলায় স্থায়ী বসবাস শুরু করে (১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে)।

পাঁচ

অত্যন্ত বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পর্তুগীজরা হুগলীতে তাদের শক্তি বিস্তার করে। বহু পর্তুগীজ এসে হুগলীতে বসবাস শুরু করে। এ ছাড়া, পর্তুগীজ পাদ্রীরা এদেশের বহু লোককে ধর্মান্তরিত করে। পর্তুগীজরা ছাড়া, বহু বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মুঘল, পারসিয়ান ও আর্মেনিয়ান বণিকরাও এসে হুগলীতে বসবাস শুরু করে। হুগলী একটা জনবহুল নগরে পরিণত হয়। হুগলীর বন্দরে নোঙর করতে আরম্ভ করল চীন, মালাক্কা, ম্যানিলা ও ভারতের বিভিন্ন বন্দরের পণ্যবাহী জাহাজসমূহ। মোট কথা, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমস্ত বাণিজ্য পর্তুগীজদের হাতে গিয়ে পড়ে। এ ছাড়া, লবণ তৈরির একচেটিয়া অধিকারও তারা পায়।

ক্রমশ পর্তুগীজরা তাদের বসতি বাড়াতে লাগল। বহু পতিত জমিতে চাষ করবার অধিকারও তারা পেল। হুগলী থেকে দুশো মাইল অভ্যন্তরস্থ অঞ্চলসমূহ পর্তুগীজদের প্রভাবে এসে পড়ল। এ ছাড়া, ভাগীরথীর উভয় তীরে, তারা আরও জমিজমা কিনল। ক্রমশ তারা এমন শক্তিশালী হয়ে পড়ল যে, এই সকল জমিজমা থেকে তারা নিজেরাই রাজস্ব আদায় করতে লাগল, এবং মুঘলদের অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ যে নামমাত্র কর তাদের মুঘল-রাজকোষে দেবার কথা ছিল, তাও দিতে অস্বীকার করল। এক কথায়, তারা আর মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করল না। হুগলীতে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন আরম্ভ করল। এমনকি পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মুঘলরা পর্তুগীজদের নগরমধ্যে প্রবেশ করতেও পারত না। বন্দরে জাহাজ প্রবেশ সম্বন্ধে পর্তুগীজরা যে সকল নিয়ন্ত্রণ-বিধি প্রবর্তন করেছিল, সেগুলো মুঘলদের জাহাজের ওপরও প্রয়োগ করল। তাদের জোর-জুলুম, অত্যাচার, শোষণ, বলপূর্বক ছেলেমেয়েদের ধরে ধর্মান্তরিত-করণ ও নারীধর্ষণ বঙ্গবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

ছয়

এদিকে পূর্ববাঙলার লোকরাও পর্তুগীজদের নামে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পাঠান রাজত্বের দুর্বলতার সময় পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে অনেক জমিদার স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘলরা যখন পূর্ববঙ্গ জয় করে, মুঘলদের তখন এঁদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। এঁদের 'বারভূঞা'

বলা হত। এঁরা পর্তুগীজদের বরকন্দাজ হিসাবে রাখতেন। পর্তুগীজরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়। ঢাকা থেকে শ্রীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল পর্তুগীজ দ্বারা ছেয়ে গিয়েছিল, এবং যখন স্থানীয় লোকরা পর্তুগীজদের ওপর রুষ্ট হল, তখন সম্রাট আকবর আদেশ পাঠিয়ে দিলেন যে, পর্তুগীজদের ওপর যেন কোন রকম হামলা করা না হয়। পর্তুগীজরা ঢাকায় গীর্জা স্থাপন করে এবং স্থানীয় লোকদের ধর্মান্তরিত করে।

ঢাকার নবাবের সঙ্গে মিত্রতাই পর্তুগীজদের পূর্ব বাঙলায় অগ্রগতির কারণ। শায়েস্তা খাঁর আমলে তারা বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে, এবং ইছামতী নদীর তীরে প্রায় ১২ মাইল বিস্তৃত এলাকায় ফিরিঙ্গি বাজার স্থাপন করে। এ ছাড়া, ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলায় পর্তুগীজরা আরও বসতি স্থাপন করে। এগুলি খ্রীশ্চান অঞ্চলে পরিণত হয়। যেসব জায়গায় পর্তুগীজরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল শ্রীপুর, চান্দেকান, বাকলা, কট্রাকো, লরিকুল ও ভুলুয়া।

পশ্চিমবঙ্গেও তারা তমলুক, হিজলি, পিপলি ও বালেশ্বর পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল ও বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল। পূর্ব বাঙলায়, এসব জায়গায় তারা গীর্জা স্থাপন করে বহু স্থানীয় লোককে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিল।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন থেকে আরম্ভ হয় পর্তুগীজদের অবনতি। বাঙলাদেশ থেকে মাল কিনে, বিদেশের হাটে দশবিশ গুণ চড়া দামে বেচে তারা অতি ধনী হয়ে পড়েছিল। ধনী সমাজের যে সকল গুণাগুণ দেখতে পাওয়া যায়, তা তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। বাঙলায় তারা বিলাসিতা ও লাম্পট্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং সদ্য আগন্তুক ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কাছে তারা বাণিজ্যে পরাস্ত হয়ে যায়।

সাত

পর্তুগীজ আধিপত্যের প্রভাবে বাঙালী সমাজ বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য বাঙালী সমাজের বিপর্যয় অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল—হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর থেকে। আগেই বলেছি ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর, মুসলমান পীর, দরবেশ ও মোল্লা কর্তৃক

বাঙলায় ধর্মান্তরিতকরণের এক অভিযান চলেছিল।

হিন্দুসমাজ যখন এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন আবির্ভূত হন দুই মহাপুরুষ—স্মার্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্য। আগের অধ্যায়েই বলেছি মুসলমানগণ কর্তৃক অপহৃতা নারীকে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে আবার গ্রহণ করবার বিধান দেন রঘুনন্দন। হিন্দুসমাজে কিন্তু সাম্যনীতির অভাব ও জাতিভেদ প্রথা রয়ে যায়। এটা দূর করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য।

১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। বাঙলায় তখন চলেছিল এক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা (আগে দেখুন)। ঠিক সেই সময় পর্তুগীজরা বাঙলাদেশে এসে উপস্থিত হয়। প্রায় একশ বছর ধরে বাঙলার বুকে চলে পর্তুগীজদের শোষণলীলা, অত্যাচার, ধর্মান্তরিতকরণ, লাম্পট্য, নারীধর্ষণ ও দস্যুতা। পর্তুগীজদের নামে সাধারণ বাঙালী সন্ত্রস্ত হয়—শুধু ধনবান ও ঐশ্বর্যশালী হয় বাঙালী বণিকের দল। সম্রাট আকবর যখন (১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে) পর্তুগীজদের হুগলীতে একটা স্থায়ী নগর স্থাপন, গীর্জা নির্মাণ ও খ্রীস্টের সুসমাচার প্রচার করবার অনুমতি দেন, তখন তিনি নির্দেশ দেন যে, তার পরিবর্তে পর্তুগীজরা বাঙলাদেশকে লুণ্ঠন ও অববোচিত অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ লোকদের ওপর পর্তুগীজদের অত্যাচার, জুলুম ও নিগ্রহ কমেনি। পর্তুগীজ দস্যুরা প্রায়ই বাঙলার দক্ষিণ উপকূলস্থ গ্রামগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, গ্রামবাসীদের যথাসর্বস্ব লুট করত, এবং মেয়েদের ধর্ষণ করে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিত। স্ত্রীপুরুষ ছেলে-মেয়ে সকলকে বন্দী করে বলপূর্বক নৌকায় তুলে নিয়ে চালান দিত দূরদূরান্তরের ক্রীতদাসের হাটে বেচবার জন্য। দু'শ বছর পরে উইলসন সাহেব গঙ্গার মোহনায় সুন্দর সুন্দর দ্বীপ দেখে অনুমান করেছিলেন যে, এগুলি একসময় সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল গ্রাম ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচারের ফলেই সেগুলো তাঁর সময় পরিত্যক্ত ও শূন্য অবস্থায় ছিল।

মেয়েদের ধর্ষণ করা ও জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা বা রক্ষিতা হিসাবে রাখা পর্তুগীজদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এমন কি তারা সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে এক ফারমানও সংগ্রহ করেছিল, যার বলে তারা বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে রাখবার অধিকার পেয়েছিল। বাঙালী মেয়েদের কমনীয়তা ও কৌতুকরসবোধই তাদের প্রতি পর্তুগীজদের

আকৃষ্ট করেছিল। বোধহয় অনেক ক্ষেত্রে পর্তুগীজদের প্রতি বাঙালী মেয়েদেরও অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ অত্যন্ত সজীবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়ে রয়েছে কাঁচরাপাড়ার এক মন্দিরে পোড়ামাটির এক মৃৎফলকে। এই সকল বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে পর্তুগীজদের যৌনমিলনের ফসলই হচ্ছে ফিরিঙ্গি বা দো আঁশলা জাতি।

নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে এখানে একটা কথা বলতে চাই। হুগলী জেলার বহুলোকের চোখের রঙ নীল দেখা যায়। এদের ধমনীতে যে পর্তুগীজ রক্ত আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৬২৮-৫৬ খ্রী.) বার্নিয়ার এদেশে এসেছিলেন। তিনি বলে গিয়েছেন হুগলীতে তখন আট-নয় হাজার পর্তুগীজ বাস করত। সমগ্র বাঙলাদেশে পর্তুগীজদের সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার। এদের প্রত্যেকেরই বহু দাসদাসী ছিল। এদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসময় ছিল।

হুগলী ও চব্বিশ পরগনা জেলায় বহু কৃষিভূমি পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। এই সকল কৃষিভূমিতে তারা বিদেশীয় ফসলের চাষ করত; এই সকল বিদেশী ফসলের মধ্যে ছিল আলু, তামাক, পেয়ারা, সাগু, কাজুবাদাম, আনারস, আতা, আমড়া, পেঁপে, পেয়ারা ও লেবু। গোড়ার দিকে নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ এগুলো গ্রহণ করেনি, কিন্তু পরে এগুলো বাঙালীর নিত্য খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। তা ছাড়া তামাক খাওয়ার প্রথাও বাঙালীরা পর্তুগীজদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিল। জরদা, সুরতি, নস্য, গুড়ুক ইত্যাদি তামাকেরই সহোদর ভাই। পর্তুগীজগণ কর্তৃক আনীত তামাক থেকেই এগুলো উদ্ভূত।

কৃষি, বাণিজ্য ও যৌনমিলন যে বাঙালী সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তা বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত পর্তুগীজ শব্দসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। যে সকল পর্তুগীজ শব্দ বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে সেগুলো হচ্ছে আচার, আয়া, আলমিরা, আমড়া, আনারস, আবক, বালতি, ভাঙ, বাটা, বুরুশ, বুটিক, কাজু, কামরা, কামিজ, চা, চাবি, কোকো, গুদাম, গীর্জা, ঝিলমিলি, লস্কর, নিলাম, মিস্ত্রি, পাদ্রি, পালকি, পমফ্রেট, পেঁপে, পিওন, রসিদ, সাগু, বারান্দা, কাবাব, আলকাতরা, আতা, বাসন, ভাপ, পেয়ারা, বিসকুট, বয়া, বোতাম, বোতল, কেদারা, কাফি, কাফ্রি, কাকাতুয়া, কামান, ছাপ, কোচ, কম্পাস, খ্রীস্টান,

ইসপাত, ইস্ত্রি, ফিতা, ফর্মা, গারদ, জোলাপ, জানালা, লানটার্ন, নেভু, মাস্তুল, মেজ, পেয়ারা, পিপা, পিরিচ, পিস্তল, পেরেক, রেস্ত, সাবান, তামাক, টোকা, তুফান, তোয়ালে, বরগা, বেহালা, ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এসব জিনিসের ব্যবহার পর্তুগীজদের প্রভাবেই বাঙালী সমাজে প্রবেশ করেছে।

পাঁচ

পর্তুগীজদের পতনের ইতিহাসটা বলা দরকার। যতদিন সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী.) ও তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৮ খ্রী.) বেঁচে ছিলেন, ততদিন পর্তুগীজরা মুঘল দরবারের অনুগ্রহে পুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহানের (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রী.) সঙ্গে পর্তুগীজদের বিরোধ ঘটে। শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তখন তিনি পর্তুগীজদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। পর্তুগীজরা তা দিতে অস্বীকার করেছিল। সেজন্য পর্তুগীজদের ওপর শাহজাহানের পুরানো রাগ ছিল। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, তিনি তাঁর বন্ধু কাসিম খানকে বাঙলায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করে, হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করবার ছুতা অন্বেষণের জন্য নজর রাখতে বলেন। ছুতা পেতে দেরি হল না, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন রকমের বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ অনুযায়ী একজন পর্তুগীজ কাপ্তেন চট্টগ্রাম থেকে এক সুন্দরী মুঘল যুবতীকে অপহরণ করেছিল। অপর কাহিনী অনুযায়ী তারা সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের দুই বাঁদীকে অপহরণ করেছিল, এবং সেই ছুতা অবলম্বন করে মুঘলরা হুগলীতে পর্তুগীজদের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করেছিল। অপর এক কাহিনী অনুযায়ী কাসিম খান সম্রাট শাহজাহানকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে 'হুগলীতে পর্তুগীজরা বাঙলা দখল করবার জন্য সুসজ্জিত হচ্ছে, এবং শুধু যে এ দেশবাসীর ওপর নানারকম জুলুম নির্যাতন করছে তা নয়, তারা বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশের হাটে দাসদাসী হিসাবে বিক্রি করছে। এ ছাড়া, তাদের বসতির সামনে দিয়ে যত জাহাজ ও নৌকা যায়, তাদের কাছ থেকে জোর করে শুল্ক আদায় করছে।' যাই হোক, ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তারা বাদশাহী মহলের ওপর হামলা করে। শীঘ্রই তারা মুঘলদের কাছে পরাজিত হয়। ১,৫৬০ জন পর্তুগীজ যুদ্ধে নিহত হয়, ও ৩,০০০ পর্তুগীজ পালিয়ে গিয়ে সাগরদ্বীপে আশ্রয় নেয়। বহু পর্তুগীজকে বন্দী

করে আগরায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে পুরুষদের দাস করা হয়, আর মেয়েদের উপভোগের জন্য হয় বাদশাহী হারেমে, আর তা নয়তো ওমরাহদের হারেমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু পর্তুগীজরা শীঘ্রই আবার সম্রাট শাহজাহানের অনুগ্রহ লাভ করে, এবং ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি পায়। ওই জমি পেয়েই তারা ব্যাণ্ডেলে এক নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করে, এবং সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করে। এছাড়া, তারা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার পায়। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে, তারা যে ফারমান লাভ করে তাতে উল্লিখিত হয় যে যদি কোন পর্তুগীজ কোন বাঙালী মেয়েকে রক্ষিতা রাখে, তা হলে মুঘল দরবার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। এই সকল অনুগ্রহ লাভের ফলে পর্তুগীজদের অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাণ্ডেল-কনভেন্ট গড়ে ওঠে। কিন্তু হুগলী ও চুঁচুড়ায় ইংরেজ ও ওলন্দাজরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ানোর ফলে, তারা আর তাদের পূর্বশক্তি ফিরে পায় না।

নয়

ইংরেজরা যখন কলকাতা শহরের পত্তন করে তখন কলকাতায় বাস করত পর্তুগীজ ও আরমেনিয়ানরা। পর্তুগীজরা তখন চীনাবাজার অঞ্চলে বাস করত। আরমেনিয়ানরা বাস করত আরমেনিয়ান স্ট্রীট অঞ্চলে। পুরুষরা ইংরেজদের অধীনে হয় দোভাষী, আর তা নয়তো কেরানীর কাজ করত। আর মেয়েরা আয়া বা রক্ষিতার পেশা অবলম্বন করেছিল। ব্যাণ্ডেল তখন এই সকল মেয়েছেলে পাঠাবার আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে আর কোন পণ্যের ব্যবসা হত না। আরমেনিয়ানদের মধ্যে খোজা সরহাদ ইংরেজদের দূত হিসাবে ঢাকায় নবাবের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।

জোব চার্নক যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন কলকাতার জমিদার মজুমদারদের পর্তুগীজ বরকন্দাজ ছিল। ওদের অ্যান্টনি নামে এক পর্তুগীজ বরকন্দাজকে জোব চার্নক চাবুক মেরেছিলেন। অপমানিত হয়ে সে কাঁচরাপাড়ার কাছে এক গ্রামে গিয়ে বাস করে। তারই বংশধর অ্যান্টনি এক বিধবা বামুনের-মেয়েকে বিয়ে করে কবিওয়ালা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে। জনশ্রুতি যে এই অ্যান্টনিই কলকাতার বৌবাজারে ফিরিঙ্গি-কালীর মন্দির

স্থাপন করেন।

১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে হুগলী থেকে পর্তুগীজরা বিতাড়িত হবার পরই, তাদের শূন্যস্থান এসে দখল করে ইংরেজরা। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল পর্তুগীজদের অনেক পরে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ওলন্দাজরা ঠিক ওই একই সময়ে এদেশে আসে। পরে এসেছিল দিনেমার ও ফরাসীরা। সকলেই এদেশে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইংরেজরাই জয়ী হয়।

হুগলী ছাড়া, ইংরেজরা কাশিমবাজার ও পাটনাতেও কুঠি স্থাপন করে। যুগটা ছিল ঘুষের যুগ। দিল্লীর বাদশাহকে দেওয়া হত উপঢৌকন, আর বাঙলার নবাবকে ইনাম। এই উপঢৌকন ও ইনাম দিয়ে ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্যের অনেক সুযোগ-সুবিধা করে নেয়। ইনাম পেয়ে পেয়ে নবাবের লোভ বেড়ে যায়। এর ফলে, নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ ঘটে। ইংরেজরা পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ জোব চার্নককে কাশিমবাজারে ডেকে পাঠায়। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে চার্নকের বিরুদ্ধে দেশীয় ব্যবসাদারগণ কর্তৃক আনীত এক মামলায় হুগলীর কাজী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৭৩,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার রায় দেন। চার্নক ওই টাকা দিতে অস্বীকার করেন। নবাবের সৈন্য কাশিমবাজার অবরোধ করে। কিন্তু চার্নক কৌশল অবলম্বন করে কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে একেবারে হুগলীতে এসে হাজির হন। চার্নক দেখেন যে, ইংরেজকে যদি বাঙলায় কায়েমী ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন করতে হয়, তাহলে মাত্র ব্যবসায়ীর তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে থাকলে চলবে না। দেশ অধিকারও করতে হবে।

শীঘ্রই ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ ঘটে। ইংরেজদের নৌবহর ও সৈন্য-সামন্ত হুগলীতে এসে হাজির হয়। ইংরেজরা নবাবকে পরাজিত করে হুগলী তছনছ করে দেয়। কিন্তু হুগলীতে থাকা ইংরেজরা আর নিরাপদ মনে করে না। সেজন্য চার্নক বেরুলেন ইংরেজদের এক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমির সন্ধানে। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে চার্নক সুতানটি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এটাকেই তিনি ইংরেজদের শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন। এরপর হিজলীতে মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয়। চার্নক সেখানে যান। লড়াইয়ের শেষে চার্নক সুতানটিতে আবার ফিরে আসেন। তারপর মাদ্রাজে যান। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট

তারিখে আবার সুতানটিতে ফিরে আসেন এবং এখানেই ইংরেজদের শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ইংরেজরা মাত্র ষোল হাজার টাকায় কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেয়। এখানেই তাদের প্রথম দুর্গ ফোর্ট-উইলিয়াম নির্মাণ করে। এইভাবে ইংরেজ শাসনকালের ভাবী রাজধানী কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। (কলকাতা শহরের ইতিহাসের জন্য লেখকের "কলকাতার এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস", "৩০০ বছরের কলকাতা" ও "কলকাতার চালচিত্র" দেখুন)।

তারপর ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে ইংরেজরা ভাগীরথীর তীরে পলাশীর মাঠে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে। কিছুদিন পরে (১৭৬৫) সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দানের বিনিময়ে তারা বাংলা, বিহার ও উড়িশার দেওয়ানী পদও আদায় করে নেয়। এতে বাংলায় দ্বৈতশাসনের উদ্বোধন হয়। তারপর চলে ইংরেজদের শাসন ও শোষণ-লীলা। কোম্পানীর বিলাতের লোকেরা মোটা অঙ্কের মুনাফা পেলেই সন্তুষ্ট থাকত। আর এদিকে কোম্পানীর কর্মচারীরা অসৎ উপায়ে হাজার হাজার টাকা উপায় করত। টাকা উপায়ের জন্য তারা চালাতে লাগল এদেশের লোকের ওপর অত্যাচার ও প্রতিহিংসা। একবার তাদের কোপে পড়লে কারুরই রেহাই ছিল না। বিচার বলে কোন বস্তুই ছিল না। নির্দোষ নন্দকুমারের ফাঁসিই তার প্রমাণ। (লেখকের "আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী" দেখুন)।

দেওয়ানী পাবার পর ইংরেজরা তৎপর হয়ে ওঠে বাংলার শিল্পসমূহকে ধ্বংস করে এ দেশকে কাঁচামালের আড়তে পরিণত করতে। দেওয়ানী পাবার মাত্র চার বছর পরে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মার্চ তারিখে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত ডিরেক্টররা এখানকার কাউনসিলকে *আদেশ দেয়—'বাংলার রেশম বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করে মাত্র রেশম তৈরির ব্যবসাকে উৎসাহিত করা হোক।'* শীঘ্রই অনুরূপ নীতি তুলাজাত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজ এখান থেকে কাঁচামাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগে। আর সেই কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত দ্রব্য বাংলায় এনে বেচতে লাগে। বাংলা ক্রমশ গরীব

হয়ে পড়ে।

কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ায় বাঙলার জনগণের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়ায়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যা তো এখানে লেগেই আছে, সুতরাং যে বৎসর ভাল শস্য উৎপাদন হত না, সে বৎসর লোককে হয় অনশন, আর তা নয় তো দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হত।

সেদিন ইংরেজ একদিকে যেমন বাঙলার গ্রামগুলিকে হীন ও দীন করে তুলেছিল অপরদিকে তেমনই নগরে এবং তার আশেপাশে গড়ে তুলেছিল এক নূতন সমাজ। সে সমাজের অঙ্গ ছিল দেওয়ান, বেনিয়ান, ব্যবসাদার, ঠিকাদার, দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুনসী, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। শহরে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ, যার নাম হয় মধ্যবিত্ত সমাজ। কলকাতা শহরই এই সমাজের কেন্দ্রমণি হয়ে দাঁড়ায়। শহরটা এই রূপান্তরিত সমাজেরই যাদুঘরে পরিণত হয়। এই সমাজের শীর্ষে আবির্ভূত হয় মুষ্টিমেয় ধনী, যাদের 'বাবু সমাজ' বলা হত, যারা রাত্রে নিজ গৃহে থাকাটা মর্যাদার হানিকর মনে করত ও রাত্রিটা বারবনিতার ঘরে কাটাত, আর নীচের দিকে ছিল সাধারণ লোক— সাহেবরা যাদের বলত "ভদ্দর লোক"। এই সমাজের শীর্ষে বিলাসিতা ও জাঁক-জমকে মত্ত হয়ে থাকল ধনীরা, আর সাধারণ লোক মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ও শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শহরে এক শিক্ষিত শ্রেণী হয়ে দাঁড়াল। এই শিক্ষিত শ্রেণীই প্রতিবাদ জানাল সামাজিক বিকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ মূঢ়তার বিরুদ্ধে। সহমরণ বন্ধ হয়ে গেল (১৮২৯), বিধবাবিবাহ পেল আইনের স্বীকৃতি (১৮৫৬), সাগরমেলায় শিশুবলি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল (১৮৩০), দাসদাসীর হাট উঠে গেল (১৮৪৩), ও নানারূপ সামাজিক সংস্কার ও উন্নতি সাধনের ফলে সমাজ মুক্ত হল নানারূপ অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে। সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজের 'পাতি' দেওয়ার অধিকার বন্ধ হয়ে গেল, এবং 'পাতি' দেওয়া বিধানসভার একচেটিয়া অধিকারে দাঁড়াল। নানান জাতের লোক বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হল, এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজকে তা মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হল। মোটকথা, ইংরেজ আমলে বাঙালী সমাজ আদ্যোপান্ত রূপান্তরিত হল। এটা ঘটল বাঙালী সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও এক যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারার উদ্ভবের ফলে।

এগার

ইতিমধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটে গেল কলকাতার চেহারায়। ইংরেজ উঠে-পড়ে লাগল একে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীতে পরিণত করতে। ১৮২০-৪০ সময়কালের মধ্যে লটারী কমিটির উদ্যোগে এর রূপ খানিকটা পালটে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে 'ক্যালকাটা ইমপ্রুভ-মেণ্ট ট্রাস্ট অ্যাক্ট' পাশ হবার পর। তারপর এর চেহারা একেবারে পালটে গেল স্বাধীনতা-উত্তর যুগে **CMDA**-এর কর্মকাণ্ডে। কলকাতা মহানগরীতে পরিণত হবার পর হুড়হুড় করে এখানে আসতে লাগল অন্য রাজ্য থেকে অগণিত অবাঙালীর দল। তারাই আজ কলকাতার মালিক এবং তারাই বিপর্যস্ত করেছে বাঙলার জনজীবনকে।

বর্গীর হাঙ্গামা ঃ মহানিশার দুঃস্বপ্ন

বর্গীর হাঙ্গামা বাঙালী জীবনে এক মহানিশার দুঃস্বপ্ন। এ হাঙ্গামার প্রতিধ্বনি এখনও পর্যন্ত বাঙালী মায়েদের ছেলেমেয়েদের-ঘুম-পাড়ানো গানে সঞ্জীবিত হয়ে আছে। এটা ঘটেছিল আলিবর্দি খান যখন বাঙলার নবাব ছিলেন। বেরারের মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সমেত ভাস্কর পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তিকে বাঙলায় পাঠিয়েছিলেন চৌথ আদায় করবার জন্য। বাঙলার নবাব আলিবর্দি খান তখন ওড়িশা অভিযানে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে মারাঠাদের প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না, কেননা মারাঠারা ইত্যবসরেই ওড়িশার ভিতর দিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে বাঙালীরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে মারাঠাদের প্রতিহত করেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া মারাঠাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তরবারীর জোরে গ্রামসকল লুণ্ঠন করা। চতুর্দিকেই এতে এক সন্ত্রাস-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাঙলার লোক একে 'বর্গীর হাঙ্গামা' আখ্যা দেয়। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে এই হাঙ্গামা শুরু হয়, এবং প্রায় ন'বছর ধরে এই হাঙ্গামা চলে। সমসাময়িক তিনখানা বইয়ে আমরা বর্গীর হাঙ্গামার এক ভীতিপ্রদ চিত্র পাই। এই তিনখানা বইয়ের মধ্যে একখানা হচ্ছে গুপ্তপল্লীর প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রচিত 'চিত্রচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থ। তিনি প্রথমে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোন কারণে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ওপর রুষ্ট হলে তিনি বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে যান এবং তাঁর আদেশেই গদ্যেপদ্যে 'চিত্রচম্পূ' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৭৪৪। সুতরাং বইখানা বর্গীর হাঙ্গামার সমসাময়িক। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকাগারে (এখন এই পুস্তকাগারের নাম পরিবর্তিত হয়েছে) এই গ্রন্থের একখানা পুঁথি আছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—'বর্গীদিগের অতর্কিত আগমনের সংবাদে বাঙলার লোক বড়ই বিপন্ন ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। শকটে, শিবিকায়, উষ্ট্রে, অশ্বে, নৌকায় ও পদব্রজে সকলে পালাতে আরম্ভ করে। পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধোপরি 'সম্বালক' শিশু, গলদেশে দোদুল্যমান আরাধ্য শালগ্রামশিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 'দুর্বহ মহাভার' সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থ-

রাশির বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালস পলায়মান রমণীগণের নিদাঘ সূর্যের অসহনীয় তাপক্লেশ, যথাসময় পানাহারলাভে বঞ্চিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল শিশুগণের করুণ চীৎকারে ব্যথিত জননীগণের আর্তনাদ ও অসহ্য বেদনায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত।' আর একখানা গ্রন্থ হচ্ছে 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'। এখানা রচনা করেছিলেন কবি গঙ্গারাম দাস, ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-এ বর্ণিত হয়েছে—'কারু হাত কাটে কারু নাক কান। একই চোটে কারু বধে পরাণ॥ ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত লইয়া জা এ। অঙ্গুষ্টে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলা এ॥ একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে। রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥' বর্গীর হাঙ্গামাকে লক্ষ্য করে ভারতচন্দ্রও (১৭১২-১৭৬০) তাঁর 'অন্নদামঙ্গল'-এ (১৭৫২-৫৩) লিখেছেন—'লুঠি বাংলার লোক করিল কাঙ্গাল। গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল॥ কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি। লুঠিয়া লইল ধন ঝিউরী বহুড়ী॥'

সাধারণ লোকের মনে বর্গীর হাঙ্গামা এমন এক উৎকট ভীতি জাগিয়েছিল যে তা পরবর্তীকালে বাঙলার মেয়েদের মুখে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়ানো গানে প্রতিধ্বনিত হত।

বর্গীরা ভাগীরথী অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ শহর লুটপাট করে। জগৎশেঠের বাড় থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করে। ইংরেজদের কয়েকটা নৌকাও বর্গীরা লুটপাট করে। কলকাতার লোক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাঠের রক্ষাবেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও ভীতিগ্রস্ত হয়ে ইংরেজরা শহর সুরক্ষিত করবার জন্য দেশীয় বণিকদের সহায়তায় গঙ্গার দিক ছাড়া শহরের চারদিক ঘিরে 'মারাঠা ডিচ' নামে এক খাল খুঁড়তে আরম্ভ করে।

আলিবর্দি খান যখন ওড়িশা অভিযান থেকে ফিরছিলেন তখন বর্ধমান শহরে রাণীদীঘির কাছে বর্গীরা তাঁর শিবির অবরোধ করে। নবাব অতি কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। আলিবর্দি খান যখন মুর্শিদাবাদে আসেন, বর্গীরা তখন কাটোয়ায় পালিয়ে যায়। পূজার সময় বর্গীরা কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটায় দুর্গাপূজা করে। কিন্তু ওই পূজা অসমাপ্ত থাকে, কেননা নবমীর দিন আলিবর্দি খান অতর্কিত আক্রমণ করে তাঁদের তাড়িয়ে দেন। তারপর বালেশ্বরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠারা চিলকা হ্রদের দক্ষিণে পালিয়ে যায়।

পরের বছর (১৭৪৩) রঘুজী ভোঁসলে নিজে বাঙলাদেশ আক্রমণ করেন।

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে পেশওয়া বালাজী বাজীরাও বাঙলাদেশ থেকে বর্গীদের তাড়িয়ে দিতে সম্মত হন। আলিবর্দি খান স্বীকার করেন যে তিনি মারাঠা রাজা শাহুকে বাঙলাদেশের চৌথ এবং পেশওয়াকে যুদ্ধের খরচ বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দেবেন। পেশওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রঘুজী ভোঁসলে পালিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফল হল না। বর্গীরা প্রতি বছরই বাঙলাদেশে এসে উৎপাত করতে লাগল। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দি খান ভাস্কর পণ্ডিত ও তার সেনাপতিদের সন্ধির অছিলায় মুর্শিদাবাদের কাছে মানকরা নামক স্থানে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর বর্গীরা বছরখানেক হাঙ্গামা বন্ধ রাখে। কিন্তু তারপর হাঙ্গামা আবার শুরু হয়। শেষপর্যন্ত আলিবর্দি খান বর্গীদের সঙ্গে আর পেরে ওঠেননি, এবং সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী আলিবর্দি খান ওড়িশা বর্গীদের হাতে তুলে দেন। মারাঠারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা ওড়িশা থেকে সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে বাঙলাদেশে আর ঢুকবে না। জলেশ্বরের কাছে সুবর্ণরেখার পূর্বতীর পর্যন্ত আলিবর্দি খানের রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হয়। আলিবর্দি খান প্রতি বৎসর বাঙলাদেশের চৌথ হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন।

বর্গীর হাঙ্গামা নিয়ে বাঙলাদেশে অনেক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিল। বীরভূমের বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক কিংবদন্তী আছে যে এক যোগিনীসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দচন্দ্র গোস্বামী (যাঁকে বৈষ্ণবগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার ভাবেন) অলৌকিক শক্তিবলে বর্গীর হাঙ্গামা দমন করেছিলেন। আনানহিদ নামে একজন পীর সাহেবও বর্গীদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান। বীরভূমের রামপুরহাটের নিকট নলহাটিতে এক পাহাড়ের ওপর তাঁর স্মৃতি-সমাধি বর্তমান।

বাঙলা শস্যশ্যামলা হলেও, দুর্ভিক্ষ বাঙালীকে প্রায়ই বিব্রত করেছে। মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়েও বাঙলা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হয়েছিল। তারপর বহুবার হয়েছে। এখনও হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ন্যায় মর্মান্তিক ঘটনা, আর কখনও ঘটেনি। মন্বন্তর বাঙলাদেশকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করেছিল যে পরবর্তী কালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙলার লোকের কাছে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নরূপ কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল। সমসাময়িক দলিলসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত নিজ অনুশীলনের ভিত্তিতে লিখিত ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টার তাঁর 'অ্যানলস্ অভ রুরাল বেঙ্গল' বইতে এর এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। হাণ্টারের বর্ণনা—'১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের প্রবল উত্তাপে মানুষ মরিতে লাগিল। কৃষক গরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, তারপর ছেলেমেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ক্রেতা নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। তারপর মৃতের মাংস খাইতে লাগিল। সারাদিন সারারাত্রি অভুক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ বড় বড় শহরের দিকে ছুটিল। তারপর মহামারী দেখা দিল। লোকে বসন্তে মরিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের নবাবপ্রাসাদও বাদ গেল না। বসন্তে নবাবজাদা সইফুজ্জের মৃত্যু ঘটিল। রাস্তায় মৃত ও নির্জীব শবে পূর্ণ হইয়া পাহাড়ে পরিণত হইল। শৃগাল কুকুরের মেলা বসিয়া গেল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।' অনুরূপ বর্ণনা বঙ্কিমও তার 'আনন্দমঠ'-এ দিয়েছেন। বঙ্কিম লিখেছেন—'১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল।...সম্মুখে মন্বন্তর লোক রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল বেচিল, জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রীকে কেনে এমন খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল তাহারা

বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল, যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল, গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল।'

লর্ড মেকলেও তাঁর বর্ণাঢ্য ভাষায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এক করুণ চিত্র দিয়েছেন—

"In the summer of 1770 the rains failed ; the earth was parched up ; and a famine, such as is known only in the countries where every household depends for support on its own little patch of cultivation filled the whole valley of the Ganges with misery and death. Tender and delicate women, whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner chambers in which Eastern zealousy had kept watch over their beauty, threw themselves on the earth before the passerby, and, with loud wailings, implored a handful of rice for their children. The Hooghly everyday rolled down thousands of corpses close to the porticos and gardens of the English conquerors. The very streets of Calcutta were blocked up by the dying and dead. The lean and feeble survivors had not energy enough to bear the bodies of their kindred to the funeral pyre or to the holy river or even to scare away jackals and vultures who fed on human remains in the face of the day ...It was rumoured that the Company's servants had created the famine by engrossing all the rice of the country." (Macaulay in essay on 'Clive' quoted in A. K Sur's 'History & Culture of Bengal' 1963, pages 177-178 ; 1993).

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল অনাবৃষ্টির জন্য। তার আগের বছরেও বৃষ্টির স্বল্পতার জন্য ফসল কম হয়েছিল। তার জন্য চাউল মহার্ঘ্য হয়েছিল। কিন্তু লোক না খেয়ে মরেনি। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় লোক না খেয়ে মরেছিল। তার কারণ, যা চাউল বাজারে ছিল, তা কোম্পানি আকালের

আশঙ্কায় সিপাইদের জন্ত বাজার থেকে কিনে নিয়েছিল। কোম্পানি যখন চাউল কিনতে শুরু করল, তখন তারই পদাঙ্কে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যারা গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত, তারাও লাভের প্রত্যাশায় চাউল কিনে মজুত করল। সমসাময়িক এক বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে কোম্পানির যে কর্মচারীর এক বৎসর পূর্বে ১০০ পাউণ্ডেরও সংস্থান ছিল না, পর বৎসর সে ৬০,০০০ পাউণ্ড দেশে পাঠাল।

দুই

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রকোপে বাঙলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল। আর কৃষকদের মধ্যে মারা গিয়েছিল শতকরা ৫০ জন। জনবহুল গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। বীরভূমের বহু গ্রাম এমন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল যে এই ঘটনার পর দশ বছর সৈন্তদের পক্ষে সে সকল স্থান অতিক্রম করা সম্পূর্ণভাবে দুরুহ হয়ে উঠেছিল। এত কৃষক মারা গিয়েছিল যে মন্বন্তরের পর নিজ নিজ জমিতে চাষী বসাবার জন্ত জমিদারদের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটেছিল। তখন থেকেই বাঙলাদেশে খোদকস্ত রায়ত অপেক্ষা পাইকস্ত রায়তের সংখ্যা বেড়ে যায়।

মন্বন্তরে সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত হয়েছিল জমিদাররা। কেননা, এই সময় বাঙলার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ শতকরা দশটাকা হারে রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার ফলে বাঙলায় কান্নার কোলাহল পড়ে গিয়েছিল। একে তো মন্বন্তরের বছর। লোক না খেতে পেয়েই মরে যাচ্ছে। জমিদারকে তারা খাজনা দেবে কি করে? জমিদারও প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা না পেলে সরকারে রাজস্ব জমা দেবে কেমন করে? জমিদারদের ওপরই গিয়ে পড়ল চূড়ান্ত নির্যাতন। তাদের উলঙ্গ করে বিছুটির চাবুক মেরে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দেওয়া হল। তারপর অচৈতন্ত অবস্থায় তাদের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। শুধু তাই নয়। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ও পিতার সামনে কন্তাকে বিবস্ত্রা করে শুরু হল নিষ্ঠুর নির্যাতন। বর্ধমানের মহারাজা, নদীয়ার মহারাজা, নাটোরের রানী ভবানী, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের যে কি দুর্গতি হয়েছিল, সেসব হাণ্টার তার 'অ্যানালস অভ্ রুরাল বেঙ্গল' বইয়ে লিখে গিয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় জনগণ যে ক্ষিপ্ত হয়ে একটা সমাজবিপ্লব ঘটাবে তা বলাই বাহুল্য মাত্র। হাণ্টার

বলেছেন—'অরাজকতা প্রসব করে অরাজকতা এবং বাঙলার দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সম্প্রদায় আগামী শীতকালের খাদ্যফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে ও দস্যুদ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে, নিজেরাই দস্যুতে পরিণত হল। যারা প্রতিবেশীর নিকট আদর্শ চরিত্রের লোক বলে পরিগণিত হত, সে সকল কৃষকও পেটের দায়ে ডাকাতে পরিণত হল এবং সন্ন্যাসীর দল গঠন করল। তাদের দমন করবার জন্য যখন ইংরেজ কালেক্টররা সামরিকবাহিনী পাঠাল, তখন এক এক দলে পঞ্চাশ হাজার সন্ন্যাসী, সিপাইদের নস্যাৎ করে দিল। মন্বন্তর এবং তার পরবর্তী কয়েক বছর এরূপই চলল। পরে অবশ্য ইংরেজদের হাতে তারা পরাভূত হল।' এটা সবই হাণ্টারের কাহিনী। এই কাহিনীকেই পল্লবিত করে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে 'আনন্দমঠ'-এর রূপ দিয়েছিলেন।

তিন

মন্বন্তর মাত্র এক বছরের ঘটনা। কিন্তু তার জের চলেছিল বেশ কয়েক বছর। মন্বন্তরের পরের দু'বছরে বাঙলা আবার শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছিল। লোক পেট ভরে খেতে পেল বটে, কিন্তু লোকের আর্থিক দুর্গতি চরমে গিয়ে পৌঁছাল। অত্যধিক শস্য ফলনের ফলে কৃষিপণ্যের দাম এমন নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছাল যে হাণ্টার বলেছেন—'হাটে শস্য নিয়ে গিয়ে বেচে গাড়িভাড়া তোলাও দায় হল।' সুতরাং বাঙলার কৃষক নিঃস্বই থেকে গেল। এদিকে খাজনা আদায় পুরাদমে চলতে লাগল, এবং তার জন্য নির্যাতনও বাড়তে লাগল। কিন্তু নির্যাতনের পরেও আধা রাজস্ব আদায় হল না। এটা পরবর্তী কয়েক বছরের খাজনা আদায়ের পরিমাণ থেকে বুঝতে পারা যাবে।

বৎসর	দেয় রাজস্ব (পাউণ্ডে লিখিত)	আদায়ীকৃত রাজস্ব
১৭৭২	৯৯,৪১০	৫৫,২৩৭
১৭৭৩	১০৩,০৮৯	৬২,৩৬৫
১৭৭৪	১০১,৭৯৯	৫২,৫৬৩
১৭৭৫	১০০,৯৮০	৫৬,৯৯৭
১৭৭৬	১১১,৪০২	৬৩,৩৫০

যেখানে উৎপন্ন শস্য হাটে নিয়ে গিয়ে বেচতে গেলে, গাড়িভাড়াই ওঠে না,

সেক্ষেত্রে নিঃস্ব কৃষক খাজনা দেবে কি করে ? উপরে যে আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ দেখানো হয়েছে, তা হচ্ছে নির্যাতন-লব্ধ খাজনা। সুতরাং নির্যাতন-লব্ধ খাজনা সন্ন্যাসীরা লুঠ করতে লাগল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এই ছিল এদের ধর্ম। সন্ন্যাসীদের এরূপ সংগঠন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অনেক আগে থেকেই ছিল। এরূপ এক মঠাধ্যক্ষই রক্ষা করেছিল রানী ভবানীর বালবিধবা সুন্দরী কন্যা তারাসুন্দরীকে সিরাজের কুৎসিত কামলালসা থেকে।

সন্ন্যাসীদের একজন মঠাধ্যক্ষ কৃপানাথ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রংপুরের বিশাল 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল' অধিকার করেন। তাঁর ২২ জন সহকারী সেনাপতি ছিল। রংপুরের কালেকটর ম্যাকডোয়াল পরিচালিত বিরাট সৈন্যবাহিনী দ্বারা জঙ্গল ঘেরাও হলে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীগণ বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যায়।

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হলেও এতে ফকির সম্প্রদায়ও যোগ দিয়েছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আরও যাঁরা প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ইমামবাড়ী শাহ, জয়রাম, জহরী শাহ, দর্পদেব, বুদ্ধু শাহ, মজনু শাহ, মুসা শাহ, রামানন্দ গোঁসাই, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী ও সোভান আলি। (পরে দেখুন)

১৭৫

কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এই দুর্যোগের সময় ইংরেজরা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নবিলাসে মত্ত হয়ে, দক্ষিণ ভারতের যুদ্ধসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার আর্থিক সম্পত্তি নিম্নদিকে এমনই স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে এক সমসাময়িক প্রতিবেদনে বলা হল—"the company seemed on the verge of ruin"। কিন্তু দেশের এই শোচনীয় অবস্থা হলেও, কোম্পানির কর্মচারীরা (তাদের 'নবাব' আখ্যা দেওয়া হত) স্বদেশে ফেরবার সময় প্রচুর অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এটা বিলাতের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়ালো না, এবং তারা বিলাতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেন্টে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করলেন যথা রেগুলেটিং অ্যাক্ট, পিটস্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ইত্যাদি।

পাঁচ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছিল বাঙালীর বিদ্রোহী মানসিকতার। এই সময়ের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ হচ্ছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। আগেই বলেছি এটা ঘটেছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায়। এই বিদ্রোহেহ আমরা এক মহিলাকে নেতৃত্ব করতে দেখি। সেই মহিলা হচ্ছে দেবী চৌধুরানী। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা হচ্ছে ভবানী পাঠক। দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। দুর্গাপুরের নিকট ভবানী পাঠকের টিলা ভবানী পাঠকের মূল ঘাটি ছিল। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজদের কাছে অভিযোগ আসে যে ভবানী পাঠক নামে এক ব্যক্তি তাদের নৌকা লুঠ করেছে। ইংরেজরা তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে বন্দী করতে সক্ষম হয় না। ভবানী পাঠক ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার করেন। দেবী চৌধুরানীর সহায়তায় তিনি ইংরেজদের ওপর হামলা চালান। তার ফলে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। লেফটানেন্ট ব্রেনোর নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজবাহিনী তাকে এক ভীষণ জল-যুদ্ধে পরাজিত করে ও ভবানী পাঠক নিহত হন। উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিল ফকির সম্প্রদায়ের মজনু শাহ। মজনুর কার্যকলাপে উত্তর-বঙ্গ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় ইংরেজরা নাস্তানাবুদ হয়। সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে তাকে দমন করা সম্ভবপর হয় না। ভবানী পাঠকের সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে মজনুর ফকির দলের একবার সংঘর্ষ হলেও, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েই নিজেদের কার্যকলাপ চালাত। তাদের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত ছিল জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় করা, ইংরেজ সরকারের কোষাগার লুণ্ঠন করা ইত্যাদি। তবে জনসাধারণের ওপর তারা অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ করত না। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে মজনু পাঁচশত সৈন্যসহ বগুড়া জেলা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করবার পথে কালেশ্বর নামক জায়গায় ইংরেজবাহিনী কর্তৃক মারাত্মকভাবে আহত হয়, মজনুর দল বিহারের সীমান্তে পালিয়ে যায়। মাখনপুর নামক স্থানে মজনুর মৃত্যু হয়।

সন্ন্যাসীদের একজন মঠাধ্যক্ষ কৃপানাথের কথা আমরা আগেই বলেছি। বাইশ জন সহকারী সেনাপতিসহ তিনি রংপুরে ইংরেজবাহিনীদ্বারা ঘেরাও হলে বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যান।

উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অপর একজন নেতা ছিলেন দর্পদেব। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে তিনি এক খণ্ডযুদ্ধ করেন।

কোচবিহারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন রামানন্দ গোঁসাই। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে দিনহাটা নামক স্থানে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে লেফটানেণ্ট মরিসনের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ইংরেজবাহিনীর তুলনায় অস্ত্রশস্ত্র স্বল্প ও নিকৃষ্ট থাকায় তিনি গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে মরিসনের বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। ইংরেজবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। এই বিদ্রোহের শেষ পর্বের যাঁরা নায়ক ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় ইমামবাড়ী শাহ, বুদ্ধু শাহ, জহরী শাহ, মুসা শাহ, সোভান আলি প্রমুখ। আরও একজন ছিলেন, তাঁর নাম জয়রাম। তিনি ছিলেন একজন এদেশীয় সুবেদার। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসীবাহিনীর যে সংগ্রাম হয়, তাতে তিনি কয়েকজন সিপাহ-সহ সন্ন্যাসীদের সাহায্য করেছিলেন। সেই যুদ্ধে ইংরেজবাহিনী পরাজিত হয়েছিল। জয়রাম কিন্তু ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। ইংরেজরা তাঁকে কামানের তোপে হত্যা করে।

ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অপর একজন নেতা জহরী শাহও ধরা পড়ে। বিদ্রোহের অপরাধে তাকে ১৮ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শেষ পর্বের শ্রেষ্ঠতম নায়ক ছিল মুসা শাহ। তিনি ছিলেন মজনু শাহের যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে মজনুর মৃত্যুর পর তিনিই বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করেন। সেখানে রাণী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনী তাঁর প্রতিরোধ করে। কিন্তু মুসা বরকন্দাজ বাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে লেফটানেণ্ট ক্রিস্টির নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী মুসাকে আক্রমণ করে। ইংরেজবাহিনী মুসার পশ্চাদ্ধাবন করেও তাঁকে বন্দী করতে পারে না। পরে ফেরাগুল শাহের সঙ্গে মুসার নেতৃত্ব নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয়, সে দ্বন্দ্বে মুসা ফেরাগুলের হাতে নিহত হন।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শেষ পর্বের অপর এক প্রধান নেতা ছিলেন সোভান আলি। একসময় তিনি বাঙলা, বিহার ও নেপালের সীমান্ত জুড়ে এক বিরাট এলাকায় ইংরেজশাসক ও জমিদারগোষ্ঠীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

দিনাজপুর মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় ইংরেজকুঠি ও জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সময় তাঁর সহকারী জহুরী শাহ ও মতিউল্লা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পালিয়ে গিয়ে তিনি আমুদী শাহ নামে এক ফকির নায়কের দলে যোগ দেন। কিন্তু ইংরেজদের হাতে এরাও পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পর ৩০০ অনুচর নিয়ে ১৭৯৭-১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তিনি ছোট ছোট আক্রমণ চালান। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ইংরেজ সরকার চার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। তাঁর শেষজীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

শেষপর্যন্ত ইমামবাড়ী শাহ ও বুদ্ধু শাহ বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড্ডীন রেখেছিলেন।

একদিকে যেমন 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' চলছিল, অপরদিকে তেমনই ইংরেজশাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে গণ-আন্দোলনও চলছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬০, ১৭৮৩), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৮৩-৯৫), ঘরুই বিদ্রোহ (১৭৭৩), হাতিখেদা বিদ্রোহ (১৭৯৯), বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া গ্রামের বিদ্রোহ (১৭৯২), ত্রিপুরার রোশনাবাদ পরগনায় সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৭০), ও তন্তুবায়দের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তন্তুবায়দের বিদ্রোহ (১৭৭৮)।

ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকেই বরাভূম ও মানভূম অঞ্চলে জমির মালিকানা স্বত্ব ও জমিদারদের খাজনা আদায় পদ্ধতি নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ প্রকাশ পায়। ইংরেজ যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে একদল রাজভক্ত জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে, তখন থেকেই ওটা বাধা পায় ওইসব অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াড় বিদ্রোহ ও বাগড়ি নায়েক বিদ্রোহ ঘটে। বাগড়ি বিদ্রোহের নেতা ছিল অচল সিংহ, আর চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক ছিল গোবর্ধন দিক্‌পতি। চুয়াড় বিদ্রোহের সূচনা হয় মেদিনীপুরে কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর। অজিত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্নী রানী ভবানী ও রানী শিরোমণি জমিদারী পরিচালনা করেন। তাদের সময়ে সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর ফলে জঙ্গলের চুয়াড়গণ গোবর্ধন

দিকপতি নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কর্ণগড় আক্রমণ করে (১৭৬০)। রানীরা ভীত হয়ে নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচন খানের আশ্রয় নেন। ত্রিলোচন খান চুয়াড়দের পরাস্ত করেন। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে আবার দ্বিতীয়বার চুয়াড় বিদ্রোহ হয়। দিকপতির নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ বিদ্রোহীর এক বাহিনী চন্দ্রকোণা পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুর আক্রমন ও লুণ্ঠন করে। ইংরেজ সরকার রানী শিরোমণিকে এই বিদ্রোহের নেত্রী ভেবে তাঁকে কলকাতায় এনে বন্দী করে রাখে। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিছুদিন অবস্থা শান্ত হলেও মেদিনীপুরের শালবনি অঞ্চলে ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে বাগড়ি বিদ্রোহ হয়। অচলসিংহ এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। বহু প্রাণ বিনষ্ট করেও সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হননি। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে আবার অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তন্তুবায়দের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তন্তুবায়রা বিদ্রোহ করে। ইতিহাসে একে তন্তুবায় আন্দোলন বলা হয়। শান্তিপুরে এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিল বিজয়রাম ও ঢাকায় দুনিরাম পাল। এদের পর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় লোচন দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল, রামরাম দাস, বোষ্টমদাস প্রভৃতি। ইংরেজ বণিকদের শর্ত মেনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করায় ইংরেজরা বোষ্টমদাসকে তাদের কুঠিতে আটক করে তার ওপর অত্যাচার করে। সেই অত্যাচারের ফলে বোষ্টমদাস মারা যায়।

চাকমা উপজাতির মধ্যেও একাধিকবার বিদ্রোহ হয়। প্রথম চাকমা বিদ্রোহের (১৭৭৬-৭৭) নায়ক ছিল রামুখাঁ। রামু চাকমা জাতিকে একত্রিত করে প্রথম কার্পাস কর দেওয়া বন্ধ করে ও তার সঙ্গে ইংরেজদের বড় বড় ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। ইংরেজবাহিনী এসে এই বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহে চাকমা দলপতি শের দৌলত অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর শের দৌলতের ছেলে জান বকস্ খাঁ দ্বিতীয় চাকমা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। তার সময় (১৭৮৩-৮৫ খ্রীস্টাব্দে) কোন ইজারাদারই চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি। বহুদিন সে স্বাধীনভাবে শাসন করেছিল।

এই সময়ের (১৭৯৩) আর এক বিদ্রোহ হচ্ছে দক্ষিণ বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া গ্রামের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতা ছিল বোলাকি শাহ। সুবান্দিয়া গ্রামের চাষীদের নিয়ে সে এক সৈন্যদল গঠন করে। একটা দুর্গও তৈরি করে। সেখানে

মুঘলদের পরিত্যক্ত সাতটা কামান বসিয়ে ইংরেজ সরকার ও জমিদারবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সে আত্মগোপন করে।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে সন্দীপের জমিদার আবু তোরাপ খাঁ অন্যান্য জমিদারদের বিতাড়িত করে ইংরেজ নিয়োজিত সন্দীপের ক্ষমতাশালী রাজস্ব-সচিব গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরেজ সৈন্য দ্বারা এই বিদ্রোহ দমিত হয়।

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগনার কৃষকরা সমশের গাজী নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সমশের কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর দখল করে ও সেখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কৃষকদের মধ্যে জমিবন্টন ও কর মকুব, জলাশয় খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করে। নবাব মীরকাশিম ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় সমশের বাহিনীকে পরাজিত করে। সমশেরকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আনা হয়। পরে নবাবের হুকুমে তাকে তোপের মুখে ফেলে হত্যা করা হয়।

এ সময়ে মেদিনীপুরের ধরুই উপজাতিরা বিদ্রোহ করে। দুবার বিদ্রোহ হয়। প্রথমবার জমিদার শত্রুঘ্ন চৌধুরীর পুত্র নরহর চৌধুরী রাত্রিতে নিরস্ত্র ধরুইদের এক সমাবেশের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৭০০ ধরুইকে হত্যা করে। দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ হয় ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে। এবারও ঠিক আগের মতই রাত্রিকালে আক্রমণ চালিয়ে বহু ধরুইকে হত্যা করা হয়।

পূর্বাঞ্চলের উপজাতি গারো-হাজংদের মধ্যেও বিদ্রোহ প্রকাশ পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ইতিহাসে এটা হাতিখেদা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এর নেতৃত্ব করে হাজং সরদার। জমিদাররা কোনপ্রকারে তাকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করে। তাতে গারো-হাজংদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন কিন্তু নিভে যায় না। কেননা, ওরই পরম্পরায় ঘটে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের গারো হাঙ্গামা, ১৮২৭ ৩২ খ্রীস্টাব্দের সেরপুরের বিদ্রোহ ও ১৮৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দের গারো হাঙ্গামা। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ছপাতি পাগলা নামে এক ব্যক্তি গারো অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির লোকেদের বশীভূত করে একটি স্বাধীন গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। যদিও তার চেষ্টা সফল হয়নি, তা হলেও তারই সম্প্রদায়ভুক্ত গারো-হাজংদের সর্দার টিপু নিপীড়ক জমিদারদের হাত থেকে

কৃষকদের বাঁচাবার জন্য এক সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করে ঘোষণা করে যে বিঘা পিছু চার আনার বেশী কর দেওয়া হবে না। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে সেরপুরের জমিদার টিপুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ইংরেজ কালেকটর ড্যামপিয়েরের সাহায্য প্রার্থনা করে। টিপু 'জরিপাগড়' নামে এক পুরাণো কেল্লায় গিয়ে রাজা হয়ে বসে। ড্যামপিয়ের তাকে গ্রেপ্তার করলে সে সংজীবন যাপনের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তি পায়। কিন্তু ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে যখন হাঙ্গামার আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তখন তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় ও ময়মনসিংহের সেশন জজের বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কারাবাসকালেই তার মৃত্যু হয়। টিপুর আন্দোলনের আরও দুজন নায়ক ছিল, দেবরাজ পাথর ও জানকু পাথর। এরাই পরে সেরপুরের আন্দোলন চালিয়েছিল। সেরপুরের পশ্চিম দিকে কড়িবাড়ি পাহাড়ের পাদদেশে তাদের প্রধান আস্তানা ছিল। শেষের দিকে (১৮৩২-৩৩) আর যারা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিল তাদের মধ্যে ছিল গুমাকু সরকার ও উজ্জী সরকার।

এই সময় আরও ঘটে তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১) বিদ্রোহ। তিতুমীরের বিদ্রোহের (১৮৩০-৩১) উদ্দেশ্য ছিল জমিদার ও নীলকর সাহেবদের উৎসাদন করা ও ভূমিজ কর হ্রাস করা। চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া গ্রামে তার জন্ম। দাঙ্গা-হাঙ্গামার অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর তিতু মক্কায় যায় ও সেখানে ওয়াহাবি নেতা সৈয়দ আহম্মদের কাছে ওয়াহাবি আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরে। বারাসত থেকে এক বিস্তৃত অঞ্চলে তার আন্দোলন প্রসারিত হয়। নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারে সাধারণ চাষীরা বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। তিতু তাদেরই নেতৃত্ব দিয়ে জনশক্তিকে সংহত করবার চেষ্টা করে। গরীব চাষী ও তাঁতীরাই তার অনুগামী হয়। পুঁড়া, টাকী, গোবরডাঙ্গা, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদারদের বাড়ী আক্রমণ করে তিতু তাদের কাছ থেকে কর দাবী করে। গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার তিতুর হাতে নিহত হয়। তারপর নারিকেলবেড়িয়ায় তিতু এক বাঁশের কেল্লা তৈরী করে পাঁচশ অনুগামীর সঙ্গে সেখানে বাস করতে শুরু করে ও নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে যে সৈন্যদল আসে, তারা তিতুর কাছে পরাজিত হয়। তারপর ইংরেজরা অশ্বারোহী সৈন্য ও কামানের সাহায্যে তিতুর দুর্গ ধ্বংস করে ও তিতুকে যুদ্ধে নিহত করে।

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ত্রিপুরা বিদ্রোহের নায়ক ছিল কীর্তি। ত্রিপুরার যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের চক্রান্তে গুপ্তঘাতকের হাতে কীর্তি নিহত হয়। ফরাজী আন্দোলনের নেতা ছিল ফরাজী ধর্মমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লার ছেলে দুদুমিঞা। তার উদ্দেশ্য ছিল এদেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, নীলকর সাহেবদের কুঠি পুড়িয়ে দেওয়া ও জমিদারদের খতম করা। জনসাধারণের ওপর থেকে কর বিলোপ করে দুদুমিঞা শোষক শ্রেণীর কাছ থেকে কর আদায় করত ও গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে আদালত স্থাপন করে বিচারকার্য চালাত। আন্দোলনটা ফরিদপুর জেলার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ওখানে পাঁচচর গ্রামের নীলকর ডানলপ সাহেবের কুঠি পুড়িয়ে দেওয়া হয় ও জমিদার গোপীমোহনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দুদুমিঞা বেঁচে ছিল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় তাকে রাজবন্দী হিসাবে আটক করে রাখা হয়। দীর্ঘ কারাবাসের ফলেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

১৮৫৪ ৫৬ খ্রীস্টাব্দে ঘটে 'খেরওয়ারী হুল' বা সাঁওতাল বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। তৎকালীন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত দামিন ই-কো অঞ্চল হতে বীরভূম পর্যন্ত অঞ্চলে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ চলতে থাকে। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জুন গোক্কো ও বীর সিং নামে দুই দলপতির নেতৃত্বে সাঁওতালরা পাঁচখেতিয়ার বাজারে উপস্থিত হয়ে নির্বিচারে লুণ্ঠন এবং দারোগা ও মহাজনদের হত্যা করে। ক্রমশ বিদ্রোহ বীরভূম অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হয়। সরকার প্রথম বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বলে ও পরে সামরিক আইন জারি করে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে দলপতি সিধু, চাঁদ ও ভৈরব ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে পনেরো থেকে পচিশ হাজার সাঁওতাল নিহত হয়। অচিরেই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। এরপর ব্রিটিশ সরকার স্বতন্ত্র সাঁওতাল পরগনা গঠন করেন, কিন্তু রাজস্ব হ্রাস করেন না।

এরই অব্যবহিত পরে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ঘটে; যার ফলে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায়।

সামন্ততন্ত্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

পাঠান আমলে বাঙলা ৫৫৮ মহাল-বিশিষ্ট ১৯ সরকারে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ মহালই জায়গীরদারদের অধীনস্থ ছিল। পাঠান শক্তির পতনের পর সম্রাট আকবরের আমলে মানসিংহ যখন বাঙলা জয় করে, তখন মানসিংহের সমসাময়িক মুঘল রাজস্বসচিব তোদরমলের 'আসল-ই-জমা-তুমার' থেকে আমরা জানতে পারি যে সম্রাট আকবরের সময় সমগ্র বাঙলা দেশ ৬৮৯ মহাল-বিশিষ্ট ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। তখন বাঙলা থেকে রাজস্ব আদায় হত ৮,২৮,২৫০ টাকা। কিন্তু কালক্রমে হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, কোচবিহারের কিছু অংশ, পশ্চিমে আসাম ও ত্রিপুরা বাঙলার সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় বাঙলা ১৩৫০ মহাল বা পরগনা বিশিষ্ট ৩৪টি সরকারে বিভক্ত হয় এবং রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায়, ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। এই রাষ্ট্রীয় বিন্যাসই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বলবৎ ছিল। কিন্তু মুরশিদকুলি খান যখন নবাবী আমলের উদ্বোধন করল, তখন এর পরিবর্তন ঘটল। ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত 'জমা-ই-কামিল-তুমার' অনুযায়ী বাঙলাদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করা হল। তখন মহাল বা পরগনার সংখ্যা ছিল ১৬৬০ ও রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা।

এই ১৬৬৯ মহাল বা পরগনার সব মহাল অবশ্য সমান আকারের ছিল না। কোন কোনটা খুব বড়, যার বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ টাকা। আবার কোন কোনটা খুবই ছোট, এত ছোট যে রাজদরবারে দেয় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র পঁচিশ টাকা। এই সকল ছোট-বড় মহালগুলি যাদের অধীনে ছিল, তারা নানা অভিধা বহন করত, যথা জমিদার, ইজারাদার ঘাটওয়াল, তালুকদার, পত্তনিদার, মহলদার, জোতদার, গাঁতিদার ইত্যাদি। বড় বড় মহালগুলি জমিদারদেরই অধীনস্থ ছিল। এ সকল জমিদারীর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বড়, সেসব জমিদারদের প্রায় সামন্তরাজার মতো আধিপত্য ছিল। দিল্লীর বাদশাহ তাদের রাজা, মহারাজা, খান, সুলতান প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করতেন। তারাই ছিল সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক। দেশীয় রাজগণ অনেক পরিমাণে সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাঁদের

দেয় রাজস্ব দিলেই তাঁরা স্বীয় অধিকারমধ্যে যথেচ্ছ বাস করতে পারতেন। সুতরাং তাঁরা পাত্র, মিত্র, সভাসদে পরিবেষ্টিত হয়ে সুখেই বাস করতেন।

দুই

এরূপ জমিদারদের অন্যতম ছিল জঙ্গলমহল ও গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজারা, বাঁকুড়ার মল্লরাজগণ, বর্ধমানের ক্ষত্রিয় রাজবংশ, চন্দ্রকোণার ব্রাহ্মণ রাজারা নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজবংশ, নাটোরের ব্রাহ্মণ রাজবংশ ও আরও অনেকে।

জঙ্গলমহলের রাজাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন নারায়ণগড়, নাড়াজোল ও কর্ণগড়ের রাজারা। এর মধ্যে নারায়ণগড়ের আয়তন ছিল ৮১,২৫৪ একর বা ২২৬,৯৬ বর্গমাইল, আর নাড়াজোলের ছিল ৮,৯৯৭ একর বা ১৪'০৫ বর্গ-মাইল। সুতরাং নারায়ণগড়ই বড় রাজ্য ছিল। কিংবদন্তী অনুযায়ী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্বপাল। তিনি বর্ধমানের গড় অমরাবতীর নিকটবর্তী দিগ্‌নগর গ্রাম থেকে এসে নারায়ণগড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ৭ জানুয়ারী তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর মিস্টার এচ. বি. বেইলী লিখিত এক 'মেমো-রাণ্ডাম' থেকে আমরা জানতে পারি যে নারায়ণগড়ের রাজারাই ছিলেন জঙ্গল-মহলের প্রধানতম জমিদার। তাঁদের কুলজীতে ৩০ পুরুষের নাম আছে। তাঁরা খুরদার রাজার কাছ থেকে 'শ্রীচন্দন' ও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে 'মাড়ি সুলতান' উপাধি পেয়েছিলেন। বেইলী সাহেব এই দুই উপাধি পাবার কারণও উল্লেখ করে গিয়েছেন। যে চন্দনকাষ্ঠ দিয়ে পুরীর জগন্নাথদেবের বিগ্রহ তৈরি হত, তা নারায়ণগড়ের রাজারা সরবরাহ করতেন বলেই খুরদার রাজা তাঁদের 'শ্রীচন্দন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। 'মাড়ি সুলতান' মানে 'পথের মালিক'। শাহজাদা খুররম (উত্তরকালের সম্রাট শাহজাহান) যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, তখন সম্রাটসৈন্যদ্বারা পরাজিত হয়ে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে পলায়ন করতে গিয়ে দেখেন যে ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পলায়ন করা অসম্ভব। তখন নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যে তাঁর গমনের জন্য পথ তৈরি করে দেন। এই উপকারের কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান রক্তচন্দনে পাঁচ আঙুলের ছাপবিশিষ্ট এক সনদ দ্বারা তাঁকে 'মাড়ি সুলতান' বা 'পথের মালিক' উপাধি দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাঙ্গামার সময় ও ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাদের বিরুদ্ধে নারায়ণগড়ের রাজারা ইংরেজদের সাহায্য

করেছিলেন। বেইলী সাহেব নারায়ণগড়ের তৎকালীন ২৫ বৎসর বয়স্ক রাজার জনহিতকর কাজের জন্ত খুব প্রশংসা করে গিয়েছেন।

কিংবদন্তী অনুযায়ী কর্ণগড়ের রাজারা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমানের নীলপুর থেকে মেদিনীপুরে আসেন। প্রথম যিনি আসেন তিনি হচ্ছেন রাজা লক্ষ্মণসিংহ (১৫৬৮-১৬৬১ খ্রীস্টাব্দ)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা কর্ণগড়ের রাজা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রাজা রামসিংহ (১৬৯৩-১৭১১), রাজা যশোমন্ত সিংহ (১৭২২-১৭৪৮), রাজা অজিত সিংহ (১৭৪৯-১৭৫৬), ও রানী শিরোমণি (১৭৫৬-১৮১২)। রাজা রামসিংহের আমলেই মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, তাঁর জন্মস্থান যদুপুর থেকে শোভাসিংহের ভাই হিমতসিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কর্ণগড়ে এসে বাস করেন। রাজা যশোমন্ত সিংহের আমলে কর্ণগড়ের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪০,১২৩ টাকা ১২ আনা ও তাঁর সৈন্য-সংখ্যা ছিল ১৫,০০০। তৎকালীন জঙ্গলমহলের প্রায় সমস্ত রাজা তাঁর অধীনতা স্বীকার করত। রানী শিরোমণির আমলে প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটে এবং যদিও যশোমন্ত সিংহের মাতুল নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচন খানের দ্বারা চুয়াড়রা পরাহত হয়, তা হলেও দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকার রানী শিরোমণিকে ওই বিদ্রোহের নেতা ভেবে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ এপ্রিল তাঁকে তাঁর অমাত্য চুনিলাল খান ও নীরু বকশীসহ বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে আসে। কর্ণগড় ইংরেজ সৈন্যদল কর্তৃক লুন্ঠিত হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মুক্ত হবার পর রানী শিরোমণি আর কর্ণগড়ে বাস করেননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মেদিনীপুরের আবাসগড়ে বাস করে এই নির্ভীক রমণী ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে মারা যান। তারপর কর্ণগড় নাড়াজোল বংশের অধীনে চলে যায়।

নাড়াজোল রাজবংশের আদিপুরুষ হচ্ছেন উদয়নারায়ণ ঘোষ। উদয়নারায়ণের প্রপৌত্রের ছেলে কার্তিরাম মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে 'রায়' উপাধি পান। তাঁর পর তিন পুরুষ ধরে ওই বংশ ওই উপাধি ব্যবহার করেন। তারপর ওই বংশের অভিরাম রায় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'খান' উপাধিতে ভূষিত হন। অভিরামের মধ্যমপুত্র শোভারাম খানের পুত্র মতিরাম রানী শিরোমণির তত্ত্বাবধায়ক হন। মতিরামের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র সীতারাম খান রাজ্যের রক্ষক হন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত এক দানপত্র দ্বারা রানী শিরোমণি সমস্ত-

রাজ্য সীতারামের জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দলালকে দান করেন। আনন্দলাল নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। তিনি তাঁর ছোট ভাই মোহনলালকে কর্ণগড় রাজ্য ও মধ্যম ভাই নন্দলালকে নাড়াজোল রাজ্য দিয়ে যান।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত মুকসুদপুরের ভুঁইঞারাও অতি প্রসিদ্ধ সদ্গোপ জমিদার ছিলেন। এছাড়া, মেদিনীপুরে অন্য জাতির জমিদারীও অনেক ছিল। তন্মধ্যে চেতুয়া-বরদার রাজারা, তমলুকের রাজারা, ঝাড়গ্রামের রাজারা, জামবনির রাজারা, ঝাটিবনির রাজারা ও ঘাটশিলার রাজারা উল্লেখের দাবী রাখে। এঁদের অনেকের সঙ্গেই বাঁকুড়ার মল্লরাজদের মিত্রতা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তমলুকের রাজা ছিলেন কৈবর্ত জাতিভুক্ত আনন্দনারায়ণ রায়। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ নামে চারজন রাজার পর আনন্দনারায়ণের ঊর্ধ্বতন ৫৬তম পূর্বপুরুষ বিদ্যাধর রায় এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজারা বহু দেবদেউল নির্মাণ করেন, এবং তন্মধ্যে বর্গভীমার মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় ঝাড়খণ্ড বা ঝাড়গ্রাম 'বন্যজাতি' অধ্যুষিত ও ওড়িষ্যা-ময়ূরভঞ্জের বনপথের সংলগ্ন ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঝাড়গ্রামে যে রাজবংশ রাজত্ব করতেন, তাঁদের আদিপুরুষ ষোড়শ শতাব্দীতে ফতেপুর সিকরি অঞ্চল থেকে পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রে তীর্থ করতে আসেন এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ঝাড়গ্রামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়ার মল্লরাজগণের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের রাজাদেরও বিশেষ মিত্রতা ছিল। (মল্লরাজগণ সম্বন্ধে পরে দেখুন)।

বর্ধমানের রাজবংশ সম্বন্ধেও অনুরূপ কিংবদন্তী শোনা যায়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রামসিংহ পঞ্জাব থেকে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে আসেন। ফেরবার পথে তিনি বর্ধমানের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে একখানা দোকান করেন। তারপর দোকানদারী থেকে জমিদারী ও জমিদারী থেকে রাজ্য স্থাপন। যাদের জমি গ্রাস করে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, তারা হচ্ছে গোপভূমের সদ্গোপ রাজারা। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে J. C. C. Peterson, I. C. S. 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্টস্ গেজেটিয়ারস্'-এর বর্ধমান খণ্ডে সদ্গোপ রাজাদের পরিখাবেষ্টিত নগরীসমূহ, প্রাসাদ, দুর্গ, মূর্তি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্মিত হয়ে লিখেছিলেন যে, "একদা দামোদর-অজয় বেষ্টিত ভূখণ্ডের এক বিস্তৃত অঞ্চলে সদ্গোপ রাজাদের আধিপত্য ছিল।"

সাম্প্রতিককালে বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থেও বলেছেন— "গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজবংশের ইতিহাস রাঢ়ের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস। আজও সেই অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন ভালকি, অমরাগড়, কাঁকশা, রাজগড়, গৌরাঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে। বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সদ্‌গোপদের দানের গুরুত্ব আজও নির্ণয় করা হয়নি।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোপভূমে যে সদ্‌গোপ রাজা রাজত্ব করেছিলেন তাঁর নাম শতক্রতু। ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে শতক্রতু মারা গেলে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র রাজা হন। মহেন্দ্র নিজ পিতৃরাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিতে রাজা মহেন্দ্রের কথা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। যখন জগৎশেঠের বাড়িতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে সভা আহুত হয়, তখন রাজা মহেন্দ্র একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। নবাবের বিপক্ষে বিরোধী হওয়ার জন্য তাঁর রাজ্য বর্ধমানের রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তিনি শেষপর্যন্ত পরাজিত হন।

তিন

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় আরও রাজা মহারাজা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। যেমন চন্দ্রকোণার রাজারা, নাটোরের রাজবংশ, নদীয়ার রাজবংশ ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নাটোরের জমিদার ছিলেন রাজা রামকান্ত রায়। ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে রামকান্তের মৃত্যুর পর তার ৩২ বৎসর বয়স্কা বিধবা রানী ভবানী (বঙ্গাব্দ ১১২১-১২০০) নাটোরের বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী হন। ওই বিশাল জমিদারী কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনার স্বাক্ষর তিনি ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন। তাঁর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব সরকারে সত্তর লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়ে বাকী টাকা তিনি হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ প্রতিপালন, দীনদুঃখীর দুদশামোচন ও জনহিতকর কার্যে ব্যয় করতেন। বারাণসীতে তিনি ভবানীশ্বর শিব স্থাপন করেছিলেন ও কাশীর বিখ্যাত দুর্গাবাড়ি, দুর্গাকুণ্ড ও কুরুক্ষেত্রতলা জলাশয় প্রভৃতি তাঁর কীর্তি। বড়নগরে তিনি ১০০টি শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন। যদিও সিরাজউদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে তিনি ইংরেজ পক্ষকেই সাহায্য করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর জমিদারীর কিয়দংশ

ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছিল। তাঁর বাহারবন্দ জমিদারী ওয়ারেন হেষ্টিংস বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে কান্তবাবুকে (কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী) দিয়েছিলেন। পাঁচসালা বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও তাঁর রংপুরের কয়েকটা পরগনা হস্তগত করেছিলেন।

রানী ভবানীর সমসাময়িককালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জমিদারী পরিচালনা করতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০–১৭৮২)। কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর আয়তনও বিশাল ছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে বলেছেন—"রাজ্যের উত্তরসীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গাভাগীরথীর খাদ। দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের খাদ। পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার।" সিরাজউদ্দৌল্লাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে তিনিও ইংরেজদের সাহায্য করেন। এর প্রতিদানে তিনি ক্লাইভের কাছ থেকে পাঁচটি কামান উপহার পান। কিন্তু পরে খাজনা আদায়ের বাকিলতির জন্য মীরকাশিম তাঁকে মুঙ্গের দুর্গে বন্দী করে রাখে। ইংরেজের সহায়তায় তিনি মুক্তি পান।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন আঠারো শতকের নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের কেন্দ্রমণি। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের মাঘ মাসে তিনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তাঁর ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।* বাঙলা, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মিথিলা, উৎকল ও বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিতরা এই যজ্ঞে আহূত হয়েছিলেন। এছাড়া, তাঁর সভা অলংকৃত করতেন বহু গুণিজন যথা গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ। নাটোর থেকে একদল মৃৎশিল্পী এনে, তিনি কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মৃৎশিল্পের প্রবর্তন করেন। বাঙলাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার তিনি প্রবর্তক। তিনি রাজা রাজবল্লভ প্রস্তাবিত হিন্দু বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন।

বাঁকুড়ার মল্লরাজগণের রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর জঙ্গলমহলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ তাদের গৌরবের তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজগণ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। গোপাল সিংহের রাজত্বকালে বর্গীদের আক্রমণে রাজ্যটি বিধ্বস্ত হয় ও তার পতন ঘটে। কিন্তু একসময় তারা এক বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি ছিল। এই ভূখণ্ড উত্তরে সাঁওতাল পরগনা থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যন্ত এবং পূর্ব-

দিকে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের কিয়দংশ তাদের জমিদারীভুক্ত ছিল। মল্লরাজগণের আমলে বিষ্ণুপুর রেশম চাষ ও সংস্কৃত চর্চার একটা বড় কেন্দ্র ছিল। মল্লরাজগণ প্রথমে শৈব ছিলেন, কিন্তু পরে শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি রাজা হাম্বির (১৫৯১-১৬১৬), রঘুনাথ সিংহ (১৬১৬-১৬৫৬), দ্বিতীয় বীরসিংহ (১৬৫৬-১৬৭৭), দুর্জন সিংহ (১৬৭৮-১৬৯৪) প্রমুখের আমলে নির্মিত হয়। এঁদের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজগণ যখন দুর্বল হয়ে পড়েন, তাঁদের রাজ্য বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন রাজা সীতারাম রায়, বঙ্কিম যাঁকে তাঁর উপন্যাসে অমর করে গিয়েছেন। যশোহরের ভূষণা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা উদয়নারায়ণ ছিলেন স্থানীয় ভূম্যধিকারী। মহম্মদ আলি নামে একজন ফকিরের কাছ থেকে তিনি আরবী, ফারসী ও সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে তিনি পিতার জমিদারীর সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে নিজেই 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। মুরশিদকুলি খান তাঁকে দমন করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তিনি ঐশ্বর্যমত্ত হলে, তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। সেই সুযোগে নবাবের সৈন্য তাঁর আবাসস্থল মহম্মদপুর আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে। কথিত আছে তাঁকে শূলে দেওয়া হয়েছিল। (অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের জন্য লেখকের 'আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী' দ্র)।

৫।৫

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভের পরবর্তী সাত বছর পুরাতন রাজস্ব প্রশাসনই বলবৎ রাখে। তখন রাজস্ব পরিমাণ ছিল ২,৫৬,২৪,২৩৩ টাকা। কোম্পানির তরফ থেকে কোম্পানির নায়েব-দেওয়ানরূপে মহম্মদ রেজা খাঁ ভূমিরাজস্ব পরিচালনা করতে থাকে। এর ফলে দ্বৈতশাসনের উদ্ভব হয়। দ্বৈতশাসনের ফলে দেশের মধ্যে স্বৈরতন্ত্র ও অরাজকতা প্রকাশ পায় ও কৃষি-ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে। এরই পদাঙ্কে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। মন্বন্তরে বাঙলার অর্ধেক কৃষক মারা যায় ও আবাদী জমির অর্ধেকাংশ অনাবাদী হয়ে পড়ে। কিন্তু রেজা খাঁ খাজনার দাবী ক্রমশই বাড়াতে থাকে। এর ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পায়। এদিকে রাজস্ব সম্পর্কে

কোম্পানির প্রত্যাশাও পূরণ হয় না। রাজস্বের টাকা আত্মসাৎ করবার অভিযোগও রেজা খাঁর বিরুদ্ধে আসে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর হয়ে আসেন, তখন তাঁকে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির সারকিট কমিটির তত্ত্বাবধানে জমিদারী মহলগুলিকে নিলামে চড়িয়ে দিয়ে, ইজারাদারদের সঙ্গে পাঁচসালা বন্দোবস্ত করেন। যারা ইজারা নেয়, তাদের অধিকাংশই কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেনিয়ান। এদের মধ্যে ছিলেন হেস্টিংস-এর নিজস্ব বেনিয়ান কান্তবাবু, কিন্তু ইজারাদারদের অধিকাংশই নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে না। কোম্পানির সমস্ত প্রত্যাশাই ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পর ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি জমিদারদের সঙ্গে বাৎসরিক রাজস্বের বন্দোবস্ত করে।

পাঁচসালা পরিকল্পনার সময় থেকেই অনেকে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তুলেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল আলেকজাণ্ডার ডাউ, স্কটল্যাণ্ডের প্রখ্যাত কৃষিবিশেষজ্ঞ হেনরী পাটুলো ও কোম্পানীর কয়েকজন কর্মচারী যথা—মিডলটন, ডেকার্স, ডুকারেল, রাউস প্রভৃতি। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সবচেয়ে বড় প্রস্তাবক ছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। তিনি বললেন, ভারতের বিধিবিধান অনুযায়ী জমিদাররাই জমির মালিক। অর্থনৈতিক মহলের ফিজিওক্রাটদের ভাবধারায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি বললেন, কৃষিই সামাজিক ধনবৃদ্ধির একমাত্র সূত্র এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদের ভূমির মালিকানা স্বত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করলে, তাদের উদ্যোগে কৃষির পুনরভ্যুদয় ঘটবে এবং তাতে কোম্পানির আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। ফ্রান্সিসের লেখার প্রভাবেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিধিবদ্ধ পিটস্-এর 'ভারত আইন'-এ রাজা, জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য ভূস্বামীদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ীই ১৭৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের সঙ্গে দশসালা বন্দোবস্ত করেন। (দশসালা বন্দোবস্তের সময় আলাহাবাদের রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জন্য দেওয়ানীর ভার পেয়ে নোয়াখালির জগমোহন বিশ্বাস আলাহাবাদে যান। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এককালীন দুই লক্ষ টাকা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের ওপর থেকে পূর্ব-প্রচলিত তীর্থকর চিরতরে রহিত করেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে এক

রেগুলেশন দ্বারা এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয়। এর সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন বিহারের কালেকটর টমাস ল'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদাররা ও স্বাধীন তালুকদাররা জমির মালিক ঘোষিত হয়। এর দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের (যথা কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজাদের মতো মুঘল যুগের করদ নৃপতি, রাজশাহী, বর্ধমান ও দিনাজপুরের রাজাদের মতো পুরাতন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ, মুঘল সম্রাটগণের সময় থেকে বংশানুক্রমিকভাবে রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদভোগী পরিবারসমূহ ও কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পর ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা) একই শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সকলকেই জমির মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের এক মিনিট-এ কর্নওয়ালিস মত প্রকাশ করেন—'আমার সুদৃঢ় মত এই যে, ভূমিতে জমিদারগণের মালিকানা স্বত্ব দেওয়া জনহিতার্থে আবশ্যক।' বাঙলায় জমিদারদের জমার পরিমাণ ২৬৮ লক্ষ সিক্কা টাকা নির্দিষ্ট হয়। কোম্পানির আর্থিক প্রয়োজন বিচার করেই জমার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। যাতে নিয়মিতভাবে ভূমিরাজস্ব দেওয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যে 'সূর্যাস্ত আইন' জারি করা হয়। এই আইন অনুযায়ী কিস্তি দেওয়ার শেষ দিন সন্ধ্যার পূর্বে কোন মহালের টাকা জমা না পড়লে, সেই মহালকে নিলামে চড়ানো হত; অনাদায়, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কোন অছিলাই চলত না। কর্নওয়ালিসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুনিশ্চিত আদায় ও কৃষির বিস্তার। কিন্তু কর্নওয়ালিসের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা কিছুই সিদ্ধ হয়নি। উপরন্তু জমিদাররা সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে দাঁড়ায় ও প্রজাপীড়ন ক্রমশঃ উর্ধ্বগতি লাভ করে।

পাঁচ

এই একসালা, পাঁচসালা ও দশসালা বন্দোবস্তের অন্তরালেই ঘটেছিল বাঙলার বৃহত্তম জমিদারীর বিলুপ্তি। এ জমিদারী ছিল রানী ভবানীর। বাঙলা দেশের প্রায় আধখানা জুড়ে ছিল এ জমিদারীর বিস্তৃতি। কোম্পানির রেভেন্যু কালেক্টর জেমস্ গ্রান্ট বলেছেন—"Rajesahy, the most unwieldy and extensive zemindary of Bengal or perhaps in India". রানী ভবানী তাঁর এই বিশাল জমিদারী থেকে লক্ষ দেড় কোটি টাকা খাজনার অর্ধেক দিতেন নবাব দরবারে, আর বাকী অর্ধেক ব্যয় করতেন নানারকম জনহিতকর ও ধর্মীয়

কাজে। অকাতরে অর্থ দান করে যেতেন দীনদুঃখীর দুঃখমোচনে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রতিপালনে ও গুণীজনকে বৃত্তিদানে। তাঁর দানখয়রাতি ও বৃত্তিদান বাঙলা দেশে প্রবচনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দুর্দিনের জন্ম কখনও তিনি কিছু মজুত করেননি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পদক্ষেপে যখন প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা অনাদায়ী রইল, তখন তাঁর জমিদারীর একটার পর একটা মহাল ও পরগনা নিলামে উঠল। সুযোগসন্ধানীরা সেগুলো হস্তগত করবার জন্ম ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কুকার্যসমূহের যারা সহায়ক ছিল, তারাই এল এগিয়ে। রানী ভবানীর জমিদারীর অংশসমূহ কিনে নিয়ে তারা এক একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে বসল। কান্তবাবু (যিনি হেস্টিংসকে সাহায্য করেছিলেন চৈত সিং-এর সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে এবং সেজন্ম তার অংশবিশেষ তিনি পেয়েছিলেন) প্রতিষ্ঠা করলেন কাশিমবাজার রাজবংশ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন পাইকপাড়ার রাজবংশ, দুর্লভ দেবী সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন নসীপুরের রাজবংশ, এমনকি রানী ভবানীর নিজ দেওয়ান দয়ারাম প্রতিষ্ঠা করলেন দিঘাপাতিয়ার রাজবংশ। শেষপর্যন্ত রাণী ভবানী এমন নিঃস্ব হয়ে গেলেন যে তাঁকে নির্ভর করতে হল কোম্পানি প্রদত্ত মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তির ওপর। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি করবার জন্ম, তাঁর স্বজনদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ইংরেজ কোম্পানির কাছে। আর তাঁর কপালে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কালিমার টীকা। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ অক্টোবর তারিখের (তার মৃত্যুর তিন বছর আগে) এক সরকারী আদেশে বলা হল—"The former rank and situation of Maharanny Bowanny, her great age, and the distress to which both herself and the family have been reduced by the imprudence and misconduct of the Late Rajah of Rajesahy, are circumstances which give her claims to the consideration of Government. We therefore authorise to continue to her an allowance of Rs 1000 per month". অথচ তাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁর স্বজনবর্গ তাঁর শেষকৃত্যের খরচের সাহায্যের জন্ম কোম্পানির দ্বারস্থ হল তখন কোম্পানির রেভেন্যু বোর্ডের কর্তারা বললেন—"(Board) have reasons to suppose that the Late Ranny left ample funds by which the expenses of her funeral obsequies may be discharged".

আগেকার সমাজে যে সকল কুপ্রথা ও অপপ্রথা ছিল, সেগুলো সবই যুগসন্ধিকালের সমাজেও বর্তমান ছিল। যথা, কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, শিশুহত্যা, সাগরমেলায় শিশু বিসর্জন, সতীদাহ, দেবদাসী প্রথা, দাসদাসীর কেনাবেচা—ইত্যাদি। সমাজ সংগঠন ও জাতিবিন্যাসও আগেকার মতোই ছিল। কৌলিক বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও বৎসরের তিনমাস সকল জাতির লোকই চাষবাসে নিযুক্ত থাকত।

শস্যশ্যামলা এই পলিমাটির দেশ বাঙলায় ছিল ঋদ্ধির আকর। এখানেই উৎপন্ন হত ধান্য, তুলা, রেশম, ইক্ষু, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসব কৃষিপণ্য বাঙলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। এসব পণ্যই বাঙলার কৃষকের সমৃদ্ধির কারণ ছিল। পরে বাঙালীর এই কৃষি-বনিয়াদের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, যার পরিণামে আজ আমাদের ইক্ষু ও সরিষার জন্য বিহার ও উত্তর-প্রদেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। তুলার চাষের পরিবর্তে এখন পাটের চাষ হয়, যার ন্যায্য মূল্য বাঙালী কৃষক পায় না; কিন্তু যার মুনাফার সিংহভাগ অবাঙালীর উদর স্ফীত করে।

কৃষি ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রামবাঙলার সমৃদ্ধির উৎস ছিল, নানারূপ শিল্প। অর্থনীতিক দিক দিয়ে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ম্ভর। গ্রামের লোকের দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীসমূহ ও পালপার্বণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ গ্রামের শিল্পীরাই তৈরি করত। তারাই ছিল আমাদের দেশের technologists. অর্থনীতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। সমাজ গঠিত হত যৌথ-পরিবারভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে নিয়ে। প্রতি জাতির একটা করে কৌলিক বৃত্তি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সকল কৌলিক বৃত্তি অনুসৃত হত। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাঙালী তার কৌলিক বৃত্তিসমূহ হারিয়ে ফেলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌলিক বৃত্তিধারী জাতিসমূহের বিবরণ আমরা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য থেকে পাই। মোটামুটি যে সকল জাতি বাঙলাদেশে বিদ্যমান ছিল, তা সমসাময়িককালে অনুলিখিত এক মঙ্গলকাব্যে যেভাবে বর্ণিত

হয়েছে তা এখানে উদ্ধৃত করছি—"সদ্গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি। উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥ যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার। নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥ হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি। মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি॥ স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার। সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার॥ ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা। পড়িল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥" এছাড়া, সকলের শীর্ষে ছিল ব্রাহ্মণ। এ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলসমূহে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রাধান্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান জেলায় কোন্ কোন্ জাতির কিরূপ প্রাধান্য ছিল, তা নীচের ছকে দেখানো হচ্ছে—

স্থান	মেদিনীপুর	হুগলি	বর্ধমান	বাঁকুড়া	বীরভূম	২৪ পরগনা	নদীয়া
প্রথম	১	১	৫	৯	২	১২	১
দ্বিতীয়	২	৫	২	৩	৫	১	৬
তৃতীয়	৩	৩	৩	৭	৩		৩
চতুর্থ	৪	৬	৬	৬	৮	৫	১১
পঞ্চম	৫	২	৭	১১	৯	৬	১০

জাতি . ১—কৈবর্ত ; ২—সদ্গোপ ; ৩—ব্রাহ্মণ ; ৪—তাঁতী ; ৫—বাগদি ; ৬—গোয়ালা ; ৭—তিলি ; ৮—ডোম . ৯—বাউরি ; ১০—চণ্ডাল ; ১১—চামার ; ১২—পোদ।

লক্ষণীয় যে পশ্চিমবাঙলার এই সমস্ত জেলাসমূহে সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে কায়স্থদের প্রথম পাঁচের মধ্যে কোন জেলায় প্রাধান্য ছিল না। সমগ্র পশ্চিম-বাঙলায় মোট জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্থান ছিল ৬ষ্ঠ। প্রথম পাঁচ ছিল যথাক্রমে কৈবর্ত, বাগদি, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ ও গোয়ালা। আজ কিন্তু পরিস্থিতি অন্য রকম। তার কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'জাত কাছারী' স্থাপন করে জাতি নির্বিশেষে অনেক জাতির লোককেই 'কায়স্থ' স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরে অনেক জাতের লোকই সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য নিজেদের 'কায়স্থ' বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। এটা নাগরিক জীবনের পরিণাম মাত্র। কেননা, নগরবাসীরা আগন্তুকের কুলশীল সম্বন্ধে কেউই কিছু জানত না। সুতরাং আগন্তুকের জাত যাচাই করবার কোন উপায় ছিল না। গ্রামের লোকরা সকলেই সকলকে চিনত। সেজন্য সেখানে জাত ভাঁড়াবার

কোন উপায় ছিল না। গ্রামের লোকরা হয় নিজের গ্রামে, আর তা নয় তো নিকটের গ্রামেই বিবাহ করত। এই বৈবাহিকসূত্রে এক গ্রামের লোক নিকটস্থ অপর গ্রামের লোকেরও জাত জানত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামবাঙলায় এই সকল হিন্দুজাতি ছাড়া, ছিল আদিবাসীরা। মেদিনীপুরের আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান আদিবাসী ছিল সাঁওতাল, লোধা ও হো। বাঁকুড়ার আদিবাসীদের মধ্যে ছিল কোরা, ভূমিজ, মাহালি, মেচ, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও ওরাওঁ। সকলের চেয়ে বেশি আদিবাসী ছিল বীরভূমে, প্রায় সবাই সাঁওতাল। রাজশাহীর আদিবাসীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে ছিল কম। এখানকার প্রধান আদিবাসী ছিল মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতি। সাঁওতালদের ৭৩·৭৩ শতাংশ বাস করত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলি জেলায়। বাকী অংশ বাস করত পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলায়। মুণ্ডারা অধিক সংখ্যায় (৬০·১৮ শতাংশ) বাস করত জলপাইগুড়ি ও চব্বিশ পরগনা জেলায়। বাকী ৩৯·৮২ শতাংশ বাস করত অন্য জেলাসমূহে। ওরাওঁ-দের ৮৯·০৪ শতাংশ বাস করত জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর ও চব্বিশ পরগনায়। সমষ্টিগতভাবে পশ্চিমবাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে ৯০·১৫ শতাংশ ছিল সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোরা ও লোধা। তবে সাঁওতালরাই ছিল বাঙলার আদিম অধিবাসী। কিংবদন্তী অনুযায়ী তাদের জন্মস্থান মেদিনীপুরের সাঁওতা পরগনায়।

দুই

কিন্তু এই সময় থেকেই বাঙালীর গ্রামীণ জীবনচর্যার ওপর আঘাত হানতে শুরু করেছিল নাগরিক সমাজ। এই নাগরিক সমাজের সূচনা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতা শহরে এক অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুত্থানে। এদের উদ্ভব ঘটেছিল ইংরেজের বেনিয়ানী, দাওয়ানী ও দালালী করে। প্রথম প্রথম যাঁরা কলকাতা শহরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন তাঁরা গ্রামীণ আচার-বিচার ও শাস্ত্রের বিধানসমূহ মেনে চলতেন। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পর যখন রাজা নবকৃষ্ণ দেব রাসপল্লীতে (পরবর্তীকালে নাম শোভাবাজার) এসে বসতি স্থাপন করলেন তখন বাঙালীর সমাজজীবন এক নতুন রূপ ধারণ করল। হিন্দুর পালপার্বণে যেখানে ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয় ও স্বজনবর্গ নিমন্ত্রিত হত,

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব সাহেবদের অনুগ্রহলাভের জন্য তাদের সঙ্গে যোগ করে দিলেন সাহেব-মেমদের। পূজাবাড়িতে তখন প্রবেশ করল বিদেশী সুরা ও নিষিদ্ধ খানা। সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রবেশ করল যবনী নর্তকীর দল। সাহেবদের অনুগ্রহলাভের জন্য আরও পাঁচজন বড়লোক নবকৃষ্ণকে অনুসরণ করল। শহরে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন জমিদারীসমূহ নিলাম হতে লাগল, তখন এঁরাই কিনলেন সেসব জমিদারী। এঁদের বংশধররা রাত্রিতে নিজ গৃহে থাকা আভিজাত্যের হানিকর মনে করল। রাত্রিটা রক্ষিতার গৃহেই কাটাতে লাগল। এদের জীবনযাত্রা প্রণালী গ্রামীণ সমাজ খুব কুটিল দৃষ্টিতে দেখল, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' ও অন্যান্য গ্রন্থে চিত্রিত করলেন। শহরের অভিজাত শ্রেণীর এই জীবনযাত্রা প্রণালী কিন্তু সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করল না। সাধারণ লোক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্দরমহল নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে রইল। এটা আমরা সমসাময়িক ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি থেকে জানতে পারি। এঁরা হচ্ছেন টমাস ড্যানিয়েল, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, সলভিনস ও সিম্পসন। এইসব শিল্পীরা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে এদেশে এলেও, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন আমাদের সামাজিক জীবন, ধর্মীয় উৎসব ও রীতিনীতির প্রতিচ্ছবি।

তিন

এবার আমরা দক্ষিণবঙ্গের সমাজে গ্রামীণ শিক্ষাদীক্ষা ও সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে কিছু বলব। সর্বজনীন স্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম ছিল হিন্দুদের পাঠশালা ও মুসলমানদের মক্তাব। এছাড়া ছিল কথকতা, গান, যাত্রাভিনয় ও পাঁচালী গান, যার মাধ্যমে হিন্দুরা পৌরাণিক কাহিনীসমূহের সহিত পরিচিত হত। হিন্দুদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ছিল চতুষ্পাঠীসমূহ। চতুষ্পাঠীসমূহ পরিচালনা করতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। চতুষ্পাঠীসমূহে নানা শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হত। নব্যন্যায়ের ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা বাঙলার চতুষ্পাঠীসমূহের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে যে মাত্র নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রেরই অনুশীলন হত, তা নয়। জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দোসূত্র প্রভৃতি ও দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, কালিদাস প্রমুখদের কাব্যসমূহ এবং

মহাভারত, কামন্দকী-দীপিকা, হিতোপদেশ প্রভৃতি পড়ানো হত। এছাড়া, তাঁরা সমাজকে দিতেন পাঁতি। পঞ্জিকার তথ্যও চতুষ্পাঠীতে পাওয়া যেত।

চতুষ্পাঠীসমূহের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। শাস্ত্র অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। এই প্রসিদ্ধির জন্যই নবদ্বীপকে বাঙলার 'অকস্‌ফোর্ড' বলে অভিহিত করা হত। তবে নবদ্বীপ ছাড়া আরও যে সব কেন্দ্র ছিল, তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী, বর্ধমান, নদীয়া, গুপ্তিপাড়া, কুমারহট্ট, গোন্দলপাড়া, জয়নগর-মজিলপুর, খাটুয়া, হুগলী, বালী ও আন্দুল এবং পূর্ববঙ্গে কোটালিপাড়া, ফরিদপুর, বাকলা ও ত্রিপুরা। এ সব জায়গার পণ্ডিতগণ স্বনামধন্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যেতে পারে নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ, গোকুলানন্দ বিদ্যামণি ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বর্ধমানের দুলাল তর্কবাগীশ, গুপ্তি-পাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, খাটুয়ার অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, নদীয়ার জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও রামভদ্র সার্বভৌম, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন ও কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য, ও হুগলীর কুলাবধুত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রমুখদের। পূর্ববঙ্গের কোটালিপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম, ফরিদপুরের চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, ত্রিপুরার কালীকচ্ছের দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার ও বরিশালের বাকলার জগন্নাথ পঞ্চানন ও কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম। কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম বিচিত্র বিধান দিতেন। তিনিই শারদীয়া পূজার নবমীর দিনই দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের বিধান দিয়ে-ছিলেন। তা থেকেই 'কৃষ্ণানন্দী দশহরা' প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছে।

পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। তার কারণ ইংরেজ যখন দেশের শাসক হল, তখন দেওয়ানী আদালতে এদেশের বিধান সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য বিচারকরা পণ্ডিতদের আহ্বান করতেন। সেজন্য, কার্যোপযোগী একখানা ব্যবস্থাপুস্তক সংকলন করবার প্রথম আয়োজন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। এগার জন পণ্ডিতকে দিয়ে এরূপ একখানা ব্যবস্থাপুস্তক তৈরি করে, সেখানা প্রথম ফারসীতে ও পরে হ্যালহেডকে দিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নাম দেন 'জেন্টু কোড'। কিন্তু দু'বার অনুবাদ হওয়ার ফলে বইখানা কোন কাজের বই হল না। তখন মিথিলার পণ্ডিত সর্বরী ত্রিবেদীকে দিয়ে 'বিবাদ সারার্ণব' নামে একখানা বই সংকলন করান। কিন্তু সেটাও মনঃপূত না হওয়ায় ত্রিবেণীর প্রখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে দিয়ে 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব'

নামে একখানা বই সংকলন করান। এখানাই গৃহীত হয় এবং কোলব্রুক সাহেব এখানার তর্জমা করে নাম দেন 'A Digest of Hindu Law'. জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ১১৪ বছর পর্যন্ত (১৬৯৪-১৮০৭) জীবিত থেকে তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অম্লান রেখেছিলেন। (এই সময়ের পণ্ডিত সমাজের বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের "আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী" পৃঃ ১০০ ১০৩, ১০৪-১১৭ ও "কলকাতা: এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস" পৃষ্ঠা ১৭৭-১৯৭ দ্রষ্টব্য)।

চার

পণ্ডিতগণ কর্তৃক শাস্ত্র অনুশীলন ও সংস্কৃত ভাষায় প্রামাণিক টীকা টিপ্পনী রচনা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দী উদ্ভাসিত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যচর্চার আলোকে। সুধীজন নতুন নতুন কাব্য রচনা করেছিলেন, এবং এ বিষয়ে শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অনেকেই সমসাময়িক রাজারাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কর্ণগড়ের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচনা করেছিলেন 'শিবায়ন,' বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় শঙ্কর কবিচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'গোবিন্দমঙ্গল' ও 'কৃষ্ণমঙ্গল', বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘনরাম চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন 'ধর্মমঙ্গল', মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'অন্নদামঙ্গল', পঞ্চকুটাধিপতি রঘুনাথ সিংহের আদেশে জগন্নাথ রায় রচনা করেছিলেন 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও মেদিনীপুরের কাশীজোড়াধিপতি রাজনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন 'শীতলামঙ্গল', লক্ষ্মীমঙ্গল' ইত্যাদি।

শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদকাব্যের ধারা অব্যাহত দেখি। মাণিক গাঙ্গুলি, রামকান্ত ও গোবিন্দরাম রচনা করেছিলেন তিনখানা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন 'রামায়ণ', নিধিরাম কবিচন্দ্র রচনা করেছিলেন সংক্ষিপ্ত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', শচীনন্দন 'উজ্জ্বল নীলমণি', জয়নারায়ণ ঘোষাল পদ্মপুরাণের 'কাশীখণ্ড', ও গোলকনাথ দাস ইংরেজি 'Disguise' নাটকের বাংলা অনুবাদ।

এ ছাড়া বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী সাহিত্য রচনার জন্যও অষ্টাদশ শতাব্দী বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আরও এ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পালাগান

রচনার প্রাচুর্য। পালাগান রচয়িতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। তাঁর রচিত মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শীতলার জাগরণপালা প্রভৃতি পালাগানগুলি এক সময় মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে খুব জনপ্রিয় ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যধারার পাশে আর এক সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এটা হচ্ছে কবিওয়ালাদের গান। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের মধ্যে ছিলেন রঘুনাথ দাস, রামনৃসিংহ, নীলমণি ঠাকুর, গোঁজলা গুঁই, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নৃসিংহ রায়, বলাই বৈষ্ণব, ভবানী বণিক, ভোলা ময়রা, এন্টনী ফিরিঙ্গি ও হরুঠাকুর।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ অবদান ছিল বিষ্ণুপুর ঘরানার উদ্ভব। এটা ধ্রুপদেরই একটা বিশেষ ঘরানা। আঠারো শতকের শেষের দিকে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ছিলেন এই ঘরানার বিখ্যাত গায়ক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে টপ্পাগানের গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত। শ্যামাসঙ্গীতে অদ্বিতীয় ছিলেন হালিশহরের শক্তিসাধক ও কবি রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গীতভঙ্গী 'রামপ্রসাদী সুর' নামে পরিচিত। রামপ্রসাদী গান একসময় বাঙলার লোককে মাতিয়ে রেখেছিল।

এছাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা গদ্য লেখবার একটা রীতিও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আইন পুস্তকের তর্জমায়। ১৭৮৪-৮৫ সালে জোনাথান ডানকান চারখানা বই প্রকাশ করেন, ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে জজ চার্লস মেয়ার আরও চারখানা, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে জর্জ ফ্রেডেরিক চেরী একখানা, ১৭৯০-৯২ খ্রীস্টাব্দে এডমনস্টোন দু'খানা, আর ১৭৯৫ থেকে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হেনরি পিটস্ ফরস্টার ১৪ খানা। এটা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। আমরা পরে দেখব যে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির সার্থক রূপায়ণে গদ্যসাহিত্যই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল (আঠারো শতকের রচিত বাংলা গদ্যগ্রন্থসমূহের জন্য লেখকের 'আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী' পৃষ্ঠা ১৩২ ১৩৩ দেখুন)।

ছাপাখানা ও সামাজিক বিস্ফোরণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এদেশে ছাপাখানার প্রবর্তন সমাজের ওপর এক গভীর প্রতিঘাত হেনেছিল। যদিও ছাপাখানা শিক্ষার বিস্তারে সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তথাপি একথা বললে ভুল হবে যে, ছাপাখানা প্রবর্তনের পূর্বে এদেশের লোক অশিক্ষিত ছিল। সমাজের অনেকেই পাঠশালার মারফত সাক্ষরতা অর্জন করত। এটা যে উচ্চকোটির লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। নিম্নকোটির লোকরাও সাক্ষরতা অর্জন করত। সামান্য মুদির দোকানে সুর করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া হত। বিদ্যার দৌড়ে অনেক মুদি আবার তার চেয়েও বেশি এগিয়ে যেত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কান্ত মুদির উল্লেখ করা যেতে পারে—যিনি বাংলা, ফারসী ও যৎসামান্য ইংরেজি জানতেন এবং হিসাবপত্রে পারদর্শী ছিলেন।

মুদির দোকানে রামায়ণ পড়াই বলুন, আর চতুষ্পাঠীসমূহে সংস্কৃত ব্যাকরণ-কাব্য-সাহিত্য-দর্শন অধ্যয়নই বলুন, সবই হাতে লেখা পুঁথির সাহায্যে করা হত। এর জন্য সমাজে এক শ্রেণীর লোক পুঁথিলেখকের কাজ করত। যখন ছাপাখানা আবির্ভূত হল, এবং মুদ্রিত বই বেরুতে লাগল, তখন তার প্রথম প্রতিঘাত গিয়ে পড়ল এইসব পুঁথিলেখকদের ওপর। অবশ্য তারা রাতারাতি সব বেকার হয়ে পড়েনি। কেননা, প্রথম প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি নিষ্ঠাবান সমাজের একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। এ বিদ্বেষের কারণ ছিল, ছাপাখানা বিলাতী যন্ত্র বলে। তখন এদেশে যা কিছু বিলাতী জিনিসের সংস্পর্শে আসত, তা নিষ্ঠাবান সমাজের বিচারে ছিল হিন্দুর ধর্মনাশ করবার একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু নিষ্ঠাবান সমাজের এ বিদ্বেষ খুব বেশি দিন টেকেনি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পূর্বেই ছাপা বইয়ের প্লাবন এনে দিয়েছিল শিক্ষাজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তখন থেকেই উপজীবিকার উপায় হিসাবে পুঁথিলেখা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

আট

ছাপাখানার সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজিতে রচিত ও হুগলীতে

মুদ্রিত ন্যাথানিয়াল ব্রাসী হ্যালহেড কৃত বাংলা ভাষার একখানা ব্যাকরণ প্রকাশ থেকে। বইখানার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই বইখানাতেই প্রথম বিচ্ছিন্ন নড়নশীল (movable types) বাংলা হরফের চেহারা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এই হরফ তৈরি করেছিলেন চার্লস উইলকিনস নামে কোম্পানির এক সিভিলিয়ান। তিনি পঞ্চানন কর্মকার নামে এদেশের একজন দক্ষ ও প্রতিভাশালী শিল্পীকে হরফ তৈরির প্রণালীটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলা হরফের সাট বিবর্তনের ইতিহাসে পঞ্চানন ও তার পরিজনদের প্রয়াস তথা দান অনন্যসাধারণ।

ছাপাখানার প্রবর্তনের ফলে, এক শ্রেণীর লোক যেমন তাদের কর্মসংস্থানের সূত্র হারিয়ে ফেলল, অপর দিকে ছাপাখানা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করল। ছাপাখানার বহুমুখী কাজে সমাজের বহুলোক নিযুক্ত হয়ে পড়ল। কেউবা অক্ষর-খোদাই ও অক্ষর-ঢালাইয়ের কাজে নিযুক্ত হল, আবার কেউবা অক্ষর-সংযোজন (composing) ও মুদ্রাযন্ত্র চালানোর কাজে ব্যাপৃত হল। তারপর ছাপাখানার সঙ্গে সঙ্গে আসে ছবি ছাপবার জন্য নানা রকমের কাজ। ছবি ছাপবার জন্য আবির্ভূত হল শিল্পী ও শিল্পীর সঙ্গে আবির্ভূত হল ব্লকমিস্ত্রি, যারা কাঠে বা ধাতুর পাতে খোদাই করে ব্লক তৈরি করত ছাপবার জন্য। তারপর লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়াতেও ছবি ছাপা শুরু হতে লাগল। (১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা জর্নাল' অনুযায়ী দুজন ফরাসী শিল্পী, নাম বেলনস ও সাভিগ্র্যাক কর্তৃক এই প্রথা কলকাতায় প্রবর্তিত হয়েছিল)। এসব কাজের জন্য সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট বৃত্তিধারী নানাশ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হল। পুঁথি-লেখকরা তাদের কর্ম হারাল বটে, কিন্তু তাদের তুলনায় সমাজের এক গরিষ্ঠ জনসংখ্যা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ পেল।

এদিকে ছাপাখানার সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। ছাপাখানার সংখ্যা যত বাড়ল সমাজের বেশিসংখ্যক লোক তত ছাপাখানার কাজে নিযুক্ত হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দে) এদেশে ১,০৯৪টি ছাপাখানা ছিল। গড়ে যদি প্রতি ছাপাখানায় পাঁচজন লোক নিযুক্ত থেকে থাকে তা হলে বলতে হবে যে মালিক সমেত ৬,৫৬৪ সংখ্যক লোক ছাপাখানা থেকে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করত। আর প্রত্যেক লোকের পরিবারে যদি পাঁচজন করে লোক থাকে, তা হলে ছাপাখানা থেকে প্রায় ৩২,৮২০ লোকের ভরণ-

পোষণ চলত। মাত্র কর্মসংস্থান ও ভরণপোষণ নয়, সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে সবচেয়ে যে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল, সেটা হচ্ছে সমাজের বহুজন এক নতুন টেকনোলজিতে দক্ষ হয়ে দাঁড়াল।

তারপর নতুন নতুন দিকে ছাপাখানার বিকাশ ঘটল। লাইনোটাইপ, মনোটাইপ প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কার হল। মুদ্রণযন্ত্রও প্ল্যাটেন প্রেস থেকে রোটারী প্রেসে পরিণত হল। সচিত্র বই ছাপবার জন্য হাফটোন ব্লক তৈরি হতে লাগল। অফসেট প্রিন্টিং-এরও প্রবর্তন হল। এসব কাজ সমাধায় জন্য দক্ষতাপূর্ণ নানা বৃত্তিধারী মানুষের আবির্ভাব ঘটল। ফলে, অন্যান্য শিল্পের ন্যায়, ছাপাখানাও এক বিরাট শিল্পে পরিণত হল। সমাজের লোকরা নতুন নতুন টেকনোলজি শিখল এবং এর দ্বারা সমাজের বহুলোক উপকৃত হল। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে ছাপাখানার ধর্মঘটের সময় প্রকাশ পেয়েছিল যে, মাত্র কলকাতার ৬,০০০ ছাপাখানায় প্রায় এক লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। এছাড়া, কাগজ ও ছাপার কালি শিল্পেও বহু লোক নিযুক্ত আছে। কর্মনিযুক্তি বর্তমান সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এবং সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুদ্রাযন্ত্র এদেশের সমাজের ওপর এক অতি দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা, ছাপাখানার ফসল হচ্ছে বই ও সংবাদপত্র। বই ও সংবাদপত্র বিক্রির কাজে বহুলোক নিযুক্ত আছে। বস্তুত, ছাপাখানার কর্মযজ্ঞ ভারতের কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে যে এক প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

।৩।

এবার অন্যদিক দিয়ে সমাজের ওপর ছাপাখানার প্রভাব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। ছাপাখানার সাহায্যেই সামাজিক অপপ্রথাসমূহ ও নিপীড়ন বন্ধ হয়েছিল। মুদ্রিত পুস্তকই এদেশে সমাজ-সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত ছাপাখানাই এদেশে 'আন্দোলন'-এর যুগ আনে। 'আন্দোলন' চালাবার জন্য হাতে লেখা মাধ্যমের একটা সীমা আছে—সংখ্যা এবং ব্যয়, এই উভয় দিক থেকেই। অপরপক্ষে মুদ্রিত মাধ্যম মারফত প্রয়োজনীয় সংখ্যা ছাপানো যায়, এবং তার ব্যয়ও অল্প।

মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান প্রথম চালান রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ প্রথার বিলোপসাধনের জন্য তিনি কয়েকখানি

পুস্তিকা রচনা করে তাঁর স্বপক্ষে দেশের জনমত গঠনের ও সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তাঁর সে আন্দোলন যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, তা আজ সকলেরই জানা আছে। মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে অনুরূপ আন্দোলন চালিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য। তাঁর সে চেষ্টাও সার্থক হয়েছিল। রাজা রামমোহনের সমসাময়িক কালে (১৮২২ খ্রীস্টাব্দে) স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক এক পুস্তিকা প্রচার করে, এদেশের মেয়েরা যাতে বিদ্যাভ্যাস করে, তার জন্য আন্দোলন করা হয়। এর ফলে এদেশে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যাভ্যাসের সূচনা হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে নাটুকে রামনারায়ণ কুলীনপ্রথা সম্পর্কে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে তৎকালীন নীলকরদের বীভৎস অত্যাচার, চাষীদের লাঞ্ছনা ও দুরবস্থা অবলম্বনে তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন, এই নাটকের ফলেই জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে ও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। তখন আন্দোলনমূলক রচনা সাহিত্যের রূপ ধারণ করেছে। জাতীয় অপপ্রথা, কুসংস্কার ও কু-অভ্যাস সমূহ দূরীকরণের জন্য সেযুগে আরও যেসব সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক রচিত 'হুতোম-প্যাঁচার নকশা'। কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চেতনা জাগরণের জন্য লেখেন তাঁর আনন্দমঠ, সীতারাম, চন্দ্রশেখর ও দেবী চৌধুরাণী। আনন্দমঠ-এর 'বন্দেমাতরম্' গানই পরবর্তীকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীতে শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, বামুনের মেয়ে, পথের দাবী প্রভৃতি উপন্যাস লিখে সামাজিক অত্যাচার দূরীকরণ, স্ত্রীজাতির মর্যাদা স্থাপন ও জাতীয় চেতনা জাগরণের চেষ্টা করেন। মাত্র পুস্তক রচনা দ্বারাই এসব আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেনি। সংবাদপত্রও এর সহায়ক ছিল। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্র ছাপাখানারই আর এক ফসল। সংবাদপত্র মারফৎ এসব আন্দোলনের খবর ও ওই সম্বন্ধীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য জনসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল ; এবং তাতে সমাজের মধ্যে একটা জনমত গঠিত হচ্ছিল। বিশেষ করে জাতীয় চেতনা জাগবার পর সংবাদপত্রই জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বস্তুত, দেশের মধ্যে জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা

এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের চতুর্থ অঙ্গ বলা হয়। এ ছাড়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসমূহ আজ সমাজকে সাহায্য করছে শিল্পসমূহের মাল বিক্রি করা থেকে আরম্ভ করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ব্যাপারে।

ছাপা বই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল শিক্ষার প্রসারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলকাতা শহর মুদ্রণের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পূর্বে লোকের বিদ্যাবুদ্ধি যা কিছু হাতে লেখা পুঁথির মধ্যে ও বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যার প্রসার যে এক অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজের ওপর ছাপাখানার প্রভাব পড়েছিল এখানেই। ছাপাখানা মুদ্রিত বইয়ের সাহায্যে জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষাকে সর্বজনীন বা democratized করে তুলেছিল। শিক্ষাবিস্তারের ফলে লোকে যখন ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করল, তখন তারা পাশ্চাত্ত্যদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হল। এই পরিচিতিই তাদের সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্তের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। এই নতুন নতুন দিগন্তের ওপরই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি প্রতিষ্ঠিত হল। মানুষের মন নতুন আলোকের সন্ধান পেল। মানুষ যুক্তিনিষ্ঠ হল। সেই যুক্তিনিষ্ঠতাই সমাজসংস্কারকদের অনুপ্রাণিত করল সামাজিক অপপ্রথাসমূহ দূর করতে। সেজন্যই সনাতনীদের ছাপাখানার ওপর এক প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। কিন্তু ছাপাখানা থেকে যখন হুড়হুড় করে বই ও সংবাদপত্র বেরুতে লাগল ও দেশের জনসাধারণ তা কিনে পড়তে লাগল, তখন তার স্রোতে ছাপা-বই-বিরোধী সনাতনীরাই ভেসে গেল। বস্তুত ছাপা বই না থাকলে, এদেশে শিক্ষার প্রসার সুগম হত না, ও নবজাগৃতিরও আগমন ঘটত না।

এদিকে গণশিক্ষার প্রসার সাধনে সহায়তা করেছিল বটতলার প্রকাশন সংস্থাসমূহ। বটতলার অবদান অনেক। প্রথম, সস্তাদামে বই বিক্রি। দ্বিতীয়, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধন। তৃতীয়, সৎসাহিত্য (যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান, লক্ষ্মীচরিত্র প্রভৃতি) ও শিশুপাঠ্য বই (যথা শিশুবোধক, বর্ণপরিচয়, ধারাপাত ইত্যাদি) প্রচার। চতুর্থ, গ্রাম-গঞ্জে বই পৌঁছে দেবার জন্য ফিরিওয়ালার প্রবর্তন। (বটতলা সম্বন্ধে লেখকের 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর' দ্রঃ)।

সামাজিক বিকৃতি ও ধর্মীয় কুসংস্কার, জড়তা ও অন্ধমূঢ়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আবির্ভূত হলেন একজন যুগমানব। তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। এতদিন মানুষ শুধু ভয় পেয়ে এসেছিল, দৈবের শাসন ও শাস্ত্রের অমোঘ বিধান নতশিরে মেনে নিয়েছিল। রামমোহনই তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানান। তিনিই প্রথম তাঁর দেশবাসীকে যুক্তিতর্ক ও বিচারের ওপর নির্ভর করতে শেখান। মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই তিনি হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। পরে তিনি বেদান্ত চর্চার সূত্রপাত করেন এবং 'এক ও অদ্বিতীয়' ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য প্রচার চালান। তবে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিলেন না। তিনি মাত্র দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৌত্তলিকতার সঙ্গে এই ধর্মের প্রাচীন সাধকদের ধর্মাচরণের কোনও যোগ নেই। তিনি জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ খাদ্য কখনও গ্রহণ করতেন না, বা ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে বসে আহারও করতেন না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি উপবীত ধারণ করে গিয়েছিলেন।

রামমোহন বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন নারীজাতির দুঃখ ও লাঞ্ছনা। বহুবিবাহ রোধ করবার জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সহমরণ প্রথা তাঁরই চেষ্টায় আইন দ্বারা (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯) নিষিদ্ধ হয়েছিল।

রামমোহন গোড়া থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশবাসীর কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক জড়তা দূর করতে পারে একমাত্র শিক্ষার আলোক। তিনি তাঁর অতি আধুনিক বস্তুবাদী মন দিয়ে বুঝেছিলেন, আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে পার্থিব বিষয়ের জ্ঞানে দেশবাসীর মনকে নিয়োজিত করতে না পারলে, আধুনিক যুগের উপযোগীরূপে তাকে গড়ে তোলা যাবে না এবং সেজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান-শিক্ষার। আধুনিক বিজ্ঞানের বাহন হল আধুনিক ভাষা—ইংরেজি; সেজন্য ইংরেজি শিক্ষার ওপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে রামমোহনের এই স্বপ্ন সফল হয়েছিল রামমোহনের মৃত্যুর দু'বছর পরে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে, যখন ইংরেজ সরকার এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব

গ্রহণ করে। এর ফলে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসারলাভ করে। কিন্তু এর জন্য সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার চর্চা অবলুপ্ত হয়নি। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে নবজাগৃতির সঞ্চার হয়েছিল, তা এই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলনের দৌলতেই। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্যবিদ্যা ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। উইলকিনস্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার যে অনুবাদ করেছিলেন, তাতে সংযোজিত হেস্টিংস-এর ভূমিকা পাঠে আমরা তা অবগত হই। তাঁরই পদাঙ্কে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী তারিখে স্যার উইলিয়াম জোনস্ কর্তৃক প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে অনুশীলনের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে, সেখানে সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী উইলিয়াম কেরী সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে বিলাতের পার্লামেন্ট প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। সংস্কৃতের সহিত ইংরেজি শিক্ষা প্রদান ছাড়াও, সংস্কৃত কলেজ থেকে কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে এ কাজটা এশিয়াটিক সোসাইটির ওপর ন্যস্ত করা হয়। প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে সোসাইটি কর্তৃক হিন্দু শাস্ত্রসমূহ 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালা নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এর বাইরেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অনুবাদে প্রয়াসী হন। যাঁরা এই কাজে প্রয়াসী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। তাঁর অনূদিত শাস্ত্রসমূহ প্রকাশের পর বাঙলায় বেদচর্চা বিশেষভাবে শুরু হয়। তিনি পাঁচখানি উপনিষদেরও বঙ্গানুবাদ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তিনি হচ্ছেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি চল্লিশ বৎসর ব্যাপী অক্লান্তিক পরিশ্রম করে 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে এক বিরাট সংস্কৃত অভিধান প্রকাশ করেন। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ ব্যাসকৃত মহাভারত অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ও হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা অনুশীলনমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক স্থাপিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' মারফতও সংস্কৃতচর্চা বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় বলেছেন, 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞদের রচনা বাংলা গদ্যের পুষ্টিসাধনে এবং সৌষ্ঠববর্ধনে কতখানি সহায় হইয়াছিল, বলিয়া শেষ করা যায় না।'

উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগৃতিকে সার্থক করে তুলেছিল মুদ্রাযন্ত্র। বাঙলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পর অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হবার ফলে বিলাত থেকে বহু সাহেব এদেশে এসে মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। শত ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে অসংখ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে লোকের অজ্ঞানতা দূর করার কাজে সহায়ক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, এসব সংস্থা নানা-শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

৬৫

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির এক ধারা যেমন প্রবাহিত হয়েছিল শিক্ষার প্রসারসাধনের দিকে, অপর ধারা তেমনই প্রবাহিত হয়েছিল সামাজিক সংস্কার ও উন্নতিসাধনের দিকে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। উভয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজকে অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হলে যে প্রয়াস চালাতে হবে, তার বিপক্ষে আসবে তথাকথিত রক্ষণশীল নিষ্ঠাবান গোষ্ঠীর তরফ থেকে ভীষণ বিরোধিতা। উভয়েই সেজন্য জেনে নিয়েছিলেন যে সে বিরোধিতাকে দমন করতে পারবে একমাত্র সরকারী হস্তক্ষেপ। তাই তাঁরা উভয়েই সতীদাহ প্রথা বিলোপসাধনের জন্য ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য সরকারী সহায়তার মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। সরকারী আইন দ্বারাই সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল এবং বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ (জুলাই ১৮৫৬) বলে স্বীকৃত হয়েছিল। যদিও কৌলীন্য-কলুষিত বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা কার্যকর হয়নি, তবুও বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে বহুবিবাহ ক্রমাগত হ্রাস পেতে লাগল।

যদিও সামাজিক অপপ্রথাসমূহ নিয়ন্ত্রণ বা বিলোপসাধনের জন্য সরকারের অনুকূল মনোভাব ছিল, তবুও হিন্দুসমাজের তরফ থেকে তার বিপক্ষে যে বিরোধিতা আসবে, তা স্মরণ করে গোড়ার দিকে সরকার সংস্কারমূলক কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের

আন্দোলনের পর সরকার সে সাহস পায়। শীঘ্রই তারা বাল্যবিবাহ দমন করবার জন্য 'সঙ্গমের' ন্যূনতম বয়স-নির্দেশক এক আইন প্রণয়ন করেন (১৮৯১)। এ ছাড়া, তাঁরা আইন প্রণয়ন দ্বারা সাগর মেলায় 'শিশুবলি দেওয়া' প্রথারও বিলোপসাধন করেন (১৮৩০); তারপর ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা চড়ক উৎসবে পিঠে লোহার কাঁটা বিঁধিয়ে চড়ক গাছে ঘোরানোও বন্ধ করে দেন।

বলা বাহুল্য যে, এ সকল সামাজিক সংস্কার ও উন্নতিসাধনের পথ সুগম করে দিয়েছিল শিক্ষার প্রসার। শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। আগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভের অধিকার ছিল মাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের। কিন্তু ১৮৫১ থেকে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন সকল জাতির কাছে। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার অবদানও উল্লেখনীয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর, এদেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আরও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার প্রসার জনসাধারণকে উদার মনোভাবাপন্ন করে তোলে ও তাদের দীক্ষিত করে গণতান্ত্রিক মন্ত্রে। এর ফলে সমাজের ওপর বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সমাজের 'পাঁতি' দেওয়ার অধিকার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। পাঁতি দেওয়া বিধানসভার একচেটিয়া অধিকারে দাঁড়ায়। বিধানসভা গঠিত হওয়ার পর থেকে জাতি নির্বিশেষে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে। তাঁরাই এখন থেকে সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করে পাঁতি দিতে থাকেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজকে তা মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হয়।

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সৃষ্ট হল এক নতুন সাহিত্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তন করলেন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করলেন অনন্যসাধারণ নাটকসমূহ। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র রচনা করলেন নতুন থেকে নতুনতর সাহিত্য। তাঁদের রচনাবলী বাঙালীর চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করল নতুন পথে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে'র 'বন্দেমাতরম্'ই বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অভিযানের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। এই মন্ত্র বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সচেতন করে তুলল। এই পথের

পথিক হিসাবে এগিয়ে এলেন অনেকে—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁদের প্রচেষ্টা দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেল স্বাধীনতার পথে—সে স্বাধীনতা দেশ লাভ করল ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে, যদিও বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করে।

সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল বিজ্ঞানের অনুশীলন। এর সূচনা করেছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি এক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে তার নাম দিলেন 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অভ্ সায়েন্স'। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নানাজন এখানে গবেষণা চালিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন কল্যাণের পথে।

এদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এদেশে স্থাপিত হতে লাগল কলকারখানা। কয়লার ব্যাপক ব্যবহার এই প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে সহায়তা করল। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করল, দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের। পরে তড়িৎ শক্তির ব্যবহার শিল্পোদ্যমকে আরও অগ্রগতির পথে নিয়ে গেল। গ্রামের নিঃস্ব ও বেকার লোক ছুটে এল শহরের দিকে কাজের সন্ধানে। কলকাতা শহর এক বিরাট কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

তিন

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির সিভিলিয়ান কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফারসী প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণের সমাবেশ হয়। কিন্তু এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য কোম্পানির তরফ থেকে বিশেষ কিছু করা হয়নি। এ বিষয়ে কোম্পানি সচেষ্ট হন যখন ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদে এদেশের লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। তারই প্রথম ফসল 'কাউনসিল অভ এডুকেশন (১৮২৪)। দ্বিতীয় ফসল ওই সালেই সংস্কৃত কলেজ স্থাপন। সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসন্তান ছাড়া আর সকলের কাছে কলেজের দ্বার রুদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টাতেই

সংস্কৃত কলেজের দ্বার সকল জাতির কাছে উন্মুক্ত হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষারও প্রবর্তন করেন। শিক্ষার প্রসারে কোম্পানির তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় অসাধারণ সৎসাহস দেখিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবার পর সেখানে শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন হয়। মৃত ব্যক্তিকে ছুঁলে হিন্দুসমাজে তাকে পতিত বা একঘরে করবার ভয় দেখানো হয়। সেই মুহূর্তে মধুসূদনই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমাজের শাসন-ভয় অগ্রাহ্য করে একাজে অগ্রণী হন, এবং শব-ব্যবচ্ছেদ করে অসীম সাহসের পরিচয় দেন। ষাটের দশকের গোড়ায় দু'জন—ভোলানাথ বসু (১৮২৫-৮২) ও মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী এম. ডি. পান।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) চেষ্টাতেই এদেশে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। স্কটল্যাণ্ডবাসী এই ভারতপ্রেমিক পুরুষ এদেশে এসে আঠারো বৎসর ঘড়ির কারবার করে বেশ ধনশালী হয়েছিলেন। তারপর এদেশে শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করবার জন্ম তিনি ঘড়ির কারবার তাঁর সহকারী গ্রে সাহেবকে দান করে দিয়ে, অর্জিত সমস্ত ধনই ব্যয় করেছিলেন ছাত্রদের মঙ্গলার্থে। স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে যেসব ইংরেজি ও বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলির উপর তাঁর নজর ছিল। আরপুলির ফ্রি ভারনাকুলার স্কুল, পটলডাঙার ইংলিশ স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্কুলে নিয়মিত হাজিরায় উৎসাহ দেবার জন্ম তিনি নানা ধরনের পুরস্কার দিতেন। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের লেখাপড়ার কতদূর কি উন্নতি হচ্ছে তার খোঁজখবর রাখতেন ও তাদের অসুখ-বিসুখের সময় নিজে সেবা শুশ্রূষা করতেন ও তাদের চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করতেন। এরকম এক ছাত্রের সেবা করতে গিয়েই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হেয়ার মনেপ্রাণে ভারতকেই তাঁর স্বদেশ বলে ভাবতেন ও এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্ম অকৃপণভাবে নিজ সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে গিয়েছেন। স্কুল সোসাইটির অছিদের (ব্যারেটো অ্যাণ্ড কোম্পানি ও ম্যাকিনটশ অ্যাণ্ড কোম্পানির) বিপর্যয়ের পর দুটি স্কুল ছাড়া সোসাইটির অন্যান্য স্কুল যখন উঠে

যায়, তখন তিনি নিজ অর্থেই স্কুল দুটিকে (পটলডাঙার ইংরেজি স্কুল ও আরপুলির বাংলা স্কুল) চালান। এ দুটি স্কুল থেকেই বর্তমান হেয়ার স্কুলের উদ্ভব হয়।

চার

বেসরকারী উদ্যোগে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার অনেক পূর্ব থেকেই খ্রীস্টান মিশনারীরা এদেশে ইংরেজি ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দেবার জন্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। পলাশীর যুদ্ধের ২৬ বছর পূর্বেই ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে সেণ্ট অ্যানড্রুজ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেছিল। এরকম আরও দু' একটা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারী উইলিয়ম কেরী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শীঘ্রই তাঁরা হুগলী, দিনাজপুর ও যশোহর জেলায় আরও কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সকল বিদ্যালয়ে তাঁরা আধুনিক প্রণালীতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ভবানীপুরে জগমোহন বসু ও ধর্মতলায় ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব আরও একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেট ফরবস্ সাহেব চুঁচুড়ায় একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় শতাধিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং সেগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৭০০। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিও চুঁচুড়ায় এবং অন্যত্র ১৫টা স্কুল স্থাপন করেছিল। তাদের পাদরি রবার্ট মে সাহেবের উদ্যোগেই এ সকল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, এবং ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যাবার পূর্বে মোট ৩৬টা স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে চার্চ মিশনারী সোসাইটি ভূকৈলাসের জমিদার কালীশঙ্কর ঘোষাল প্রদত্ত একখণ্ড জমিতে একটি স্কুল স্থাপন করে। চার্চ মিশনারী সোসাইটির অর্থানুকূল্যে ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট নামে এক ব্যক্তি বর্ধমানেও কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে এই সকল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২০০। সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীষ্টিয়ান নলেজও ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা ও তার সন্নিকটে কয়েকটি স্কুল স্থাপন করে। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে এই সব স্কুলের সংখ্যা ছিল ১২।

সুতরাং এদেশে শিক্ষার প্রসারে খ্রীস্টান মিশনারীদের অবদানও খুব কম

ছিল না। এ ছাড়া, জেনারেল ক্লড মার্টিন নামে কোম্পানীর এক কর্মচারী বিনা-মূল্যে 'বিদ্যার্থীদের পাঠার্থে' এক বিদ্যায়তন স্থাপনের জন্য তেত্রিশ লক্ষ টাকা উইল করে রেখে যান। ওই টাকা থেকে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে চৌরঙ্গীতে 'লা-মার্টিনিয়ের কলেজ' নামে এক শিক্ষায়তন স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ও তার চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তা স্থাপন করা হয়।

মিশনারী এবং অন্যদের এসব চেষ্টার পূর্বেই কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে নিজ চেষ্টায় ইংরেজি শেখবার একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের (১৭৭৪) পর থেকেই এটা প্রকাশ পেয়েছিল। এ সময় আমরা সুপ্রিম কোর্টের আইনবিদ রামনারায়ণ মিশ্র ও আনন্দরামের নাম শুনি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও (১৮০১-১৮৬৮) নিজ অধ্যবসায়ে ইংরেজি শিখে একজন প্রখ্যাত আইনবিদ হয়েছিলেন ও বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন। তা ছাড়া, সুপ্রিম কোর্টের কেরানীদের তো ইংরেজি শিখতেই হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শেরিফের অফিসের হেড ক্লার্ক রামমোহন মজুমদারের নাম হিকির 'স্মৃতিকথা'র মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এ ছাড়া, এটর্নীদের ক্লার্কদেরও ইংরেজি জানতে হত। এরকম কেরানীদের মধ্যে আমরা অ্যাটর্নী হিকির হেড কেরানী রামধন ঘোষের নাম শুনি। সে যুগে যাঁরা বেনিয়ানি ও দাওয়ানি করতেন তাঁদেরও ইংরেজি জানতে হত। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও দ্বারকানাথ ঠাকুরও (১৭৯৪-১৮৪৬) স্কুলে না পড়ে ভালো ইংরেজি জানতেন।

পাঁচ

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করবার জন্য ওই বছরেই 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। পরের বছর 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' নামে আর একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করবার জন্য কলকাতায় যেসব বিদ্যালয় আছে, সেগুলিকে সাহায্য করা ও নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা। কিন্তু এর অছিরা দেউলিয়া হওয়ায় এদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে দুটি ছাড়া সবগুলিই কয়েক বছর পর উঠে যায়। ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটির ইউ-রোপীয়ান সেক্রেটারী ছিলেন এবং তিনিই নিজ অর্থে এই স্কুল দুটিকে চালাতেন। এ সময় রামমোহন রায়ও নিজ ব্যয়ে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে

গৌরমোহন আঢ্য নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও সরকারী সাহায্য ছাড়াই 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' স্কুলটি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আলেকজাণ্ডার ডাফও (১৮০৯-১৮৭৮) কলকাতায় এসে গিয়েছেন। তিনিও কলকাতা এবং অন্যত্র কয়েকটি স্কুল ও একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজেও নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য একটি পাঠশালা বিভাগ খোলা হয়। ইতিমধ্যে বিনা বেতনে ইংরেজি শিক্ষা দেবার জন্য একটা 'হিন্দু ফ্রি স্কুল'ও স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে মতিলাল শীল 'শীলস্ ফ্রি কলেজ' স্থাপন করেন। এ ছাড়া, ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন' ও ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' স্থাপনেও মতিলাল সহযোগিতা ও অর্থসাহায্য করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় দান এবং যার জন্য সহরবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, তা হচ্ছে মেডিকেল কলেজ নির্মাণের জন্য ভূমি দান।

৬৮

আমরা আবার হিন্দু কলেজেই ফিরে আসছি। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে তারিখে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ পটলডাঙায় গোলদিঘির উত্তরে নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে প্রবিষ্ট হয়। ওই সালেই হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) নামে এক বিশিষ্ট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষক হিন্দু কলেজে যোগদান করেন ও তৎকালীন ছাত্রদের মনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটান। তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন। ছাত্রদের কাছে তিনি অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলেজে পড়বার সময় ও কলেজের বাইরে তিনি পাশ্চাত্ত্য মনীষাদের চিন্তাধারা ব্যাখ্যা ও প্রচার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের ও যুক্তির ভিত্তি পাকা করে দেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আটজন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯৩) ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮) পরবর্তীকালে বাঙলা তথা ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলনের পুরোধা হয়ে দাঁড়ান। তারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত। এঁরাই ভারতের নবজাগৃতির প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন।

সাত

এদিকে স্ত্রীশিক্ষার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা চলছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই খ্রীস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতায় মেয়ে স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। তবে সেসব স্কুলে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা যেত না। তার মানে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই স্কুলে পড়তে যেত। তবে তা থেকে বুঝায় না যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা অশিক্ষিতা থাকত। তারাও রীতিমত শিক্ষিতা হত। এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী শিক্ষিকা ছিল, যাদের সাহায্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখত। এ-রকমভাবেই রাজা সুখময় রায়ের (?-১৮১১) ছেলে রাজা শিবচন্দ্র রায়ের মেয়ে হরসুন্দরী সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি এই তিন ভাষায় এমন সুশিক্ষিতা হয়েছিলেন যে পণ্ডিতেরাও তাঁকে ভয় করতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও বৈষ্ণবী শিক্ষিকা-দের কাছে লেখাপড়া শিখত।

হিন্দু মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া বিস্তারের জন্য কলকাতায় কয়েকটি খ্রীস্টান মহিলা সমিতির উদ্ভব হয়েছিল: তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে 'দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ফর দি এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাণ্ড সাপোর্ট অভ্ বেঙ্গলী ফিমেল স্কুলস্'। নন্দবাগান অঞ্চলে (গৌরীবেড়ের নিকট) এরা প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। পরে এরা গৌরীবেড়ে, জানবাজার, চিৎপুর, শ্যামবাজার, বরাহনগর প্রভৃতি অঞ্চলেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। এদিকে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্য ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ সুখময় রায়ের ছেলে রাজা বৈদ্যনাথ রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে, হেদুয়ার পূর্বদিকে সেনট্রাল স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮১) উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু সরকারী অনুমোদন পাননি। (লেখকের 'প্রসঙ্গ পঞ্চবিংশতি দ্রঃ')। তবে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) কর্তৃক কলকাতায় মেয়ে স্কুল স্থাপনের পূর্বে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা কেউই স্কুলে পড়তে যেত না।

আট

বেথুন সাহেব ছিলেন বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য ও কাউনসিল অভ্ এডুকেশনের সভাপতি। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন।

কাউনসিল অভ্‌ এডুকেশনের সদস্য রামগোপাল ঘোষের (১৮১৫-৬৮) সঙ্গে পরিচিত হবার পর, তিনি তাঁর কাছে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য স্কুল খোলার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। রামগোপাল উৎসাহিত হয়ে বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের (১৮১৪-১৮৭৮) (তিনি ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র) কাছে এই পরিকল্পনার কথা বলেন। দক্ষিণারঞ্জন প্রথম তাঁর সিমলা স্ট্রিটের বৈঠকখানা বাড়িটা বিনা ভাড়ায় স্কুলের জন্য ছেড়ে দেন। এই সঙ্গে তাঁর পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটিও দান করেন। দক্ষিণারঞ্জন স্কুলের জন্য স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য আধ বিঘা জমি ও এক হাজার টাকা দেন। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ মে তারিখে বিদ্যালয়টি 'নেটিভ ফিমেল স্কুল' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ৬ নভেম্বর তারিখে হেদুয়ার পশ্চিম দিকের ভূমিতে বর্তমান স্কুল বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে বেথুন সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুর পর এর নাম করা হয় 'বেথুন স্কুল'। ১৮৫০ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়ের আর একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বেথুন নিজ অর্থব্যয় ছাড়া, তাঁর যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি এই স্কুলের জন্য দান করেন। কিন্তু স্কুলভবন তৈরি হবার আগেই আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে স্কুলের ব্যয়ভার সরকার বহন করছেন। বেথুন স্কুলের মেয়েদের গোড়া থেকেই গাড়ি করে বাড়ি থেকে আনা হত ও পৌঁছে দেওয়া হত।

এরপর আরও মেয়ে স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয়, তার বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যেই দু-একজন মেয়ে, ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শেখে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে দুজন মেয়ে কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসবার অনুমতি পায়। বেথুন কলেজের ছাত্রী কাদম্বিনী বসু (১৮৬১-১৯২৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণা ছাত্রী। সরকার ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে একমাত্র ছাত্রী কাদম্বিনীর জন্যই বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে কাদম্বিনী বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেন; বেথুন কলেজে তখন মাত্র হিন্দু মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল। চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬৯-১৯৪৪) নামে আর একটি মেয়ে খ্রীস্টান বলে বেথুন কলেজে পড়বার প্রবেশাধিকার পায়নি। সে

এফ. এ. পড়া শুরু করে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে অ্যালেন ডি. অ্যাব্রু নাম্নী এক খ্রীস্টান ছাত্রী বেথুন কলেজে প্রবেশাধিকার পায়। তার ফলে চন্দ্রমুখী বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. ও ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজি অনার্স-সহ এম. এ. পাস করেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মেয়ে যিনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি বেথুন কলেজে অধ্যাপনা করে কর্মজীবন শুরু করেন ও ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ওই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন।

এদিকে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর মেডিকেল কলেজে পাঁচ বৎসর পড়াশোনা করে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিলাত যান। পরের বছর এল. আর. সি. পি. (এডিনবরা), এল. আর. সি. এস. (গ্লাসগো) এবং ডি. এফ. (ডাবলিন) উপাধি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিছুদিন লেডি ডাফরিন হাসপাতালে ডাক্তারি করার পর তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। সুবক্তা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনি প্রথম নারী বক্তা।

কাদম্বিনীর সঙ্গে মেডিকেল কলেজে আরও দু'জন মেয়ে ডাক্তারি পড়ত। তারা ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ও বিধুমুখী বসু। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রথম এম. বি. পরীক্ষায় ভার্জিনিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। বিধুমুখীও পাস করেন। কাদম্বিনী পাস না করলেও তাকে মহিলাদের স্পেশাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল।

এসব ঘটনার বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যেই একজন মহিলা আইনের বি. এল. (বেচিলার অভ্ ল) পরীক্ষায় পাস করেন (১৯১৩)। নাম তাঁর রেজিনা গুহ (১৮.৩.১৯১৯)। তারপর মেয়েদের মধ্যে আইন পড়বার প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে যায়। বর্তমানে বহু মহিলা আইনজ্ঞ আছেন এবং কয়েকজন হাইকোর্টের বিচারপতিও নিযুক্ত হয়েছেন। সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, বর্তমানে মেয়েদের মধ্যে আইন পড়ার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের দিনে মেয়েদের অগ্রগতি সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক। প্রতি ঘরেই দু-চারজন মহিলা গ্রাজুয়েট দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য সম্পূর্ণ বিস্ময়কর। বিদেশে গিয়েও তাঁরা তাদের প্রতিভাবলে অনেক উচ্চ পদে নিযুক্তা হয়েছেন। এমনকি জগতের সবচেয়ে বড় বিশ্বকোষ 'এনসাইক্লো-

পিডিয়া ব্রিটানিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীতেও একজন বাঙালী মহিলা আছেন, নাম সুজাতা ব্যানার্জি। আর দেশের কথা তো ছেড়েই দিন। সমাজের সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এগিয়ে যাবার প্রবণতা আজ ঢের বেশী। এক কথায়, তারা আজ একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছে।

মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরোজিনী নাইডুর (১৮৭৯-১৯৪৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। ১২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, উচ্চশিক্ষার জন্য কেমব্রিজে যান। কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন।

নয়

আমরা আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে ফিরে আসছি। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। একইসঙ্গে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, একটা বোম্বাই-এ ও আর একটা মাদ্রাজ-এ। কিন্তু রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয় বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সকলের শীর্ষে স্থান পায়। এর অনুমোদন দেবার ক্ষমতা ভারত ছাড়া, ব্রহ্ম ও সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর শিক্ষার বিস্তার খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বি. এ. পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে যদুনাথ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওই পরীক্ষায় পাস করেন।

দশ

আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদক ও পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে, যখন ইউনিভার্সিটি ল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের পর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৪-১৯২৪) প্রচেষ্টায় যখন নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয় এক নতুন মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

যুক্তিবাদী সমাজ ও সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নটাই ছিল বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্রান্তিকাল। এই ক্রান্তিমুহূর্ত রচনায় অসামান্য অবদান ছিল মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাংলা মুদ্রণের মান নির্ধারণ করেন ও নানাবিধ বই লিখে বাংলা গদ্যের একটা আদর্শ স্থাপন করেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর এক শিক্ষিত রুচিশীল মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয়, তাঁরা যে মাত্র সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনার দিকেই মন দিলেন তা নয়, তাঁরা সমাজ সংস্কারের দিকেও মন দিলেন। সমাজ সংস্কারের দিক থেকে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক লিখে সনাতনী সমাজের ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। ওই নাটক দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে জন্মের সঙ্গে কৌলীন্যের কোন সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কয়েকটি নিবন্ধ লিখে প্রমাণ করলেন শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী বালবিধবার পুনর্বিবাহ দেবার অনুকূলে কোন বাধা নেই। বহু টাকা খরচ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটি বিধবা বিবাহও দিয়ে দিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) ছাড়া, ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে রামনারায়ণ 'নব-নাটক' নামে আর একখানা নাটক লিখে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে জেহাদ চালালেন। এসবই হচ্ছে যুক্তিবাদী সমাজের সাহিত্য। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় এসে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) 'আত্মীয়সভা'র মাধ্যমেই এই যুক্তিবাদী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর, ওর অন্যতম শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) যখন বাঙালী ছাত্রদের ফরাসী বিপ্লবের নীতি, পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য ও দর্শন যথা শেকস্পীয়ার, স্কট্, বায়রন্, বাইরন, বেকন, হিউম, পেইন ও বেনহাম প্রমুখ লেখকদের রচনার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দিলেন, তখন যুক্তিবাদী সমাজ জোরদার হয়ে দাঁড়াল। তারপর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা মারফত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বাঙালী পাঠককে কারলাইল, ফিকটে, নিউম্যান ও পারকারের চিন্তাধারার সঙ্গেও বাঙালী সমাজকে পরিচিত করালেন।

এ যুগেই কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪৪-৭০) প্রতিষ্ঠা করেন 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা। তিনি বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করে এক কীর্তি স্থাপন করেন। তাঁর রচিত নাটক 'বাবু', 'বিক্রমোর্বশী', 'সাবিত্রী সত্যবান' ও 'মালতী মাধব' এবং সামাজিক ব্যঙ্গ রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়।

আবার এ যুগেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব ঘটে মহিলাদের। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণকামিনী প্রকাশ করেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তবিলাসিনী', ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে কামিনীসুন্দরী তাঁর নাটক 'উর্বশী', ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে হেমাঙ্গিনী তাঁর উপন্যাস 'মনোরমা', ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাসসুন্দরী তাঁর 'আমার জীবন' ও ১৮৭৭ থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদনা করতে লাগলেন 'ভারতী' পত্রিকা। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বনলতা দেবী অন্তঃপুর নামে এক মাসিক পত্রিকা বের করেন যাতে মাত্র মেয়েদের লেখা ছাপা হত।

দুই

যুক্তিবাদী সমাজের সাথে সাথে অভ্যুত্থান ঘটল জাতীয়তাবাদী সমাজের। জাতীয়তাবাদ অব্যাহত রইল ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। এই যুগের প্রারম্ভে বাঙালীর চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল অগস্ট কোঁৎ-এর 'পজিটিভিজম', জন স্টুয়ার্ট মিলের ও হার্বার্ট স্পেনসারের চিন্তাধারার দ্বারা। পাশ্চাত্য দেশের 'রোমান্টিসিজম' চিন্তাধারার প্রভাবও ছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোসারুরফ হোসেন, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং ১৮৮৫ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত সময়কালে নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, কামিনী রায়, কায়কোবাদ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের রচনার মধ্যে আমরা উক্ত চিন্তাধারার প্রভাবই লক্ষ্য করি। তাঁদের রচনার দ্বারা আরও যাঁরা এই শেষোক্ত যুগের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন ও বাঙালীর চিন্তাধারাকে নতুন দিগন্তের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ,

দীনেশচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ লেখকগণ। এ যুগের কবিদের মধ্যে স্মরণীয় অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এই যুগেই স্থাপিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে)। ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত সময়কালে আমরা বাংলা সাহিত্যের নায়ক হিসাবে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), অনুরূপা দেবী, (১৮৮১-১৯৫৮), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), অরবিন্দ, মোজাম্মেল হক, প্রমথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৬৫-১৯৪৩)। এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'উদ্বোধন' 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি পত্রিকাসমূহ। এই যুগেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার (১৯১৩)। তিনিই ছিলেন এ যুগের বাণীমূর্তির জীবন্ত প্রতীক। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে উন্নীত করেছিলেন বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে। ওই যুগেরই চিন্তানায়করা যথা ব্রহ্মানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, (১৮৭০-১৯২৫) প্রমুখেরা আধুনিক গদ্য লেখার রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই যুগেই (১৯১৪-১৯১৯) অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) তাঁর ৫০০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'বর্তমান জগৎ' গ্রন্থ লিখে বাঙালী পাঠককে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ইতিহাস, শিল্প ও রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। বাঙালীর চিন্তাধারার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি তিনিই করেন। এ যুগে শিশুসাহিত্য রচনা করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭), যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) ও সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। এ যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮)-কর্তৃক সম্পাদিত বাংলা ভাষায় প্রথম 'বিশ্বকোষ' প্রকাশ। এ যুগে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) মহাশয় তাঁর 'সবুজপত্র' (১৯১৪) মারফত চলতি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেন। যদিও শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'নারীর মূল্য', 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ', 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) ও 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব (১৯১৭) এই যুগেই প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলেও তাঁর 'শ্রীকান্ত'-এর ২য় (১৯২৮), ৩য় (১৯২৭), ও চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০),

'পথের দাবী' (১৯২২) প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাস পরবর্তী যুগে প্রকাশিত হয়। কাহিনীকার হিসাবে তিনি ছিলেন এ যুগের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বঞ্চিত সমাজের মর্মবেদনা ও নারীহৃদয়ের জটিল রহস্য তিনিই প্রথম উদ্ঘাটিত করেন।

তিন

পরবর্তী যুগের (১৯১৯-১৯৪৭) লেখকদের মধ্যে উল্লেখনীয় নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫০), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ([illegible]৯৫৫), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭১), নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), অন্নদাশঙ্কর রায়, জসিমুদ্দিন (১৯০৪ ১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪), শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৪), সুখলতা রাও, মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোকুল নাগ (১৮৯৫-১৯২৫), বন্দে আলী মিঞা (১৯০৬-১৯৭৯), সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১ ১৯৭৪), মুজফ্ফর আহমেদ (১৮৮৯-১৯৭৩), যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬), প্রমুখ। নজরুলের গান ও কাব্য এ যুগের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সকল শ্রেণীর মানুষকেই মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। এ যুগের পুরুষদের মধ্যে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০), এবং মহিলাগণের মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও রাধারাণী দেবী। এ যুগের শেষের দিকে (১৯৩৫-১৯৪৭) আবির্ভূত হন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), প্রবোধ সান্যাল (১৯০৭-১৯৮৩), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯২ ১৯৫৪), অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সুভাষচন্দ্র বসু, দিলীপ রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সুধীন দত্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), শচীন সেনগুপ্ত (১৮৯১-১৯৬১), লীলা মজুমদার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, গোপাল হালদার, আশালতা দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন প্রমুখ। এ যুগেই প্রথম অর্থনীতির বই লেখেন অধ্যাপক বিনয় সরকার, অনাথগোপাল সেন এবং অতুল সুর। এ ছাড়া, আমিই প্রথম বাংলায় লিখি নৃতত্ত্বের বই। বে-সরকারী উদ্যোগে প্রথম বাংলায় আইনের বইও তর্জমা করি। এ যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই।

চার

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সমাজের প্রতি স্তরে প্রকাশ পেয়েছে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি। সাহিত্যের প্রধান ধর্ম হচ্ছে সমাজকে বিপথ থেকে ঠিক পথে নিয়ে যা[illegible] সাফল্য এ যুগের সাহিত্য অর্জন করতে পারেনি। এ যুগের সাহিত্যিকদের না আছে সংগ্রামী মন, না আছে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত সুসংহত ও দুর্নীতি-মুক্ত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা। দু-একজনের মধ্যে মাত্র লক্ষ্য করেছি এ সমাজের বাস্তব চিত্রাঙ্কণের প্রয়াস। যেমন বিমল মিত্র মহাশয় তাঁর 'আমি' উপন্যাসে চেষ্টা করেছেন রাজনৈতিক নেতাদের 'সাধুতা'র মুখোশ খুলে দেবার। বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি-দূষিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যা ঘটে, বর্তমান সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সবাই সাহিত্যিক হতে চান, যার ফলে সৃষ্ট হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ—শ্লীল ও অশ্লীল। তাঁদের সকলের নাম করাও এখানে অসম্ভব। তবে যাঁদের নাম না করলে গভীর অপরাধ করা হবে তাঁদেরই নাম করছি। কবিতার ক্ষেত্রে সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশ, নীরেন চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়; উপন্যাসের ক্ষেত্রে, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, বিমল কর, সুবোধ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী, আশাপূর্ণা দেবী, শংকর, সন্তোষ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, ও বুদ্ধদেব গুহ, এবং নিবন্ধের ক্ষেত্রে ড. নীহার রায়, সুশীল রায়, গোপাল রায়, হীরেন দত্ত, বিনয় ঘোষ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল সুর, উজ্জ্বল মজুমদার, অজিত ঘোষ ও নারায়ণ চৌধুরী। আর ব্যঙ্গ-রচনায় এ যুগের যিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

সবশেষে সাম্প্রতিক কালে বাঙলার সাহিত্য ও প্রকাশ ক্ষেত্রের কয়েকটি

শুভ লক্ষণের কথা বলতে চাই। প্রথম বিশিষ্ট লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ; দ্বিতীয়, বিদেশী লেখকদের বহুল বাংলা অনুবাদ প্রচার; ও তৃতীয়, পুস্তক বিপণনের জন্য বই মেলার প্রবর্তন। আর এক শুভ লক্ষণ হচ্ছে প্রকাশকদের নিবন্ধ সাহিত্য প্রকাশের দিকে প্রবণতা। চল্লিশের দশকে অসীম সাহসের সহিত এই অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার শ্রীশকুমার কুণ্ড। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হচ্ছেন 'সাহিত্যলোক'-এর নেপালচন্দ্র ঘোষ। এখন অবশ্য অনেক প্রকাশকই নানা সুধীজনের নিবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে আমরা প্রথম দেখি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়, খ্রীস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ ও ব্রাহ্মধর্মের উত্থান ও বিকাশ। সকলের শেষে আমরা শুনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের মুখে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী।

দুই

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলায় দলিত পতিত অন্ত্যজ জাতিসমূহের মুক্তির জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম নামে এক ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। আবার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ও হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে একদিন নদীয়ার উলা গ্রামের (এখন কল্যাণী) বাসিন্দা মহাদেব বারুই নিজ পানের বরোজের মধ্যে এক পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পান। তিনি তাকে এনে পালন করেন। তিনি তার নাম রাখেন পূর্ণচাঁদ। একটু বড় হয়ে পূর্ণচাঁদ উদাসীন হয়ে চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবনের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়। নানা জাতির লোক তাঁর অনুরাগী হয়। তখন তাঁর নাম হয় আউলচাঁদ। সাতাশ বছর বয়সে বেজরা গ্রামে তিনি ধর্মগুরু হিসাবে প্রকট হন। এখানেই তাঁর বাইশ জন শিষ্য জুটে যায়। আউলচাঁদকে তাঁর ভক্তরা শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন—'শ্রীচৈতন্যদেব যবনপ্রাপ্তি ও হবিজনসেবায় মনোমত পথ পাননি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাই নতুন পথ প্রবর্তনের জন্য তিনি ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হন।' এদের মতে কর্তা বা ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আরও এদের মতে সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতি বা সম্প্রদায়-বিচার নেই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই।

১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে আউলচাঁদের মৃত্যু হয়। তখন রামশরণ পাল কর্তা হন। রামশরণের মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁর স্ত্রী সতীমা ও তাঁর পরে রামদুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্র বংশানুক্রমে কর্তাভজাদলের গদির অধিকারী হন।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদ্বয় মার্শম্যান ও কেরী প্রায়ই ঘোষপাড়ায় রামদুলালের কাছে যেতেন ও তাঁর সঙ্গে pantheism সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করতেন

(**'Calcutta Review', Sixth Part, 1846, Page 407**)।

১৮২৯-৩০ খ্রীস্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ ভারতে আসার পর, তিনিও ঘোষপাড়ায় যেতেন এবং কর্তাভজাগণের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। পঞ্চানন অধিকারী কৃত এক পুরানো হস্তলিখিত পুঁথিতে এর বিবরণ আছে। তাতে লেখা আছে—'রাজা রামমোহন রায় যেতেন তাঁর পাশ / অমৃত রস পান করি মিটাইতে আশ / অনেক সাহেব তিনি সাথে লয়ে যান / অনেকেই মন আশ্রয় করি প্রণিধান ॥ / ডাফ সাহেব পাদরী যেতেন তাঁর পাশে / লইতেন শিক্ষা যেয়ে ঘোষপাড়া আবাসে ॥' (শ্রীরামাশ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই পুঁথিখানি প্রকাশিত হয়েছিল)।

শুধু রাজা রামমোহন রায় কেন, কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘোষপাড়ায় যেতেন ও কর্তাভজাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। (সুকুমার সেন, ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭)। ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবারের সকলের নামকরণে 'সত্য' শব্দ সংযুক্ত হওয়া ওই পরিবারের ওপর কর্তাভজা দলের প্রভাব সূচিত করে। প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (স্কটিশ চার্চেস কলেজের) অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, পৃষ্ঠা ১৫১)। কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে এখনও সতীমার ঘট সংরক্ষিত আছে ও নিত্যপূজাদি হয়ে থাকে।

বাঙলাদেশের অনেক গ্রামের অধিকাংশ মুসলমানই সতীমায়ের ভক্ত। মুর্শিদাবাদের কুমিরদহ এরূপ একটি গ্রাম। এ সম্বন্ধে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীঅশোক মিত্র, আই. সি. এস. সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হয়েছে—'এই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান সম্প্রদায়-ভুক্ত। কিন্তু ইহারা ঘোষপাড়ার সতীমায়ের সত্যধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। ডিম মাংস, মদ্য কেহ গ্রহণ করেন না। কেহ সত্যধর্মবহির্ভূত কার্য করিলে বা প্রকাশ পাইলে তাহাকে সমাজে দণ্ড পাইতে হয়।'

ভক্তরা বলে, যার কেউ নেই, তার সতীমা আছেন।' মানিক সরকার লিখেছেন—'মধ্যযুগের বাঙলায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'যার কেউ নেই'-দের সংখ্যাই ছিল বেশি। আর্থিক অনটন ও সামাজিক নিষ্পেষণে জর্জরিত

কৃষকসমাজের দরিদ্র অংশের অগণিত নর-নারীর মধ্যে একটি অংশ কর্তাভজা ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই দেখা যায় ভক্তদের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিঃস্ব কৃষিসমাজের মানুষ। তারা সমাজজীবনে অন্ত্যজ, অর্থনীতিতে নিঃস্ব। সম্ভবত বাঁচার আশাতেই সতীমার উপর নির্ভর করে। ('পশ্চিমবঙ্গ', ২৯ জুন ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১২৫৭)। বিশেষ করে সতীমা অন্ত্যজসমাজের অবহেলিত-বঞ্চিত নারীসমাজকে কর্তাভজা মতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পূর্বেই কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের 'সত্যধর্ম' এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, নবপ্রসূত ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরা তাতে বিচলিত হয়ে ওঠেন, এবং কর্তাভজাবলম্বীদের বিপক্ষে তির্যক মন্তব্য করতে থাকেন। কিন্তু দায়িত্বশীল প্রাজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আমরা কর্তাভজা-সম্প্রদায় সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাই। এরূপ একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। তিনি যখন নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন তখন তাঁকে ঘোষপাড়ার মেলার সুবন্দোবস্তের জন্য, এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই মেলা-প্রাঙ্গণের এক পাশে তাঁবু ফেলে অবস্থান করতে হয়। তিনি তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন :

'এখন যে harmony of scriptures' বা ধর্মের সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে এই রামশরণ পালই তাহা সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম, সকল আচার সত্য—এমন উদার মত এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মসংস্থাপক প্রচার করেন নাই। অতএব রামশরণ পাল আমি তোমাকে নমস্কার করি।' ক্রীশ্চান ধর্মের 'দশ আদেশ'-এর মত কর্তাভজা ধর্মেও দশটি কর্ম নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ কর্মের মধ্যে তিনটি হচ্ছে কায়কর্ম —পরস্ত্রী-গমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যাকরণ। তিনটি মনঃকর্ম হচ্ছে— পরস্ত্রী-গমনের ইচ্ছা, পরদ্রব্যহরণের ইচ্ছা ও পরহত্যাকরণের ইচ্ছা। চারটি বাক্যকর্ম হচ্ছে—মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থকবচন ও প্রলাপভাষণ। এই দশটি নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করাই হচ্ছে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 'সত্যধর্ম'।

তিন

বাণিজ্য উপলক্ষে পর্তুগীজদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল। পর্তুগীজরা জোর করে এদেশের

লোকদের খ্রীস্টান করত। এ সম্বন্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের অনুমোদন ছিল। খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য পর্তুগীজরা বাংলা গ্রন্থও রচনা করত। এরূপ এক গ্রন্থ হচ্ছে ডোম এন্টনিও রোজারিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। ডোম এন্টনিও আগে হিন্দু ছিল। ধর্মান্তরিত হবার পর ডোম এন্টনিও শুধু এই গ্রন্থখানিই রচনা করেনি, ঢাকা অঞ্চলে ২০,০০০ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিল। তাছাড়া, পর্তুগীজরা এদেশের মেয়েদের বিবাহ করা ও রক্ষিতা হিসাবে রাখার ফলে এদেশে বেশ এক সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীস্টান সমাজ গড়ে উঠেছিল।

[illegible]রা গোড়ার দিকে ধর্মপ্রচারের বিরোধী ছিল। সেজন্যই মার্শম্যান, কেরী প্রমুখ ধর্মপ্রচারকদের দিনেমার সরকার শাসিত শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তার ফলে, শ্রীরামপুরে প্রটেস্টান্ট খ্রীস্টান মিশনারীদের একটা কেন্দ্র গঠিত হয়ে উঠেছিল। প্রথম যে বাঙালীকে তারা খ্রীস্টান করে, সে একজন ছুতোর মিস্ত্রি, নাম কৃষ্ণচন্দ্র পাল। তার ভাঙা হাত চিকিৎসা করে তারা ঠিক করে দিয়েছিল। সাহেবদের দয়া দেখে সে খ্রীস্টান হয়েছিল।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদের বলে খ্রীস্টান মিশনারীরা এদেশে ধর্মপ্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। তার ফলে দলে দলে খ্রীস্টান মিশনারীরা এদেশে আসতে থাকে। বিশ বছরের মধ্যে তারা বহু হিন্দুকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে। শুধু তাই নয়। তারা হিন্দুধর্মের নিন্দা ও কুৎসা এবং হিন্দু দেবদেবী ও মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করতে থাকে। নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের তারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ দিয়ে অপর পাঁচজনকেও খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করতে উৎসাহ দেয়। মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়সমূহে তারা প্রকাশ্যে খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করে।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ এদেশে আসবার পর খ্রীস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণের অভিযান আরও জোরদার হয়। এতদিন নিম্ন-শ্রেণীর লোকরাই খ্রীস্টান হত। এখন হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকরাও খ্রীস্ট-ধর্মের প্রতি আগ্রহী ও অনুরক্ত হতে থাকে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (১৮০১-১৮৬৮) একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের খ্রীস্টান হওয়া তার দৃষ্টান্ত। খ্রীস্টান মিশনারীদের এই অভিযানকে অনেক পরিমাণে দমিত করেছিল ব্রাহ্মধর্ম।

চার

রামমোহন রায়কে (১৭৭২-১৮৩৩) ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। ব্রাহ্মধর্ম বলতে তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য 'সত্যধর্ম' বুঝতেন। 'সত্যধর্ম' অনুযায়ী প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের আরাধনা নিষিদ্ধ ছিল। সেজন্য ব্রাহ্মরা ছিলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম'-এর উপাসক। তবে তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন না। এটা বুঝা যায় ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে রামানুজাচার্য প্রবর্তিত বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের সাদৃশ্য থেকে। মোটকথা, রামমোহন হিন্দুধর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। এটা প্রকাশ পায় তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উপবীত ধারণ করা ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার না করা থেকে।

১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট তারিখে রামমোহন ব্রাহ্মদের উপাসনার জন্য আপার চিৎপুর রোডে (বর্তমান রবীন্দ্র সরণী) ব্রাহ্মদের এক নিজস্ব উপাসনা গৃহ স্থাপন করেন। এটাই পরবর্তীকালে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়।

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) প্রমুখ উনিশজন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (১৭৮৬-১৮৪৫) কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য সংগঠনও তৈরী করা হয়। প্রথম ব্রাহ্ম প্রচারক হাজারীলাল, দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় অল্পসময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লোককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। ঢাকা, মেদিনীপুর, রংপুর, কুমিল্লা, বাঁশবেড়িয়া, সুখসাগর, প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের একজন বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। তিনিও দেওঘরে ব্রাহ্মসমাজের এক উপাসনা গৃহ স্থাপন করেন, যদিও আজ তা ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্মধর্ম বাঙলার যুবসমাজে এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সুদূর মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সর্বধর্মসমন্বয়কারী ধর্ম বলে ঘোষণা করেন এবং এর 'নববিধান' নাম দেন। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে নববিধান সম্প্রদায়ের নতুন উপাসনা মন্দির স্থাপিত হয়। এর নাম দেওয়া হয় 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ ব্রাহ্মদের (যথা শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ) গুরুতর মতভেদ হওয়ায়, তারা ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমান

বিধান সরণী) 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুব আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার, নারীসমাজ উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি বিশেষভাবে জড়িত ছিল।

আজ ব্রাহ্মরা দাবী করছে, তারা এক নতুন ধর্মসম্প্রদায়। এটা ঠিক নয়। ব্রাহ্মরা হিন্দুসমাজেরই এক প্রগতিশীল সম্প্রদায় বিশেষ। তারা যে হিন্দুই এটা প্রকাশ পায় রামমোহনের উপবীত ধারণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার না করা, কেশবচন্দ্রের হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়া ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (১৯০৫) নিজ পরিবারের [illegible] উপনয়ন দেওয়া ও অসবর্ণে মেয়েদের বিবাহ না দেওয়া থেকে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন—'জ্ঞান ও প্রেম-সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা—তদ্ভাবগতের চেতনা এই সাধনা করতে হবে। ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে। ইহা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম।'

পাঁচ

সনাতনী হিন্দুসমাজ গোড়া থেকেই খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিক্রিয়ামূলক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। এটা প্রশমিত হয়, যখন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'সর্বধর্ম এক', এই বাণী প্রচার করেন।

রামকৃষ্ণদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) জন্ম হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষে হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, মাতা চন্দ্রমণি সরলতা ও দয়ার প্রতীক ছিলেন। রামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম ছিল গদাধর। পড়াশোনায় মন ছিল না, কিন্তু নিবিষ্টমনে শুনতেন কথকঠাকুরদের মুখে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ও কাহিনীসমূহ। বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন ও নিজের মনের আবেগে গৃহে রঘুবীরের বিগ্রহের সেবা করতেন।

ষোল-সতেরো বৎসর বয়সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। রামকুমার রানী রাসমণি (১৭৯৩-১৮৬১) প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ির পূজারী নিযুক্ত হন। রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ ওই পদে অধিষ্ঠিত হন। পূজারী হয়ে তিনি মৃন্ময়ী দেবীমূর্তিতে চিন্ময়ীর দর্শন পান। পূজা করতে বসেন, পূজা হয় না। মায়ের মাথায় ফুল না দিয়ে নিজের মাথায় ফুল দেন। মাকে ভোগ দেবার আগে নিজেই ভোগ এঁটো করে ফেলেন। দিনরাত মা, মা করে

কাঁদেন। শেষকালে আর পূজা করতে পারলেন না। উন্মাদের ন্যায় ঘোরাফেরা করতে থাকেন। রাসমণির জামাই মথুরবাবু মহাপুরুষ বোধে তাঁর সেবা করতে থাকেন। অতঃপর বিভিন্ন ধর্মমার্গের সাধনায় রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেন। সব ধর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ফলে, ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন। তখন তিনি প্রচার করেন : 'সব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ'।

তেইশ বছর বয়সে, ছ'বছরের মেয়ে সারদামণির সঙ্গে বিবাহ হয়। কখনও দৈহিক সম্পর্ক হয়নি। উনিশ বছর বয়সে সারদামণি যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, রামকৃষ্ণ তাঁকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করেন ও মা বলে সম্বোধন করেন।

শীঘ্রই কলকাতার শিক্ষিত সমাজ তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান, কামি ই যু...." বিমুক্ত জীবন, সংগীত ও সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্মের কঠিন তত্ত্বসমূহ বোঝানোর শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করে ও তাঁকে যুগাবতার পরমহংস বলে ঘোষণা করে। দক্ষিণেশ্বর তীর্থস্থানে পরিণত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ড. মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) প্রমুখ বহু ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে আসেন। এছাড়া, ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী। তাদের মধ্যে তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ।

রামকৃষ্ণই বঙ্গীয় যুবকসমাজকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে সাহেবিয়ানার অনুকরণ থেকে মুক্ত করেন। তাঁর মতে সমাজের মঙ্গল ও সেবার মধ্যে বাঁচার আদর্শ ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পথ। তাঁর প্রচারিত শক্তি উপাসনাই বিংশ শতাব্দীতে বিপ্লবীদের অগ্রধাবণ করার মনোবল যোগায়।

৮২

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর পরিব্রাজক হয়ে ভারতের নানা স্থান ঘুরে, বিদেশে গিয়ে বক্তৃতা করে ভারতের ধর্মমত ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদেশীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে বিদেশীদের শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্ধিত করেন। ভারতকে তিনি এক নবজাগরণের বাণী শোনান ও যুবসমাজকে নতুন কর্মপন্থার নির্দেশ দেন। নিজে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি না করলেও তিনি ভারতীয় যুবসমাজের প্রাণে ও রাষ্ট্রজীবনে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি ও উদ্বোধন এনে দেন, যার ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন কর্মশক্তি পায়।

যদিও স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল, তা হলেও ওটা বিপ্লববাদী সংস্থা ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পূর্বে সংঘটিত যে সব ঘটনাকে আমরা স্বাধীনতা লাভের পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করি, সেগুলো বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ মাত্র। প্রকৃত বিপ্লববাদের আগুন জ্বলে ওঠে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে। বঙ্গদেশের আয়তন [illegible] অনেক বড় ছিল। কিন্তু তাকে ক্রমশ ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকেও পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল। মোট কথা নানারকম রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশকে খর্ব করার অপচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গদেশকে দু-খণ্ডে বিভক্ত করা হোক। প্রস্তাবটা বঙ্গদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এমনকি ইংরেজ মালিকানাবিশিষ্ট ও ইংরেজ কর্তৃক সম্পাদিত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকাতেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখা হয়। কিন্তু এসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হয়। পুবদিকে সৃষ্ট হল আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ ও পশ্চিমে বাকি অংশ। চতুর্দিকে বিদ্বেষের বহ্নি জ্বলে উঠল। বিলাতী পণ্য বর্জন করা হল। স্বদেশীয় শিল্পগঠন ও জাতীয় শিক্ষাপ্রসারের জন্য 'স্বদেশী আন্দোলন' শুরু হল। যাঁরা বিলাতী জিনিসের দোকানে পিকেটিং করল, তাদের ওপর পুলিস নিষ্ঠুর অত্যাচার করল। এর প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ পেল।

দুই

স্বদেশী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হল জাতীয়তাবাদ আর জাতীয়তাবাদ এক শ্রেণীর মধ্যে বীজ বপন করল বিপ্লববাদের। বিপ্লববাদ প্রসারের জন্য প্রথম যে সমিতি গঠিত হল, তা হচ্ছে অনুশীলন সমিতি। এর শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে অরবিন্দের (১৮৭২-১৯৫০) ছোট ভাই বারীন্দ্রের (১৮৮০-১৯৫৯)

নেতৃত্বে গঠিত হল এক সশস্ত্র বিপ্লবীদল। তারা তাদের গোপন কেন্দ্র করল মানিকতলার ওপারে মুরারিপুকুরে এক নিভৃত বাগানবাড়িতে। বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যে দল গঠিত হল, তারা তু'জন সদস্যকে বিদেশে পাঠিয়ে দিল বোমা তৈরী করবার প্রণালী শিখে আসবার জন্য। তারপর মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে বোমা তৈরীর আয়োজন চলতে লাগল। বারীন্দ্রের দলের তু'জন প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮) ও ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) মুজঃফরপুরের দিকে রওনা হল প্রাক্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্য। ভুল করে কিংসফোর্ডের গাড়ির মত দেখতে অন্য একখানা গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ করল। নিহত হল মিস্টার কেনেডি নামে এক আইনবিদের স্ত্রী ও কন্যা। ... ধৃত হল বটে, কিন্তু সে আত্মঘাতী হল। ক্ষুদিরামের বিচার হল এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হল।

এরপর এল বিশ্বাসঘাতকের পালা। নরেন্দ্র গোস্বামী নামে দলের একজন সদস্য পুলিশের কাছে গোপন তথ্য সরবরাহ করে বারীন্দ্রের দলকে ধরিয়ে দিল। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু নামে দলের তু'জন বন্দী জেলখানার মধ্যেই নরেন্দ্রকে হত্যা করল। বিচারে বারীন্দ্র সমেত ১৪ জন অপরাধী সাব্যস্ত হল। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। কিন্তু এই সঙ্গে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটল না। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ন্যূনাধিক ৬০ জন নিহত হল। সংগ্রামের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়াসে বিপ্লবীদল রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করল। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ১১২টা ডাকাতি হল, এবং ডাকাতরা এভাবে সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করল।

তিন

ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিদেশেও বিপ্লবাত্মক কাজ শুরু হয়েছিল। এর সূত্রপাত করেছিলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নামে একজন বিপ্লবী। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি লণ্ডনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সর্দার সিং রাণা নামে আর একজন বিপ্লববাদী প্যারিসে গিয়ে আস্তানা গাড়েন। শ্যামজী বিলাতে এক বিপ্লববাদী দল গড়ে তোলেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন সাভারকার, হরদয়াল ও মদনলাল। প্যারিসে শ্যামজীর উপযুক্ত সহকর্মী ছিলেন এক মহিলা। নাম মাদাম ভিখাজী রুস্তম কামা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ভারতীয় বিপ্লববাদ অগ্রগতি লাভ করে। সেখানে হরদয়ালের নেতৃত্বে 'গদর' নামে একটি দল গঠিত হয়। মার্কিন সরকার হরদয়ালকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করে। হরদয়ালের পর 'গদর' দলের নেতৃত্ব পড়ে রামচন্দ্রের ওপর।

এরই কিছুদিন পরে ইউরোপে আরম্ভ হয় প্রথম মহাযুদ্ধ। জারমানিতে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লববাদীরা সহানুভূতিশীল জারমান সরকারের কাছ থেকে অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহ করে, যুদ্ধে নিরপেক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে তা ভারতে পাঠাবার মতলব করে। জারমানি থেকে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার পথ সুগম করবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের পাঠানো হল জাপান, চীন, ফিলিপাইন, শ্যাম [illegible]। আশী হাজার রাইফেল ও চল্লিশ লক্ষ কার্তুজ ভারতে পাঠাবার জন্য 'আনি লারসেন' নামে এক ছোট জাহাজে বোঝাই করে, 'ম্যাভেরিক' নামে এক বড় জাহাজে তুলে দেবার পরিকল্পনা হল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে 'ম্যাভেরিক' না পৌঁছানোর ফলে ওই অস্ত্রসম্ভার আর ভারতে এসে পৌঁছাল না।

এদিকে অস্ত্রশস্ত্র আসছে, এই খবর পেয়ে সেগুলো কোন নিভৃত স্থানে নামাবার জন্য যাদুগোপাল মুখার্জী (১৮৮৬-১৯৭৬) গেলেন সুন্দরবনে ও যতীন মুখার্জী গেলেন বালেশ্বরে। বালেশ্বরে যতীন মুখার্জীর (১৮৮০-১৯১৫) কাছে বাটাভিয়ায় অবস্থিত জারমান সরকারের প্রতিভূরা বিপ্লবে সাহায্য করবার জন্য টাকা পাঠাতে লাগল। কিন্তু শেষ কিস্তির দশ হাজার টাকা ব্রিটিশ সরকারের হাতে গিয়ে পড়ল। সেই সূত্র অবলম্বন করে পুলিশ যতীন মুখার্জীর তল্লাসে বেরিয়ে পড়ল। বুড়িবালামের তীরে যতীন মুখার্জী ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের এক ভীষণ সংঘর্ষ হল। পুলিশের সঙ্গে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেন। শেষে আহত অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় (১৯১৫)।

এদিকে রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৬.) ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। বিদ্রোহের দিন ধার্য হল ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে। কিন্তু রাসবিহারীর দলে কিরপাল সিং নামে পুলিশের একজন গুপ্তচর যোগদান করেছিল। তার মারফত সরকার আগে থাকতেই খবর পেয়ে এ চেষ্টা বিফল করে দিল।

চার

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে গান্ধীজী (১৮৬৯-১৯৪৮) হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পথ ঘোষণা করলেন। কিন্তু বিধানসভার মাধ্যমে স্বরাজ লাভের আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ গঠিত করলেন 'স্বরাজ্য পার্টি'। তাঁরা বিধানসভার মধ্যে নানাভাবে ব্রিটিশ সরকারকে বিপর্যস্ত করে তুললেন।

এর মধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দলের প্রাদুর্ভাব ঘটল। সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৭) বা মাস্টারদার নেতৃত্বে তারা ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের এক প্রান্তে সরকারী রেলের টাকা লুণ্ঠন করে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে দু'টি [illegible] পুলিস লাইন এবং 'ডাক ও তার' অফিস দখল করে। বিনয় (১৯০৮-১৯৩০), বাদল (১৯১২-১৯৩০), ও দীনেশ (১৯১১-১৯৩১) রাইটার্স বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে সিম্পসন সাহেবকে হত্যা করল। ঢাকায় পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট লোম্যান সাহেবও নিহত হল (১৯৩০)। মেদিনীপুরে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হল।

আইন অমান্য করে লবণ প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক কারারুদ্ধ হল।

পাঁচ

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কংগ্রেস প্রথমে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু সরকার তাতে সাড়া না দেওয়ায়, ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হল। সেদিন সমস্ত দেশবাসী আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—'করেংগে ইয়া মরেংগে'। সরকার নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করলেন। বিক্ষুব্ধ দেশবাসী সংগ্রাম শুরু করল ইংরেজের বিরুদ্ধে। 'আগস্ট বিপ্লব' নামে আখ্যাত এই সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করল মেদিনীপুর জেলায়। সতীশচন্দ্র সামন্তের অধিনায়কত্বে বিপ্লবীরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করল এক স্বাধীন সরকার। প্রায় দেড় বৎসর ইংরেজ শাসন সেখানে বিলুপ্ত হল। ইংরেজ চালালো অমানুষিক অত্যাচার ও ব্যাপক নারীধর্ষণ। পুলিশের গুলি অগ্রাহ্য করে অপূর্ব

দেশপ্রেম ও সাহস দেখাল মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২)। সত্তর বৎসর বয়স্কা এই বীরাঙ্গনা মহিলা ললাটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে মৃত্যুবরণ করল। ইংরেজ সরকারী রিপোর্টে লিখল—"In Midnapore in Bengal the operation of the rebels indicated considerable care and planning, effective warning system had been devised, elementary tactical principles were observed, for instance, encirclement and flanking movements clearly on pre-arranged signals. The forces of disorder were accompanied by doctors and nursing orderlies to attend the casualties and its intelligence system was effective". বিপ্লব মাত্র মেদিনীপুরেই কেন্দ্রীভূত হয়নি। কলকাতা, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বগুড়া, মালদহ, নদীয়া, বরিশাল, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, দিনাজপুর, দার্জিলিং সকল স্থানেই চলল জনসাধারণের উত্তেজনা ও পুলিশের অকথ্য অত্যাচার।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ঘটল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান। যুদ্ধে জয়লাভ করলে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে, এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইংরেজ। কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপার নিয়ে বিবাদ বাধল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে এল ক্যাবিনেট মিশন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মীমাংসা করবার জন্য। কিন্তু মীমাংসার সব চেষ্টাই হল ব্যর্থ। এরই পদাঙ্কে লাগল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা (১৯৪৬-৪৭)। নোয়াখালি ও পূর্ববঙ্গের অন্যত্র দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করল। কলকাতাতে দাঙ্গার তীব্রতা শীর্ষে উঠল।

ছয়

ইতিমধ্যে লড়াইয়ের মধ্যেই ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা। আগেই বলেছি যে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে 'আগস্ট বিপ্লব'-এর সময় সরকার নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করেছিল। তার আগেই তারা কারারুদ্ধ করেছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে (১৮৯৭-১৯৪৫)। কিন্তু অসুস্থতার জন্য নেতাজীকে জেলখানা থেকে এনে নিজগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে। আফগানি-

স্থানের ভিতর দিয়ে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন জারমানিতে। সেখান থেকে জাপানে গিয়ে তিনি গঠন করলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণ হানল ব্রহ্মদেশের ওপর। তাসের বাড়ির মতো টলমল করে পড়ে যেতে লাগল শহরের পর শহর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ। নেতাজী এসে উপনীত হলেন আসাম সীমান্তে। ধ্বনি তুললেন, 'দিল্লী চলো'। 'লালকেল্লায় গিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা তোল।' কিন্তু যুদ্ধের পর নেতাজী আবার হলেন অদৃশ্য।

এদিকে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হল। ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাব করলেন যে ভারতবাসীরা নিজেরাই দেশের সংবিধান রচনা করুক। তারপর নানারকম কুটিল ঘটনার বিপাকে দেশকে [illegible] ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ইংরেজ ভারতের শাসনভার দেশবাসীর হাতে তুলে দিল। ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল। কিন্তু বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হল।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের বাংলা

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তারিখে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের শোচনীয় শর্ত হিসাবে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়— পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান। যুক্ত বাঙলার মোট আয়তনের তিনভাগের একভাগ মাত্র আসে পশ্চিমবঙ্গে, আর দুভাগ যায় পূর্ব-পাকিস্তানে। বিভক্ত হবার সময় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছিল ৩০,৭৬২ বর্গমাইল। কিন্তু পরে যখন রাজ্যসমূহের পুনর্বিন্যাস করা হয়, তখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আরও ৩,১৬৬ বর্গমাইল ভূমি যুক্ত করা হয়। এর [illegible] বর্গমাইল আসে মানভূম থেকে, আর ৭৫৯ বর্গমাইল পূর্ণিয়া থেকে। আজ কিলোমিটারের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৫,৪৫,৮৫,৫৬০। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর তার নতুন নামকরণ হয়েছে 'বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের বর্তমান আয়তন ১,৪৩,৯৯৯ বর্গকিলোমিটার বা ৫৫,১৯৮ বর্গমাইল। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ৮,৯৯,৭০,০০০। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ১৭টা জেলায় বিভক্ত যথা, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ২৪-পরগনা (১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারী থেকে ২৪-পরগনা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহার ও কলকাতা।

২

পশ্চিমবঙ্গ জন্মগ্রহণ করেছিল (১৯৪৭) অনেক সমস্যা নিয়ে। যুক্ত বাঙলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল একটা ভারসাম্য। পূর্ব বাঙলা ছিল কৃষিপ্রধান। সেজন্য পূর্ব বাঙলা ছিল খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের আড়ত। আর পশ্চিম বাঙলা ছিল শিল্পপ্রধান অংশ। পশ্চিম বাঙলাকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্য পূর্ব বাঙলার ওপর নির্ভর করতে হত। দ্বিখণ্ডিত হবার পর, এই আর্থিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। তারপর পশ্চিম বাঙলা ছিল ঘনবসতিবহুল অংশ। তার মানে, আগে থাকতেই এখানে ছিল বাসস্থানের অভাব। সে অভাবকে ক্রমশই তীব্রতর করে তুলেছিল অন্যপ্রদেশ থেকে আগত জনসমুদ্র। এই সমস্যাকে

উৎকট করে তুলল যখন নিরাপত্তার কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাঙলা থেকে পশ্চিম বাঙলায় এল।

যখন পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্ট হল, তখন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক 'ছায়া মন্ত্রীপরিষৎ' এর শাসনভার গ্রহণ করল। কিন্তু চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই সে মন্ত্রীসভা ভেঙে পড়ল। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২) নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ যে সকল উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সেগুলির সমাধান এই নতুন মন্ত্রীসভার স্কন্ধে চেপে বসল। নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর মৃত্যুকাল (১৯৬২) পর্যন্ত আঠারো বৎসর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সময়কালের মধ্যে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি একে একে সমাধান করে ফেললেন।

তিন

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা পশ্চিমবঙ্গকে সমাধান করতে হল, তা হচ্ছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ৩১,১৭,০০০ শরণার্থীর পুনর্বাসন করা। নানা জায়গায় তাদের জন্য শিবির স্থাপন করা হল ও সরকারী ভাতায় (doles) তাদের পরিচর্যা করা হল। তা ছাড়া, তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ও মেয়েদের বিবাহের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া হল। বহুক্ষেত্রে গৃহনির্মাণের জন্য সরকারী ঋণ দেওয়া হল। নিরাশ্রয়া মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ আশ্রয়ে (Homes) যত্ন-সহকারে রাখা হল। কৃষিজীবী পরিবারদের প্রথম উত্তরপ্রদেশ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হল। পরে ১৭,০০০ পরিবারকে এক সুগঠিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হল। অ-কৃষিজীবী শরণার্থীদের জন্য পেশা বা বৃত্তিগত ও কারিগরী শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪৮,৩০০ ব্যক্তিকে এরূপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। এসবের জন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ১,৭৮,০১০ কোটি টাকা ব্যয় করলেন। এ ছাড়া, উদ্বাস্তু ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগদানের জন্য আরও ১৬২০ কোটি টাকা ব্যয় করলেন। অনেক স্কুল-কলেজ বিশেষ করে উদ্বাস্তু ছাত্রদের জন্য স্থাপন করলেন। এ ব্যতিরেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাঁচ কোটি টাকা সাহায্যে উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্য 'রিহ্যাবিলিটেশন

অব ইনডাস্ট্রিজ্ কর্পোরেশন' নামে এক সংস্থা স্থাপন করলেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন বলেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মত দুরূহ সমস্যা তাঁর পক্ষে এরূপ দ্রুততার সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছিল।

চার

অন্যান্য সমস্যাও তিনি অনুরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সমাধান করলেন। খাদ্য ও কাঁচামালের সমস্যা সমাধানের জন্য, কৃষির উন্নতির নিমিত্ত বহুমুখী পরিকল্পনাসমূহ রচনা করলেন। কৃষকদের উন্নত ধরনের ভূমিস্বত্ব দেবার জন্য জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হল এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জমিদারদের সরকারী ঋণপত্র দেওয়া হল। [illegible] জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 'দামোদর ভ্যালী করপোরেশন' গঠিত করা হল। ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করা হল। নদী ও খালসমূহ থেকে কৃষির সেচের জন্য যাতে জল পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা হল। এ ছাড়া, নানা স্থানে গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানো হল। এসব করার ফলে কৃষির উৎপাদন অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেল। বিশেষ করে পাটের ক্ষেত্রে সামান্য পাঁচ লক্ষ গাঁট থেকে উৎপাদন পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ গাঁটে বৃদ্ধি পেল।

সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ সরবরাহের জন্য হরিণঘাটা ও বেলগাছিয়ার 'ডেয়ারি' স্থাপন করা হল। কলকাতা ও কলকাতা থেকে অন্যত্র যাবার জন্য পরিবহণের ভার 'স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন'-এর হাতে ন্যস্ত করা হল। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কও নির্মিত হল।

রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা হল। বহু জায়গায় প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করে রেলস্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল। লবণ হ্রদ বুজিয়ে কলকাতার সংলগ্ন এক উপনগরী সৃষ্টি করা হল। বস্তীবাসী ও শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য সরকারী 'হাউসিং এস্টেট' বা আবাস-ভবনসমূহ তৈরি করা হল। অনুরূপ আবাস-ভবন নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যমধ্যবিত্তদের জন্যও তৈরি করা হল। বৃহত্তর কলকাতা নির্মাণের জন্য CMPO-কে পরিকল্পনা রচনা করতে বলা হল। যে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার জন্য পরবর্তীকালে গঠিত হল CMDA.

দুর্গাপুরে এক ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হল। দুর্গাপুর উপনগরী

নির্মিত হল। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, হিন্দুস্থান কেবল ওয়ার্কস্‌ ও কোক ওভেন প্ল্যান্ট ও গ্যাস গ্রিড্‌ সিস্টেম চালু করা হল।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন, দূষিত জল নিকাশন ও আবর্জনা দূরীকরণের জন্যও বিশেষ চেষ্টা চলতে লাগল। এসবই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে ঘটল।

পাঁচ

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর অনুসৃত খাদ্য-নীতি জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায়, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন ও অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে এক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত [illegible] ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তাও স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে অজয় মুখার্জির অধি-নায়কত্বে এক বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু মাত্র এক বৎসরের (ফেব্রুয়ারী ১৯৭০) বেশি এ সরকার স্থায়ী হয় না। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ তারিখে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে এক ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় কিন্তু দু'মাস (জুন ১৯৭১) পরে তা-ও ভেঙে পড়ে। তখন (৩০ জুন ১৯৭১) আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে এক কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে 'বামফ্রন্ট' দল সাফল্য অর্জন করাতে জ্যোতি বসু 'বামফ্রন্ট সরকার' গঠন করেন। 'বামফ্রন্ট' সরকারই এখনও পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আছে।

ছয়

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকেই বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ১০,৭৪,১১১ পাঠরত ছাত্র সমেত ১৩,৯৫০ সংখ্যক প্রাইমারী স্কুল ছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে ওই সংখ্যা বেড়ে ২৮,৮৬,১৪২ পাঠরত ছাত্র সমেত ২৮,০১৬ প্রাইমারী স্কুলে দাঁড়ায়। ১৯৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে ৬৮ লক্ষ পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী সমেত প্রাইমারী স্কুলের

সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬,৯৯৩। অনুরূপভাবে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ৪,৫৭,৬৩৪ পাঠরত ছাত্র-বিশিষ্ট ছেলেদের জন্য ১,৬৬৩ স্কুল ও ৬৪,৮৩৬ পাঠরত ছাত্রী সমেত ২৪০টি মেয়ে স্কুল ছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৪৯৭ ও ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৪৮,৩৯২ ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা নয়টি যথা (বন্ধনীর মধ্যে প্রতিষ্ঠার তারিখ)—কলিকাতা (১৮৫৭), বিশ্বভারতী (১৯৫১), যাদবপুর (১৯৫৫), বর্ধমান (১৯৬০), কল্যাণী (১৯৬০), নর্থবেঙ্গল (১৯৬২), রবীন্দ্রভারতী (১৯৬২), বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪) ও [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৪)। এছাড়া, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ হ্রাসের জন্য ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদই এখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মাত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা গ্রহণ করে।

সাত

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনকে আবার সঞ্জীবিত করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫টি জিলা পরিষদ, ৩২৫টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ৩,২৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। শহরাঞ্চলে আছে ১১২টি মিউনিসিপ্যালিটি।

সেচের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার তিস্তা পরিকল্প (১৯৮২) গ্রহণ করেন। এছাড়া, সেচের জন্য নদী থেকে জল-উত্তোলনের জন্য ২,৬৯৭টি স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আছে ৫,৭০১টি নলকূপ ও ৮,৫১,১৮২ হেক্টর পরিমিত জমিতে জলসেচের জন্য সরকারী খাল। তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য সাঁওতালডিহি, ব্যাণ্ডেল, দুর্গাপুর ও টিটাগড়ে নতুন তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তড়িৎশক্তির পূর্ণ সক্রিয়তার অভাবে তার সুফল কৃষক বা জনগণ কেউই পাচ্ছে না। হলদিয়ায় নতুন বন্দর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কলকাতা বন্দরের হাল ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। হুগলি নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতাকে বেষ্টন করে চক্র-রেল চালু করা হয়েছে। পাতাল রেলেও লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। এসব ছাড়া, ক্রীড়ামোদীদের সুবিধার্থে ইডেন গার্ডেন ও সল্ট লেকে স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে।

সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, বেকারদের কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদিও ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যার অনুপাতে তা নগণ্য। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ছিল, ৬,৪২১টি রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরী। সেগুলিতে প্রতিদিন নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার গড় ছিল ১,২৭,০০০ জন।

আট

কিন্তু এত বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির অন্তরালে ঘটেছে শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি, রাজনৈতিক দলাদলি, সন্ত্রাস, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও নারী নির্যাতন, মধ্যবিত্ত সমাজের অবলুপ্তি, শিক্ষার সংকট, (ক্রমবর্ধমান লোডশেডিং, টেলিফোনের অচলতা, বাঙলায় অবাঙালীর অবারিত আগমন ও কর্ম-সং[illegible] তার প্রতিঘাত, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা ও নৈতিক শৈথিল্য প্রকাশ। রাজনীতি থেকে শুরু করে সাহিত্যক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বত্র নির্লজ্জ গোষ্ঠী তোষণের অব্যাহত লীলা চলেছে। চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে ভণ্ডামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তাছাড়া, বাঙালীর মানবিক সত্তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। নারীধর্ষণ ও বধু-নির্যাতনের ক্রমবৃদ্ধি-হার তার দৃষ্টান্ত। বস্তুত সমকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, মানবিক সত্তার হ্রাস ও নৈতিক শৈথিল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে বাঙালীর জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে কিনা? অশন-বসনে, আচার-ব্যবহারে বাঙালী আজ যেমন নিজেকে বহুরূপী করে তুলেছে, তেমনই বর্ণচোরা করেছে তার সংস্কৃতিকে। অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতির পরিবর্তে এক জারজ সংস্কৃতির প্রাবল্যই লক্ষিত হচ্ছে।

কালান্তরের সমাজ ও তার রূপান্তর

কলকাতার লোক যে জীবনচর্যা অন্থসরণ করে, তাই আজ বাঙলার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। কলকাতার লোকের জীবনচর্যার রূপান্তর ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে। শহরে সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পাল-পার্বণ ও জন-সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। অথচ, আমরা ইতিহাসে দেখি যে যারা প্রথম গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিল তারা গ্রামকেই শহরে তুলে নিয়ে এসেছিল। গ্রামীণ ধর্মকর্ম কলকাতায় অন্থসরণ করা যাতে বিঘ্নিত না হয়, [illegible] জন্ত তাঁরা সঙ্গে করে এনেছিল তাদের বামুন-পুরুত, নাপিত ইত্যাদি। সঙ্গে করে তারা আরও নিয়ে এসেছিল গ্রামের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা। তখনকার কলকাতার গ্রাম্যরূপ, তাদের এখানে গ্রামীণ জীবনচর্যা অন্থসরণ করাকে সহজতর করেছিল। কিন্তু ক্রমশ শহরের বিবর্তন, তাদের এটা ব্যাহত করল।

দুই

গ্রামীণ সমাজ যা শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তা প্রথম আঘাত পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শহরে এক 'অভিজাত' সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে। শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রথম সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করেনি। সাধারণ লোক নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক রয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিটাই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বজায় ছিল, বিশেষ করে পাল-পার্বণ, ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-বিচারে। গোড়ার দিকে গ্রামের লোক যেসব অপপ্রথা সঙ্গে করে শহরে নিয়ে এসেছিল সেগুলো বিংশ শতাব্দীর সূচনার অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল। দু'টি প্রধান অপপ্রথা ছিল—সহমরণ ও কৌলীন্যপ্রথা।

সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে ও বিধবা বিবাহের সপক্ষে বিস্থাসাগর মহাশয়ের আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছিল মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা প্রচারের মাধ্যমে ও ইংরেজের প্রণীত আইনের সহায়তায়।

মুদ্রিত বইয়ের প্লাবন শিক্ষাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা

ত্বরান্বিত হয়েছিল যখন ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর শহরের নানাস্থানে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। ফলে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয়। এই সমাজের ছেলেরা নানারকম পেশা গ্রহণ করে। কেউ হন ডাক্তার, কেউ আইনবিদ, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিজ্ঞানী ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ পত্তন করল এক নতুন সাহিত্যের। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও আরো অনেকে। তাঁদের লেখা ভাষাই কলকাতার ভাষা তথা বাংলা ভাষার মানরূপে গৃহীত হয়। এই সাহিত্যে দুই দিক্‌পাল হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

মধ্যবিত্ত সমাজের যারা পেশা গ্রহণ করল না, তারা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্ম গ্রহণ করল। সীমিত-দায়-যুক্ত যৌথ মূলধনী কোম্পানি আইন বিধিবদ্ধ (১৮৫০) হবার পর ম্যানেজিং এজেন্টসমূহ স্থাপন করলেন চটকল, কয়লাখনি, চা-বাগিচা, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি। কলকাতা একটা বিরাট কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন শহরতলির লোকদের কলকাতার কর্মকেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে এল। তারা কলকাতা সমাজের সংস্কৃতি গ্রামে নিয়ে গেল। এইভাবে নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে গ্রামীণ সভ্যতার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হল।

কলকাতায় যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হল, তাদের পুরুষরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে যদিও উদারনীতিক হলেন, কিন্তু তাঁদের অন্দরমহলের মেয়েরা রক্ষণশীলা থেকে গেলেন। যদিও ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুল স্থাপিত হবার পর থেকে স্ত্রীশিক্ষার কিছু কিছু প্রসার ঘটেছিল, তা হলেও যেসব মেয়ে স্কুলে পড়তে যেত (অধিকাংশই দশ বছরের কম) তাদের রক্ষণশীলতা বজায় রেখে ঢাকা গাড়িতে করে স্কুলে যেতে হত।

দশ বছর বয়সের আগেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, সেজন্য তাদের উচ্চশিক্ষা লাভের কোন সুযোগ ছিল না। দু-চারজন যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করত তারা হয় ব্রাহ্ম পরিবারের কিংবা খ্রীস্টান পরিবারের মেয়ে। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে সারদা আইন দ্বারা যখন মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স স্থির করা হয়, তখন থেকেই হিন্দু মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবণতা প্রকাশ পায়। তারা

শিক্ষাক্ষেত্রের নানাবিভাগে পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে যেতে থাকে। যে রূপান্তরটা গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে ঘটেছে, তা একেবারে অবিশ্বাস্য। আজ নামজাদা মহিলা ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপিকা, ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবাদিক, কোম্পানি এগ্‌জিকিউটিভ, কোম্পানি ডিরেক্টর শহরের সর্বত্রই আকছার দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা হাইকোর্টে আজ কয়েকজন মহিলা বিচারপতিও নিযুক্ত হয়েছেন। অথচ পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এঁদের মা-মাসি-পিসিদের দশ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যেত।

তিন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের অন্দরমহল অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। সেটাই ছিল হিন্দু রক্ষণশীলতার দুর্গ। যার কোনো ট্রাডিশন্যাল ধারাবাহিকতা ছিল না, তা ছিল মেয়েদের কাছে অপকর্ম। সেই মানদণ্ড দিয়েই তারা পাপ-পুণ্য বিচার করত। বাড়ির বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির অন্দরমহলেও তারা বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াত। পরপুরুষের সামনে বেরুনো একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ভাশুর-ভাদ্দর বউয়ের সম্পর্কের মধ্যে ছিল চৈনিক প্রাচীর। সেইসব মেয়েদের নাতনীরাই আজ ভাশুরের সঙ্গে কথা বলে এবং সিনেমায় ও খেলার মাঠে গিয়ে পাশাপাশি বসে। তখনকার দিনে কথা বলা তো দূরের কথা, ঘোমটার ভিতর থেকে দেখতে না পেয়ে দৈবাৎ যদি ছোঁয়াছুয়ি হয়ে যেত, তা হলে ধান-সোনা উৎসর্গ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এখন আর ভাশুর-ভাদ্দর বউয়ের মধ্যে সে নিষিদ্ধ সম্পর্ক (taboo) নেই। সম্পূর্ণ খোলামেলাভাবেই তারা মেলামেশা করে।

বিবাহের পর থেকেই সেকালের লোকের ধর্মীয় জীবন শুরু হত। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কুলগুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিত। কেননা সেকালের মেয়েদের সংস্কার ছিল যে মন্ত্র না নিলে দেহ পবিত্র হয় না। যারা মন্ত্র নিত, তাদের প্রতিদিনই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হত। যাদের মন্ত্র হয়নি, তাদের ঠাকুরঘরে যেতে দেওয়া হত না। এমনকি শ্বশুর-শাশুড়িও তাদের হাতের পক্কান্ন শুদ্ধ বলে মনে করত না।

সেকালের মেয়েরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সদর দরজা থেকে শুরু করে বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত সর্বত্র গোবরজলের ছিটা দিত। সাধারণ গৃহস্থলোকের বাড়ি দু'মহল হত। ধনী লোকদের বাড়ি তিনমহল চারমহলও হত। প্রতি

বাড়িতেই তুলসীমঞ্চ থাকত এবং সন্ধ্যাবেলা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হত। তা ছাড়া, বোশেখ মাসে তুলসীগাছের ওপর একটা জলপূর্ণ পাত্র বেঁধে 'ঝারা' দেওয়া হত।

সেকালের মেয়েদের ধর্মবিশ্বাস এখনকার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। শিশুকাল থেকেই নানারকম ব্রতপালনের ভিতর দিয়ে তাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠত ও মনের মধ্যে পাপ-পুণ্যের একটা ভাব সঞ্চারিত হত। পাঁচ থেকে আট বছরের মেয়েরা নানারকম ব্রত করত; যেমন বোশেখ মাসে শিবপূজা ও পুণ্যিপুকুর, কার্তিক মাসে কুলকুলতি, মাঘমাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি। সধবা মেয়েদের ব্রতের অন্ত ছিল না। অক্ষয়তৃতীয়ায় দিন কলসী উৎসর্গ করা হত। কার্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হত। এসবই পঞ্চাশ-ষাট বছর [illegible] পর্যন্ত কলকাতায় পালিত হত। বাঙালীর বার মাসে তের পার্বণ ছিল, তার অধিকাংশই আজ উঠে গিয়েছে। তবে সীমান্ত অঞ্চলের মেয়েরা আজও পৌষ মাসে টুসু ও ভাদ্র মাসে ভাদুর ব্রত ও উৎসব পালন করে।

আগে ঘেঁটুপূজার খুব ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু আজকাল ছেলেদের মধ্যে খোসপাঁচড়ার প্রকোপ কমে গিয়েছে বলে ঘেঁটুপূজার আর চলন নেই। অরন্ধনও একটা বড় পরব ছিল এবং এই উপলক্ষে পাঁচ বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করা হত। পৌষপার্বণে পিঠেপুলি তৈরির ভীষণ ঘটা হত। তখনকার কালে গ্রহণের দিন লোক হাঁড়ি ফেলে দিত। রান্নার জন্য আবার নতুন হাঁড়ি ব্যবহার করত। দশহরার দিন ফলাহার করত। অরন্ধনের আগের দিন রান্না ভাত-তরকারি পরদিন (অরন্ধনের দিন) খেত। শ্রীপঞ্চমীর দিন কড়াই সিদ্ধ করত ও পরদিন শীতল ষষ্ঠীর দিন তা খেত। চৈত্র সংক্রান্তিতে যবের ছাতু খেত। শীতলা অষ্টমীর দিন শীতলাতলায় গিয়ে বনভোজন করত।

সেকালে বর্ষীয়সী মহিলারা নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন। তাঁরা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন বলে ভোর রাতেই গঙ্গাস্নানে বেরুতেন ও সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ি ফিরে আসতেন। ধনী পরিবারের মহিলারা পালকি করে গঙ্গাস্নানে যেতেন, এবং গঙ্গার ঘাটেও পালকি থেকে নামতেন না। পালকিটাকে জলে নামিয়ে দেওয়া হত এবং তাঁরা পালকির ভিতরেই স্নান সেরে নিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করতেন।

চার

ধর্মীয় পরবগুলির ন্যায় সামাজিক উৎসবগুলির মধ্যেও অনেকগুলি উঠে গিয়েছে। আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়; সেজন্য রজঃ অনুষ্ঠান উঠে গিয়েছে। ষাট বছর আগে পর্যন্ত এটা একটা বড় সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। অনুরূপভাবে আজকাল মেয়েরা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে প্রসব করে বলে, আটকৌড়ে ও চারকৌড়ে উঠে গিয়েছে। ষেটেরা পূজাও লুপ্ত হয়েছে। ষষ্ঠী-পূজা এখনো আছে। মেয়েদের সাবত্ৰক্ষণ ইত্যাদি কোনো কোনো জায়গায় পালিত হয়, কোনো কোনো জায়গায় হয় না। আগেকার দিনে এগুলো বড় সামাজিক উৎসব ছিল ও অনেক আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হতেন। রজঃদর্শন [illegible] প্রাচীনও হত।

অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্নপ্রাশন এখনো হয়, কিন্তু সেটা অন্য রূপ নিয়েছে। ব্রাহ্মণদের উপনয়ন এখনো হয়, যদিও অনেকক্ষেত্রে যথা-সময়ে নয়। বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচারসমূহ এখনো পালিত হয়, যদিও এগুলো সংক্ষিপ্ত হয়েছে। ছাদনাতলায় নাপিতদের ছড়াকাটা কোনো কোনো জায়গায় হয়, কোনো কোনো জায়গায় হয় না। আজকালকার নাপিতরা আগেকার দিনের সেসব ছড়া ভুলে গিয়েছে। বিবাহ উপলক্ষে নাড়ুভাজা ইত্যাদি (যার বর্ণাঢ্য বর্ণনা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর 'বাংলার স্ত্রী আচার' বইয়ে দিয়েছেন) উঠে গিয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে আরো অনেক সামাজিক রীতি উঠে গিয়েছে। তা ছাড়া, আগেকার দিনে সবর্ণেই বিবাহ হত; এখন অসবর্ণ বিবাহ প্রায়ই হচ্ছে। ষাট বছর আগে পর্যন্ত কর্মবাড়িতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের জন্য আলাদা পংক্তি হত। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণরা ভোজন-দক্ষিণা পেতেন। আজ আর পান না। এখন ব্রাহ্মণরা সকলের সঙ্গে একই পংক্তিতে খান।

শ্রাদ্ধের ঘটাও এখন অনেক কমে গিয়েছে। আগে নিয়মভঙ্গের দিন সর্ব-জনীন নিমন্ত্রণ করা হত। এখন মাত্র জ্ঞাতি ও নিকট-আত্মীয়দের করা হয়। তা ছাড়া, যারা ব্রাহ্মণ নয়, তারা অশৌচকাল ত্রিশ দিন থেকে দশ-পনেরো দিনে নামিয়ে এনেছে।

শিক্ষারম্ভ বা হাতেখড়ি দেওয়া প্রথা এখন উঠে গিয়েছে। নামকরণের বেলাতেও তাই। আগেকার দিনের অনেক নাম এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যেমন গদাধর, জলধর, জগন্নাথ, পীতাম্বর, এককড়ি, দু'কড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি

ইত্যাদি। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। এখন আর কেউ মেয়ের নাম রাখে না থাকমণি, পরশমণি, এলোকেশী, জগদম্বা, মহামায়া, কালীমতি ইত্যাদি।

পাঁচ

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-আশাকে ও প্রতিবেশীর সঙ্গে আচার-ব্যবহারে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সাধারণ লোক মাথায় শিখা রাখত ও ধুতি-চাদর ব্যবহার করত। মাথায় পাগড়ি বাঁধত। সেলাইবিহীন বসন ব্যবহার করা বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। শার্ট কামিজ পিরান ব্যবহার ছিল না। মেয়েদের গোড়ায় কোনো অন্তর্বাস ছিল না বা [illegible] ছিল না, শাড়ি-খানাই উপরের অঙ্গে জড়িয়ে রাখত। অন্তর্বাস ছিল না বলে মেয়েরা পাছাপাড় কাপড় পরত। পাছাপাড় কাপড় পরা বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের পর থেকে উঠে গিয়েছে। ছোটো ছেলেমেয়েদের হাফপ্যান্ট পরা রীতি ছিল না। ছেলেরা পাঁচ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত দিগম্বর থাকত। তার পর পাঁচহাতি কাপড় পরত। ছোটো মেয়েরা প্রথমে ফ্রক পরত ও বয়স্ক মেয়েরা অন্তর্বাস ও উত্তরবাস হিসাবে প্রথম শেমিজ, তারপর সায়া, জ্যাকেট ও ব্লাউজ। নিমন্ত্রণ বাড়ি যাবার সময় একটা ভেলভেটের জ্যাকেট ও বেনারসী শাড়ি পরত। মেয়েরা এখন আবার অনেকে পাজামা, কামিজ ও সালওয়ার পরে। কেউ কেউ আবার প্যান্ট পরে। ম্যাকসি পরাও ফ্যাশন হয়েছে। আবার অনেকে সিগারেট খায়। উত্তরবাস ও অন্তর্বাসের একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু বাকিগুলা কি? পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত পুরুষরা চটিজুতা পরত। আপিস যাবার সময় কেউ কেউ চীনা বাড়ির বার্নিশ করা জুতা পরত। মাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই প্যান্ট, কোট ও ওয়েস্টকোট পরত। তাদের টুপিও পরতে হত। সাধারণ বাঙালীর প্যান্ট ও লুঙ্গি পরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হল। হাওয়াই শার্টের চলনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান। ছেলেবেলায় পূজার সময় আমাদের পোশাক কেনা হত দেশি তাঁতের ধুতি ও জরির কাজ করা ভেলভেটের কোট। তা ছাড়া ছেলেরা (আমিও পরেছি) নানারকম গহনা পরত। আর মেয়েদের গহনার তো পরিসীমা ছিল না। এক-একজন গৃহস্থ বধুর পঞ্চাশ-ষাট ভরি গহনা থাকত। থাকবেই বা না কেন? সোনার ভরি তো ছিল মাত্র আঠারো টাকা। তবে অনেক গহনা এখন উঠে গিয়েছে, যেমন কোমরে সোনার গোট, নাকে নথ ও নোলক পরা।

ছয়

খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হা-ডু-ডু খেলাটাই খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল। তা ছাড়া, ছেলেরা নিয়মিত ব্যায়াম করত, লাঠি খেলত, কুস্তি লড়ত, সাঁতার কাটত ও মুগুর ভাঁজত। এখন এসব জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। আরো যে-সব জনপ্রিয় খেলা ছিল, তা হচ্ছে ড্যাং-গুলি, মারবেল খেলা ও ঘুড়ি ওড়ানো। এখন এসবের পরিবর্তে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, হকি ইত্যাদি প্রচলিত হয়েছে। এখন খেলার মাঠে বাঙালীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখাচ্ছে। আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে পাঁচালী, তরজার লড়াই, পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি প্রায় উঠেই গিয়েছে। যাকে এখন যাত্রা-অভিনয় বলা [illegible] থিয়েটার এখনো আছে, তবে সিনেমা বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। সিনেমায় ছবির পরিচালনায় বাঙালী বিশ্ব-পুরস্কার পাচ্ছে। তা ছাড়া রেডিও এবং টিভি থেকেও শহরবাসীরা বেশ আমোদ পাচ্ছে। বাড়ির ভিতরের খেলার মধ্যে এক্কা-দোক্কা, লুকোচুরি ইত্যাদি খেলা উঠে গিয়েছে। দশ-পঁচিশ খেলাও তাই। তার পরিবর্তে ক্যারম, লুডো, স্নেক-অ্যাণ্ড-ল্যাডারস ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। বয়স্কদের মধ্যে দাবা ও পাশাখেলা এখনো কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। তবে তাসখেলার ক্ষেত্রে রঙের খেলার বদলে এখন 'ব্রিজ' খেলা প্রচলিত হয়েছে: এসব গ্রামেও প্রচলিত হয়েছে।

রান্নাঘরেরও পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। উনুনের স্থান অধিকার করেছে জনতা স্টোভ বা গ্যাস। মাটির হাঁড়ির পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি; পাথরের ও কাঁসার থালার পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টীল ও পোরসিলেনের থালা-বাসন প্রচলিত হয়েছে। আর্থিক চাপ ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মাছ খাওয়া ও নানা-রকম ব্যঞ্জন রাঁধা হ্রাস পেয়েছে। ফ্রিজের প্রচলনের ফলে একদিনের রান্না দু-তিনদিন খাওয়া অভ্যাস হয়েছে।

শেষ কথা। সেকালের তুলনায় বাঙালী জীবনে আজ যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা অভূতপূর্ব। এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনকে সহায়তা করেছে মুদ্রণের প্রবর্তন, শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যসৃজন, যন্ত্রশিল্প, পরিবহণব্যবস্থা এবং নানা প্রদেশের ও বিদেশীর লোকের সংস্পর্শ।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটলেও কতকগুলো মৌলিক উপাদান এখনো রয়ে গিয়েছে, যথা ষষ্ঠী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, ইতুপূজা, বিপত্তারিণীর পূজা, জয়মঙ্গল

বারের ব্রত, নবান্ন, রক্ষাকালী ও শীতলাপূজা ইত্যাদি। বিয়ের পর লোকে এখনও সত্যনারায়ণ ও শুভচনী পূজা করে। এছাড়া আছে গোরুর গাড়ি ও ঘুঁটের ব্যবহার। এগুলো সবই আদি-অস্ত্রাল যুগ থেকে বাঙালী সমাজে সঞ্জীব রয়ে গিয়েছে। সেখানেই বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক চরিত্রের সূত্র ধরা পড়ে।

তবে শেষ প্রশ্ন। যে সকল মৌলিক উপাদান থেকে বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক চরিত্রের সূত্র ধরা পড়ে, সেগুলো আর কতদিন টিকে থাকবে? গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে সামাজিক রূপান্তরের গতি যেরূপ দ্রুত হারে চলেছে, তাতে মনে হয় না যে এই মৌলিক উপাদানগুলো খুব বেশিদিন টিকে থাকবে। বাঙালী সমাজের রূপান্তরটা মাত্র নাগরিক সভ্যতাকেই আচ্ছন্ন করেনি, গ্রামীণ সভ্যতাকেও করেছে। যারা প্রথম-গ্রা[illegible]কে শহরে[illegible] সঙ্গে গ্রামকেই শহরে তুলে নিয়ে এসেছিল। আজ তার বিপরীত প্রক্রিয়া চলছে। আজ গ্রামের লোকরাই শহরকে গ্রামে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। নাগরিক সভ্যতার চটক আজ গ্রামের লোকের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে বাঙালী তার স্বকীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। কিসের বিনিময়ে? পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহের বিনিময়ে। সে সভ্যতা ভাল কি খারাপ তার বিচার আজ আর এখানে করব না। আগামীকালের ইতিহাস তা প্রমাণ করবে। তবে যাঁরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানতে উৎসুক, তাঁদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন ওই সম্পর্কে Oswald Spengler-এর 'Decline of the West' বইখানা পড়ে নেন।

কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

তাম্রাশ্ম যুগ (?) —মহাভারতে উল্লিখিত পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব, বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও এক অজ্ঞাতনামা সুহ্মরাজ।

বৈদিক যুগ —বৈদিক আর্যগণের বঙ্গ ও পুণ্ড্রজাতির সহিত পরিচয়। বঙ্গদ জাতির উল্লেখ। (তুলনীয় গঙ্গারিডি)।

প্রাক্‌বৌদ্ধযুগ —শিবিরাজা ও চেতরাজা। শিবিরাজ বেস্সন্তর কর্তৃক শিবিধর্মের প্রতিষ্ঠা।

[illegible]

৫৬৬-৪৮৬ খ্রীস্টপূর্ব —শিবিধর্ম শিক্ষার জন্য গৌতম বুদ্ধের বকগিরি বা শুশুনিয়া পাহাড়ে অবস্থান।

৩২৭-৩২৫ খ্রীস্টপূর্ব —গঙ্গারিডি রাজ্যের (গঙ্গারাঢ়) দেশবাসীর শৌর্যবীর্যের কথা শুনে আলেকজাণ্ডারের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

৩২২-২৯৮ খ্রীস্টপূর্ব —চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকাল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পৌণ্ড্রনগরে এক কর্মচারী অধিষ্ঠিত করেন।

৩২০-৪৬৭ খ্রীস্টাব্দ —প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা থেকে স্কন্দগুপ্তের আমল পর্যন্ত বাঙলা গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫৪০-৫৮০ —গৌড়রাজ গোপচন্দ্রের রাজত্ব।

৫৫৩ —বিষ্ণুগুপ্ত কর্তৃক দামোদরপুর তাম্রশাসন দান।

৫৮০-৬০০ —গৌড়রাজ সমাচারদেবের রাজত্ব।

৬০৬-৬২৫ —বাঙলার স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক। কর্ণসুবর্ণে রাজধানী প্রতিষ্ঠা। দক্ষিণে গঞ্জাম ও উত্তরে কান্যকুব্জ পর্যন্ত অধিকার।

৬২৫ —কর্ণসুবর্ণে জয়নাগের রাজত্ব।

৬২৫-৭০৫ —খড়্গবংশের রাজত্ব।

৬৪০-৬৬০ —রাতবংশের রাজত্ব।

৭৫০-৭৭০ —পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। মগধ পর্যন্ত রাজ্য-বিস্তার।

৭৭০-৮০৭ —ধর্মপাল। সমুদ্র পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার।

৮০৭-৮৪২ —দেবপাল। গান্ধার পর্যন্ত জয়।

৮৪২-৮৫০ —মহেন্দ্রপাল।

৮৫০-৮৬২ —প্রথম শূরপাল। বারাণসীর শৈবাচার্যদের গ্রামদান।

৮৬২-৮৬৩ —প্রথম বিগ্রহপাল।

৮৮৫ — গুর্জর-প্রতিহার প্রথম মহেন্দ্রপাল কর্তৃক উত্তরবঙ্গ অধিকার।

৮৮৫-৯০৫ —পূর্ণচন্দ্র পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের রাজ্যারম্ভ।

৯০৫-২৫ —সুবর্ণচন্দ্র-পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজ্যলাভ।

৮৬৮-৯১৭ —নারায়ণ পাল। বিহারের অনেকাংশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

৯১৭-৯৫২ —রাজ্যপাল। উত্তরবঙ্গ পুনরাধিকার।

৯৫২-৯৭২ —দ্বিতীয় গোপাল [illegible] রাজ্যবিস্তার। উত্তরবঙ্গে ভূমিদান।

৯৭২-৯৭৭ —দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। কল্যাণচন্দ্র কর্তৃক পরাজিত ও কামরূপের সঙ্গে যুদ্ধ।

৯৭৭-১০২৭ —প্রথম মহীপাল। কুমিল্লা অঞ্চল অধিকার। তীরভুক্তি ও বারাণসী অধিকার; দক্ষিণবঙ্গে চোল আক্রমণ।

৯৮০ —মেদিনীপুর অঞ্চলে কম্বোজ রাজ্যপালের (৯৮০-১০০০) রাজ্য [illegible]।

১০০০ —কল্যাণচন্দ্র-পুত্র লডহচন্দ্রের রাজ্যলাভ।

১০০৫ —কম্বোজ রাজ্যপালের মৃত্যু ও তৎপুত্র নারায়ণপালের (১০০৫-৩০) সিংহাসন লাভ।

১০১[illegible] —তীরভুক্তিতে কলচুরি গাঙ্গেয়ের অধিকার।

১০২০ —লডহচন্দ্র-পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যলাভ।

১০২৭-[illegible]৩ —নয়পাল। কলচুরিরাজ কর্ণের আক্রমণ প্রতিরোধ।

১০৪২ —অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত গমন।

১০৪[illegible] —তৃতীয় বিগ্রহপাল। কলচুরিরাজ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ও তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ।

১০৬০ রাঢ়ে সামন্তসেনের সামন্ততন্ত্রের সূচনা।

১০৭০-৭[illegible] —দ্বিতীয় মহীপাল, প্রজা বিদ্রোহ; কৈবর্তরাজ দিব্বোক ও রুদোক কর্তৃক অধিকারচ্যুত। বরেন্দ্রে কৈবর্তরাজ প্রতিষ্ঠা।

১০৭১-৭২ —দ্বিতীয় শূরপাল।

১০৮০-৯০ —দিব্যোকের মৃত্যু ও তার ভ্রাতা রুদোকের রাজ্যলাভ।

১০৯০ —রুদোকের মৃত্যু ও তৎপুত্র ভীমের রাজ্যলাভ।

১০৭২ ১১২৬ —রামপাল। ভীমকে নিহত করে বরেন্দ্র পুনরধিকার; সন্ধ্যাকর নন্দী কর্তৃক 'রামচরিত' রচনা আরম্ভ।

১০৯৬ —হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেনের রাজ্যারম্ভ।

১১২৬-২৮ —কুমারপাল।

১১২৮-৪৩ —তৃতীয় গোপাল।

১১৪৩ ৬১ —মদনপাল। পাটনা-মুঙ্গের অঞ্চল অধিকার। গাহড়বাল [illegible] চন্দ্রের মৃত্যু [illegible] উত্তরবঙ্গে ভূমিদান।

১১৬১-৬৫ —গোবিন্দপাল।

১১৬৫ ১২০০ —পলপাল।

১০৯৬-১১৫৯ —বিজয়সেন। বর্মণ রাজবংশের উচ্ছেদ। বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন।

১১৫৯-১১৭৯ —বল্লালসেন। পূর্ববিহারে ভাগলপুর অঞ্চল অধিকার। 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' রচনা।

১১৭৯-১২০৬ —লক্ষ্মণসেন। ওড়িশার গঙ্গরাজ্যে ও বারাণসী ও প্রয়াগে গাহড়বাল রাজ্যে জয়স্তম্ভ স্থাপনের দাবী। বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক নদীয়া অধিকার।

১২০৬-১২২৫ —বিশ্বরূপসেন।

১২০৪-১২০৬ —বখতিয়ার খিলজী। নদীয়া ও লখনৌতি জয়। তিব্বত অভিযান।

১২২৫-১২২৮ —সূর্যসেন।

১২৪৩-১২৬০ —দেববংশীয় দশরথ (?) কর্তৃক সেনবংশের উৎসাদন।

১২৯১-১৩০১ —রুকনুদ্দিন কাইকাউস।

১৩০১-১৩২২ —শামসুদ্দিন ফিরোজশাহ।

১৩৩৮-১৩৪৯ —ফখরুদ্দিন।

১৩৪২-১৩৫৮ —ইলিয়াস শাহ।

১৩৫৮-১৩৯০ —সিকন্দর শাহ।

১৩৯০-১৪১০ —আজম শাহ।

১৪১৫-১৪১৮ —রাজা গণেশ (দনুজমর্দন দেব)।

১৪১৮ —রাজা গণেশের পুত্র মহেন্দ্রদেব।

১৪১৮-৩৫ —যদু (জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ)।

১৪৩৬-১৪৫৯ —নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ।

১৪৫৫-১৪৭৬ —বারবক শাহ।

১৪৮৫-১৫৩৩ —মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

১৪৮৭-১৪৯৩ —হাবসী সুলতান।

১৪৯৩-১৫১৯ —আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

১৫১৯-১৫৩২ —না[illegible] শাহ।

১৫৩২-১৫৩৩ —আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।

১৫৩৩ ৩৮ —গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ।

১৫৩৮-৩৯ —হুমায়ুন কর্তৃক গৌড় দখল।

১৫৩৯-১৫৭৫ —শেরশাহ থেকে দাউদ কাররানী।

১৫৭৫ —আকবরের প্রতিনিধি মুনিম খান।

১৫৭৬-৭৮ —হোসেন কুলী বেগ।

১৫৭৮-৭৯ —ইসমাইল কুলী।

১৫৭৯-৮০ —মুজাফ্ফর খান তুরবতী।

১৫৮৩ —খান-ই-আজম মীর্জা কোকাহও ওয়াজীর খান।

১৫৮৩ ৮৫ —শাহবাজ খান।

১৫৮৫-৮৬ —সাদিক খান।

১৫৮৬ —শাহবাজ খান (২য় বার)।

১৫৮৬-৮৭ —ওয়াজীর খান।

১৫৮৭-৯৪ —সৈয়দ খান।

১৫৯৪-১৬০৬ —মানসিংহ।

১৬০৬-০৭ —কুতুবুদ্দীন খান কোকাহ।

১৬০৭-০৮ —জাহাঙ্গীর কুলী বেগ।

১৬০৯ —মানসিংহের বাঙলায় পুনরাগমন।

১৬০৯-১৬৩৯ —ইসলাম খান চিস্তী ; শেখ হোসাক ; কাশিম খান চিস্তী ;

ফতেহ-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খান ; দারাব খান ; মহাবৎ খান ; মুকাররম খান চিস্তী ; ফিদাই খান ; কাশিম খান জুয়িনী ; আজম খান মীর মুহম্মদ বাকর ও ইসলাম খান মাশাদী।

১৬৩৯-১৬৬০ —শাহজাদা মুহম্মদ শুজা।

১৬৬০-৬৩ —মীরজুমলা।

১৬৬৩ —দিলির খান।

১৬৬৩-৬৪ —দাউদ খান।

১৬৬৪-১৬৭৮ —শায়েস্তা খান।

১৬৭৮ —ফিদাই খান।

১৬৭৮-[illegible] [illegible]

১৬৭৯-৮৮ —শায়েস্তা খান (২য় বার)।

১৬৮৮-৮৯ —খান-ই-জহান বাহাদুর।

১৬৮৯-৯৭ —ইব্রাহিম খান।

১৬৯০ —ইংরেজের শক্তিকেন্দ্র কলিকাতা স্থাপন।

১৬৯৮-১৭০৭ —শাহজাদা আজিম-উস্-সান।

১৬৯৮ —ইংরেজগণ কর্তৃক সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জমিদারী স্বত্ব ক্রয়।

১৭১৭-১৭২৭ —মুর্শিদকুলী খাঁ।

১৭৪০-১৭৫৬ —আলিবর্দী খাঁ।

১৭৫৬-১৭৫৭ —সিরাজউদ্দৌলা।

১৭৫৭ —পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৬০ —প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ।

১৭৬৫ —ইংরেজগণের দেওয়ানী প্রাপ্তি।

১৭৬৯ —সন্দীপের বিদ্রোহ।

১৭৬৯-৭০ —সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা।

১৭৬৯-৭০ —ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

১৭৭০ —ত্রিপুরার বিদ্রোহ।

১৭৭৩ —ফকই বিদ্রোহ।

১৭৭৬ —চাকমা বিদ্রোহ।

১৭৭৩ —রেগুলেটিং অ্যাক্ট। বাঙলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস; গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত।

১৭৭৮ (?) —তন্তুবায় আন্দোলন।

১৭৭৮ —মুদ্রণের জন্য বাংলা অক্ষর নির্মাণ।

১৭৭২-১৮৩৩ —রাজা রামমোহন রায়।

১৭৮৩-৮৫ —চাকমা বিদ্রোহ।

১৭৯২ —বোলাকি শাহের বিদ্রোহ।

১৭৯৩ —চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

১৭৯৮-৯৯ —দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ।

১৮০০ —ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন।

১৮০২ —গারো হাঙ্গামা।

১৮১৭ —হিন্দু কলেজ স্থাপন।

১৮২০-৯১ —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮২৪ —সংস্কৃত কলেজ স্থাপন।

১৮২৯ —সতীদাহ প্রথা বিলোপ।

১৮২৭-৩২ —শেরপুরের বিদ্রোহ।

১৮৩০-৩১ —তিতুমীরের ভূমিজ বিদ্রোহ।

১৮৩৫ —মেডিকেল কলেজ স্থাপন।

১৮৫৪ —রেলপথ নির্মাণ।

১৮৫৬ —বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন।

১৮৫৭ —সিপাহী-বিদ্রোহ।

১৮৫৮ —ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা।

১৮৫৮ —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৭২ —হাইকোর্ট স্থাপন।

১৮৭৬ —ড. মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর্ দি কালটিভেশন অভ্ সায়েন্স' স্থাপন।

১৮৮২ —বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' রচনা ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র প্রচার।

১৯০৫ —বঙ্গভঙ্গ।

১৯০৫ —বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন।

১৯১১ —বঙ্গভঙ্গ রদ।

১৯১১ —ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত।

১৯১৩ —রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯১৪-১৮ —প্রথম মহাযুদ্ধ।

১৯২১ —গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন।

১৯২৩ —চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক স্বরাজ্য দল গঠন।

১৯৩১ —আইন অমান্য আন্দোলন।

১৯৩৯-৪৫ —দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

১৯৪১ —নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ; আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন।

১৯৪২ —আগস্ট বিপ্লব। মেদিনীপুরে [illegible] সরকার।

১৯৪৭ —ভারতের স্বাধীনতা লাভ। বঙ্গবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি।

১৯৪৮-৬২ —ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের শাসন।

১৯৫১ —ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা।

১৯৬২ —ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু।

১৯৬২-৬৭ —প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্ব।

১৯৬৭ —অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার।

১৯৬৯ —যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন।

১৯৭২-৭৭ —সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার।

১৯৭৭-৮২ —জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠন।

১৯৮২— —জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠন।

পরিশিষ্ট ক

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালগণ

১। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (১৯৪৭-৪৮)।
২। বি. এল. মিত্র (অস্থায়ী) (১৯৪৭)।
৩। কৈলাসনাথ কাটজু (১৯৪৮-৫১)।
৪। ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী (১৯৫১-৫৬)।
৫। সুরজিৎ লাহিড়ী (অস্থায়ী) (১৯৫৬)।
৬। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (১৯৫৬-৬৭)।
৭। ধর্মবীর (১৯৬৭-৬৯)।
৮। দীপনারায়ণ সিংহ (অস্থায়ী [illegible]
৯। শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান (১৯৬৯-৭১)
১০। এ. এল. ডায়াস (১৯৭১-৭৭)।
১১। ত্রিভুবননারায়ণ সিংহ (১৯৭৭-৮১)।
১২। ভৈরবদত্ত পাণ্ডে (১৯৮১-৮৩)।
১৩। এ. পি. শর্মা (১৯৮৩-৮৪)।
১৪। উমাশঙ্কর দীক্ষিত (১৯৮৪-৮৬)।
১৫। সৈয়দ নুরুল হাসান (১৯৮৬-৮৯)।
১৬। থক ভেঙ্কু রাজেশ্বর (১৯৮৯)।
১৭। সৈয়দ নুরুল হাসান (১৯৯০-১৯৯৩)।
১৮। কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি (১৯৯৩-)

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিগণ

১। ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (ছায়া মন্ত্রীপরিষদ) (১৯৪৭-৪৮)।
২। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (কংগ্রেস) (১৯৪৮-৬২)।
৩। প্রফুল্লচন্দ্র সেন (কংগ্রেস) (১৯৬২-৬৭)।
৪। অজয়কুমার মুখার্জী (যুক্তফ্রন্ট) (১৯৬৭)।
৫। ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পি. ডি. এ. ফ্রন্ট) (১৯৬৭-৬৮)।
৬। অজয়কুমার মুখার্জী (যুক্তফ্রন্ট) (১৯৬৯-৭১)।
৭। অজয়কুমার মুখার্জী (কংগ্রেস কোয়ালিশন) (১৯৭১)
৮। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (কংগ্রেস) (১৯৭২-৭৭)।
৯। জ্যোতি বসু (বামফ্রন্ট) (১৯৭৭-)।

পরিশিষ্ট খ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা

(১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের সেনসাস্‌ অনুযায়ী)

জেলা	আয়তন বঃ কিমি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ সংখ্যা	স্ত্রীলোক সংখ্যা
১। কোচবিহার	৩৩৮৬	১৭,৭১,৫৬২	৯,১৫,৪০১	৮,৫৬,১৬১
২। জলপাইগুড়ি	৬২৪৫	২২,০৭,০৮৭	১১,৫৪,৬১১	১০,৫২,৪৭৬
৩। দার্জিলিং	[illegible]	১০,০৬,৪৩৪	৫,৩১,৬৫৫	৪,৭৪,৭৭৯
৪। পঃ দিনাজপুর	[illegible]	[illegible]	১২,৪০,৩৫৩	১১,৬২,৪১০
৫। মালদহ	৩৭১৩	২০,৩৫,০০৯	১০,৪৩,৬৩৪	৯,৯১,৩৭৫
৬। মুর্শিদাবাদ	৫৩৪১	৩৭,০২,৮৬৯	১৮,৮৯,৭৮৫	১৮,১৩,০৮৪
৭। নদীয়া	৩৯২৬	২৯,৭৭,০১৩	১৫,২৮,৬২৬	১৪,৪৮,৩৮৭
৮। ২৪-পরগনা*	১৩,৭৯৬	১,০৭,২৬,৭৫১	৫৬,৩৪,৭৭৭	৫০,৯১,৯৭৪
৯। কলিকাতা	১০৪	৩২,৯২,৬৫৫	১৯,২২,৬৩২	১৩,৬৯,০২৩
১০। হাওড়া	১৪৭৪	২৯,৫৭,৭৬৪	১৫,৭৮,৯৬৪	১৩,৭৮,৫০০
১১। হুগলী	৩১৪৫	৩৫,৪৯,৮১৭	১৮,৫৯,৭৯০	১৬,৯০,০২৭
১২। মেদিনীপুর	১৩,৪২৪	৬৭,২৩,৮৬০	৩৪,৭৪,৫৬১	৩২,৭৯,২৯৯
১৩। বাঁকুড়া	৬৮৮১	২৩,৭৪,২০৫	১২,০৮,৪২৪	১১,৬৫,৭৮১
১৪। পুরুলিয়া	৬২৫৯	১৮,৫৫,৪৩৯	৯,৪৮,২২১	৯,০৭,২১৮
১৫। বর্ধমান	৭০২৮	৪৮,০৮,৮৮৬	২৫,৩৬,৯০৫	২২,৭২,৫৮১
১৬। বীরভূম	৪৫৫০	২০,৯৫,৭২৬	১০,৬৭,৩২২	১০,২৭,৫৩৪
মোট	৮৭,৮৫৩	৫,৪৪,৮৫,৫৬০	২,৮৫,০৫,১৫১	২,৫৯,৮০,৪০৯

* ১ মার্চ ১৯৮৬ হতে উত্তর ও দক্ষিণ।

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজি গ্রন্থ

Abul Fazl : Ain-i-Akbari. ed. H. Beveridge.

Allan, J. : Indian Coins in British Museum.

— : Coins of the Gupta Dynasties.

Allchin, B. & R. : Birth of Indian Civilization.

Ashutosh Museum : Catalogue of Coins in Ashutosh Museum.

— : Folk [illegible]

Bagchi, P. C. : Pre-[illegible] Pre-Dravidian.

— : India & China.

— : Studies in the Tantras.

Banerjee, R. D. : Eastern School of Medieval Sculpture.

— : Palas of Bengal.

— : History of Orissa.

Basak, R. G. : History of North-Eastern India.

Basham, A. L : Wonder that was India.

Baudhayana Dharmasutra.

Bernier : Travels in the Mughal Empire.

Beveridge, H. : Comprehensive History of India.

— : Trial of Nandkumar.

— : Ain-i-Akbari.

Bhandarkar, D. R. : Inscriptions of Northern India.

Bhattacharyya, B. : Buddhist Iconography.

— : Buddhist Sadhanamala.

Bhattacharyya, S. N. : Indo-Muslim Architecture in Bengal.

Bhattashali, N. : Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal.

Briggs : Ferishta.

Buckland, C. E. : Bengal Under the Lieutenant Governors.

Cambridge History of India.

Campos : Portuguese in India.

Census Reports of India.
Chakladar, H. C. : Aryan Occupation of Eastern India.
— Social Life in Ancient India.
Chakraborti, Bankabehari : Message of Indus Script.
Chakravarti, Monomohan : Sanskrit Literature in Bengali.
Chanda, R. P. : Indo-Aryan Races.
Chattopadhyaya, K. P. : Dharma Worship.
— : Cadak Festival of Bengal.
Chatterjee, K. N. : Bengal Terracottas.
Chatterjee, S. K. : Origin & Development of Bengali Language.
Cun[illegible] of India.
Dacca University : History of Bengal.
Dalton : Descriptive Ethnology of Bengal.
Das, S. R. : Ancient Indian Shipping.
Das Gupta, P. C. : The Forgotten Ports of Bengal.
— : Excavations at Pandu Rajar Dhibi.
Dasgupta, S. B. : Some Obscure Religious Cults of Eastern India.
Datta, Asok : Neolithic Culture in West Bengal.
Datta, B. N. : History of Bengal.
— : Collected Papers on Indian Anthropology.
— : Races of India.
Datta, K. K. : Bengal Suba 1740-1770.
De, Jayanta : Bengal Terracotta.
De, S. K. : Early History of Vaishnava Faith & Movement of Bengal.
— : History of Bengali Literature in the 19th Century.
Depremeuy & Sanguinetti : Travels of Ibn Batuta.
Dikshit, K. N. : Excavations at Paharpur.
Dodwell, H. : Sketch of the History of India 1858-1918.
Duff : History of the Mahrattas.
Edwardes & Garret : Mughal Rule in India.
Elliot & Dowson : History of India As Told By Its Historians.

Encyclopaedia Britannica.
Ficke, R. : Social Organisation of N. E. India
Fleet : Corpus Inscriptionum Indicarum.
Gait, E. : History of Assam.
Ghulam Husain : Siyar-ul-Mutakherin.
Hill, S. C. : Bengal in 1756-57.
Hunter, W : History of British India.
— : Statistical Account of Bengal.
— : Annals of Rural Bengal.
Ishwari Prasad : Medieval India.
It-sing : A Record of Buddhist Religion.
Jarett : Ain-i-Akbari.
Jash, Pranabananda : The Cult of Srilakshmi in Eastern India.
Kane : History of the Dharmasastras.
Kaye, J. : Administration of the East India Company.
Keith, A. B. : The First British Empire.
Kennedy : History of the Great Mughals.
— : Chaitanya.
Khan, Abdul Ali : Memoirs of Gaur and Pandua.
Konow, S. : Notes on Dravidian Philology.
Kramrisch, Stella : Pala and Sena Sculptures.
Lane-Poole : Medieval India under Muhammedan Rule
Lyall, A : Rise and Expansion of British Dominion in India.
Macdonnel : Sanskrit Literature.
Mackay, E : Indus Valley Civilization.
Majumdar, N. G. : Inscriptions of Bengal.
Majumdar, R. C etc. : An Advanced History of India.
Malcolm, J. : Political History of India, 1784-1832.
Malleson, G. B. : History of the French in India.
Marco Polo : Travels of Marco Polo.
Marshall, John : Mohenjo-daro and the Indus Civilization
Mill, J. : History of British India.
Monahan : Early History of Bengal.

Moreland : India from Akbar to Aurangzeb.
Mukherjee, B. N. : Coins and Currency System in Post-Gupta Period.
— : Coins and Currency of Pre-Gupta Bengal.
— : Coins and Currency System in Gupta Period.
Mukherjee, Manisha : Brahmanical Mythology in Sanskrit Inscriptions.
Mukherjee, Radhakumud : Hindu Civilization.
[illegible]pus of Bengal Inscriptions.
Nag, Kalidas : Greater Ind[illegible].
— : Discovery of Asia.
O'Malley, L. S. S. : Indian Civil Service 1601-1930.
Pal, M. K. : Some Archaeological Sites in W. Bengal.
Paul, P. C. : Early History of Bengal.
Periplus of the Erythrean Sea
Piggot, Stuart : Prehistoric India.
Pliny : Natural History.
Prasad, Pushpa : Sanskrit Inscriptions of Delhi Sultanate 1191-1526.
Raichaudhuri, H. C. : Political History of Ancient India.
Rapson, J. (Ed.) : Cambridge History of India.
Ravenshaw, J. H. : Gaur ; Its Ruins and Inscriptions.
Raverty, H. A. : Tabaqat-i-Nasiri.
Ray, H. C. : Dynastic History of Northern India.
Risley, H. : Tribes and Castes of Bengal.
Roberts, P. E. : History of British India.
Rolland, Romain : Ramkrishna and Vivekananda.
Salim, Ghulam Husain : Riyaz-us-Salatin.
Saraswati, S. K. : Forgotten Cities of Bengal.
Sardeshai, G. S. : Main Currents of Mahratta History.
Sircar, Susobhan : Bengal Renaiscence.
Sircar, Dineshchandra : Studies in Society and Administration of Ancient & Medieval Bengal.

Sarkar, Jadunath : Fall of the Mughal Empire.
— : History of Aurangazeb.
Sen, B. C. : Some Historical Aspects of Bengal Inscriptions.
Sen. D. C. : History of the Bengali Language & Literature.
Sengupta, Gautam : Pratna Samiksha. Journal of W. B. Dept. of Archaeology, Ed.).
Smith, V. S. : Early History of India.
— : Oxford History of India.
Spear, P. : History of India.
Stewart : History of Bengal.
Sur, A. K. : The Gahadavala [illegible]
— : Pre-Arya[illegible] ...s in Indian Culture.
— : Dynamics of Synthesis in Hindu Culture.
— : Sex and Marriage in India.
— Folk Elements in Bengali Life.
— : Prehistory & Beginnings of Civilization in Bengal.
— : Ethnicity of Hindu Culture.
— : History & Culture of Bengal. (1992).
Tabaqat-Nasiri.
Taranatha : Gesichte des Buddhismus in Indien.
Tavernier : Travels in India.
Tegart, C. : Terrorism in India.
Thapar, Romilla : History of India.
Thomas : Initial Coinage of Bengal.
— : Chronicles of the Pathan Kings of Delhi.
Thornton, E. : History of the British Empire in India.
Tripathi, Amalesh : Bengal Trade & Finances 1780-1830.
Vatsayana : Kamasutra.
W. B. Govt. : Introducing West Bengal.
Waddel, L. A. : Buddhism of Tibet or Lamaism.
Watters : Yuan Chwang.
Wheeler, J. T. : Early Record of British India.
Williams, Rushbrook : History of India (British Period)
Wilson, C. R. : Early Annals of the English in Bengal

বাংলা বই

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম : চণ্ডীমঙ্গল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ : হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান।

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত : গৌড়ের ইতিহাস।

চন্দ, রমাপ্রসাদ : গৌড়রাজমালা।

চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার : তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ।

চট্টোপাধ্যায়, [illegible] [illegible] ইতিহাস।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : বাঙলার ব্রত।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : ভারতপথিক রামমোহন রায়।

— বাংলা শব্দতত্ত্ব।

— বাংলা ভাষা পরিচয়।

— লোক সাহিত্য।

ঘোষ, প্রভাতকুমার : গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি।

ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

দত্ত, ভবতোষ : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র।

— বাঙালীর সাহিত্য।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ : অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস।

— বাংলার ইতিহাস।

দাশগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা।

দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ : বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম।

দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র : প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : ভারতে শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

নস্কর, ধূর্জটি : দক্ষিণ ২৪ পরগণার শৈবতীর্থ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : ভারতকোষ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন : মধ্যযুগে বাংলা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস : বাংলার ইতিহাস।
বসু, নগেন্দ্রনাথ : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।
বসু, নির্মলকুমার : হিন্দুসমাজের গড়ন।
বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ : বাংলার প্রথম। (সম্পাদনা অতুল সুর)।
ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : দ্বাদশ প্রবন্ধ।
ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।
ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ : বৌদ্ধদের দেবদেবী।
ভট্টাচার্য, রামেশ্বর : শিবায়ন।
ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল।
ভৌমিক, প্রবোধকুমার : সীমান্ত বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি।
ভৌমিক, সুহৃদকুমার : বাংলা ছন্দের বিবর্তন।
— : বাংলা-সাঁওতাল অভিধানের ভূমিকা।
— : বাঙলার কৃষিজীবী সমাজ।
মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : রবীন্দ্র-উত্তরকাল।
মজুমদার, বিজয়চন্দ্র : বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় উপাদান।
মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলার ইতিহাস।
মজুমদার, সুভদ্রা উর্মিলা : আধুনিক সমাজ ° বাঙালি মেয়েরা
মণ্ডল, পঞ্চানন : পুঁথি পরিচয়।
— : চিঠিপত্রে সমাজচিত্র।
মুখোপাধ্যায়, সুখময় : বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব।
— : বাঙলার ইতিহাসের দুশো বছর।
— : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম।
মিত্র, সুধীরকুমার : হুগলী জেলার ইতিহাস।
মিত্র, সতীশচন্দ্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস।
মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার : গৌড়লেখমালা।
রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব।
রায়, সুপ্রকাশ : ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ : বৌদ্ধ গান ও দোহা।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ : বাঙলার গৌরব।

শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

সরকার, দীনেশচন্দ্র : পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত।

— : পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত।

সুর, অতুল : বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।

— : বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি।

— : বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস।

— : হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য।

— : ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।

— : আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী।

— : আমরা গরীব কেন ?

— : বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর।

— : কলকাতা : পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

— : কলকাতার চালচিত্র।

— : ৩০০ বছরের কলকাতা।

— : মানবসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য।

— : চোদ্দ শতকের বাঙালী

সেন, দীনেশচন্দ্র : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

— : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

— : বৃহৎ বঙ্গ।

সেন, নীলরতন : চর্যাগীতি।

— : বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ।

সেন, প্রবোধচন্দ্র : ছন্দ পরিক্রমা।

সেন, সুকুমার : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার : পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ।

সেনগুপ্ত, গৌতম : প্রত্ন সমীক্ষা (সম্পাদনা)।

সেনগুপ্ত, পল্লব : পূজা পার্বণের উৎস কথা।

সেনগুপ্ত, শঙ্কর : বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি।

হালদার, নরোত্তম : গঙ্গারিডি : আলোচনা ও পর্যালোচনা।

সংযোজন

পৃষ্ঠা ১৯—'হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল'। এই একই নামে একখানা স্বতন্ত্র নতুন বই বের করেছে 'বেস্ট বুকস্' ১৯৯১ সালে।

পৃষ্ঠা ৭০—প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে শুরু করে তাম্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত কৃষ্টির একটা ধারাবাহিকতা আমি বহুপূর্বে লক্ষ্য করেছিলাম। সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কারের ফলে, এটা সমর্থিত হয়েছে। (পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা গৌতম সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'প্রত্নসমীক্ষা' জর্নাল দ্রষ্টব্য।) এতে প্রাগৈতিহাসিক [illegible] সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

পৃষ্ঠা ১১৩—খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে কীলকচিহ্নাঙ্কিত (পাঞ্চ-মার্কযুক্ত) মুদ্রার প্রচলন ছিল (পৃষ্ঠা ৮ ও ৬১)। গুপ্তযুগ ও তার অন্তবর্তীকালে রৌপ্য-মুদ্রাকে কার্ষাপণ বলা হত। কার্ষাপণ = ৩২০ গণ্ডক = ১২৮০ কড়ি। (কার্ষাপণ = কাহন)।

পৃষ্ঠা ১৬৯—'শেখ শুভোদয়া' হলায়ুধ নামাঙ্কিত। এখন পণ্ডিতমণ্ডল মনে করেন যে বইখানা জাল।

পৃষ্ঠা ১৭৭—এখন প্রমাণিত হয়েছে যে ব্রাহ্মী ছাড়া খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ অভিলেখ নিম্নবাঙলার চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়েছে। (B. N. Mukherjee, 'New Epigraphic and Palaeographic Discoveries' ও অমিতাভ ভট্টাচার্যের 'A Note on the Inscriptions Discovered in West Bengal.' দ্রষ্টব্য)।

নির্ঘণ্ট

আ

ঝ

ট

ফ

হ

—

হুসেনশাহের তুগরা লিপি

চিত্র ২

পালরাজবংশের ধর্মচক্র-মুদ্রা

(দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন)

প্রথম শূরপালের ১২শ রাজ্যবর্ষের বিষ্ণুমূর্তি

প্রথম মহীপালের চতুর্থ বর্ষের নারায়ণপুর মূর্তিলেখ

চিত্র ৫

তৃতীয় গোপালের চতুর্দশ বর্ষের রাজীবপুর মূর্তিলেখ

চিত্র ৬

পর্ণশবর নরনারী (পাহাড়পুর স্তূপ, রাজশাহী জেলা)

চিত্র ৭

বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী

(ঢাকা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত)

চিত্র ১৮

সেন রাজবংশের সদাশিব-মুদ্রা
(লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন)